পরবাসী

শ্রীআদিত্যশঙ্কর

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিণ্টার বি. এন. ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২/১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

মূল্য—৩৲

প্রকাশক শ্রীসুভাষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬নং রিচি রোড,
কলিকাতা।

—উৎসর্গ—

দিদিরাণী ;

জীবনের উষা-লগনে সর্বাদিসম্মত যে অপদার্থ মানুষটিকে তোমার স্নেহদানে ধন্য করেছিলে, তোমার সজীব স্পর্শে যার কল্পনাকে চেতনান্বিত করেছিলে, যার অনভিজ্ঞ শিশুচিত্তকে অনুপ্রাণিত করেছিলে মহত্তর জীবনের আশায়, সেই আমি আজ বঙ্গসাহিত্যের প্রাঙ্গণে আমার প্রথম অর্ঘ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি অযাচিতের সংকোচ-জড়িত কুন্ঠিত পদক্ষেপে।

তোমারই মধ্য দিয়ে আমি জগতকে চিনেছি, জেনেছি, একান্তভাবে ভালবেসেছি। এবং জগতের সঙ্গে এই পরিচয়ের সূত্র ধরে যেসব মানুষের জীবন আমার কল্পনাকে আলোড়িত করেছে, তাদেরই কয়েক-জনের কাহিনী রচনা করে অপরিসীম দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হয়ে, আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করেছি।

প্রচেষ্টা আমার সামান্যই ; তবুও একথা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে আত্মপ্রকাশের এই সামান্যতম প্রয়াসও হয়ত সম্ভব হতনা, যদি তুমি না আসতে আমার জীবনে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন চেষ্টাই কোনদিন করিনি, আজও কর্বনা, অথবা তোমার স্নেহের অপরিমেয় ঋণ শোধ কর্বো এ স্পর্দ্ধাও রাখি না, কারণ জানি তা অপরিশোধনীয়—।

তবু আমার মত তুচ্ছ মানুষকে সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধ এবং লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে স্নেহদানে ধন্য করেছিলে, এবং আমার সমস্ত অযোগ্যতা নিঃশেষে ক্ষমা করে যোগ্যতাতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিলে, সে কথা আজও ভুলতে পারিনি বলেই জীবনের প্রথম প্রচেষ্টা তোমারই চরণে অর্পণ কর্লাম। একে তুমি গ্রহণ করে আমায় ধন্য কর।

ভূমিকা

একটা কিছু রচনা কর্লেই তার একটা ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। যদিও অনেক সময় ভূমিকার সঙ্গে রচনার কোন উল্লেখযোগ্য সামঞ্জস্য বা সংযোগ থাকে না; যেমন এক্ষেত্রেও নেই। তবুও নিয়মটা এতই প্রচলিত যে ব্যতিক্রম ঘটাতে সাহস কর্লাম না। ভূমিকা লেখার ভার যদিও বন্ধুবর সুভাষচন্দ্রের উপরদিয়ে ছিলাম, তবুও সে তার স্বভাবসুলভ ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে দায়িত্ব স্কন্ধচ্যুত করে আমায় অধিকতর বিপদগ্রস্থ করেছে। কারণ একদিন সুস্থ শরীরে যা রচনা করা সম্ভব হয়েছে, আজ অসুস্থ অবস্থায় তার ভূমিকা লিখতে বসলে, উভয়ের মধ্যে সংযোগ না থাকার প্রবল সম্ভাবনাটাকে কিছুতেই অস্বীকার কর্তে পারি না। তবু লিখতে হবে। অল্প কথায়, মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা যে আমার আদৌ নেই, সেটা আমার রচনা পড়লেই বোঝা যাবে। অতএব ভূমিকাটাও অল্প কথায় শেষ কর্তে পার্ব কি না, সে বিষয়ে নিজেরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রথম কথাটা প্রথমেই বলে রাখা উচিত, অন্ততঃ বিজ্ঞজনেরা সেই রকম নির্দ্দেশই দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনটা প্রথম আর কোনটা শেষ কথা তা নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না বলে যখন যা মনে আসছে তাই লিখে যাচ্ছি; এর মধ্যে অসংলগ্নতা প্রকাশ পেলে সহৃদয় পাঠকবর্গ এবং সমালোচকবর্গ তা আশা করি ক্ষমা করে নেবেন। অন্ততঃপক্ষে ক্ষমা করা একান্ত অসম্ভব হলে, পরলোকযাত্রী বলে শাস্তির পরিমাণটা লাঘব করে দেবেন—।

কিছু বলার আগে সবিনয়ে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে নূতন কিছু দেবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। কেন নেই

সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে বন্ধুবর সুভাষচন্দ্রের একটা কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি যে "বহু লক্ষ বছরের পুরাণ একটা পৃথিবীতে জন্মে নূতন কিছু দেবার সাহস না থাকাই ভাল।" যদিও আমি এ বিষয়ে সুভাষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই তবু মনে হয় কথাটা অর্দ্ধসত্য; অতএব কথাটার যে অংশটুকু নিছক সত্য সেইটুকুই পাঠকবর্গকে বিশ্বাস কর্তে বলি। বাকীটুকু বিশ্বাস করা না করার ভার তাঁদের ঔদার্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—মোট কথা এর পরও নূতন কিছু দিতে না পারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলে অন্য কোন সাফাই গাইবার মত শক্তি আমার নেই। সে ভার থাক্ সুভাষের উপর।—

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার রচনার উদ্দেশ্য উপদেশ দেওয়া নয়। অনেকে বলেন যে কিছু একটা রচনা কর্লে তার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য থাকবেই—তবেই সে রচনা সার্থক হবে। একথাটার সত্য মিথ্যা সঠিকভাবে যাচাই করা হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ জীবনের সম্বন্ধেও অনেকের ধারণা যে, উদ্দেশ্যবিহীন জীবনধারণ বুঝি একান্তই অসম্ভব। অথচ আমি নিজে বহু মানুষ দেখেছি যাদের জীবন ধারণের মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই ছিল না; আজও নেই। এবং আমি নিজেও তাদের একজন। চিরদিন উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপনের একটা দুর্দমনীয় স্পৃহা আমার দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকায় এমন একটা তীব্র আবেগ জাগিয়ে তুলেছিল, যার ফলে রোগশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বদিন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি কেন আমি বেঁচে আছি। সেদিন বুঝিনি বটে, কিন্তু আজ কেন বেঁচে আছি তা বুঝি। বুঝি আজ বেঁচে আছি আরোগ্যলাভের একান্ত দুরাশায়। কিন্তু সে যাই হোক, আসল কথা

হচ্ছে উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপন সম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। আর তাই যদি হয় তাহলে উদ্দেশ্যবিহীন রচনাই বা অসম্ভব হবে কেন? এবং আমার রচনা যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন একথা বলতে আর কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু সেটা বল্লে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা বলা হবে। কেন সেই কথাটা খুলে বলি:—

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমার জীবনটা কেটেছে আত্মীয়স্বজনের স্নেহচ্ছায়ার বাইরে বাইরে। কাজে অকাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, জাতিধর্মনির্বিশেষে বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছি, এবং আশৈশব সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি বঞ্চিত হয়ে সাধারণের পর্য্যায়ভুক্ত হবার কোন বাধাই ছিল না আমার। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ-ভাবে মিশে যাবার পর্য্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং সে সুযোগের কোনটারই অবহেলা করিনি। পরিবর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের মানুষের পরিচয় লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাদের সকলের আচার আচরণ বা মনোবৃত্তি যে একই ধরণের ছিল না, সেকথা বলাবাহুল্য মাত্র। তাদের মধ্যে থাকবার সময় কখনও ঘটনাচক্রে পড়ে, কখনও তাদের আহ্বানে, আবার কখনও বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়িত করে দিয়েছি সময় বিশেষে, পরিণতির কথা চিন্তা না করেই। এবং পরিণতি যে সর্বক্ষেত্রে সমান হয়েছে তাও নয়, পরিণতির তারতম্য ঘটেছে। তা ঘটুক—তবু তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের মিলিত প্রবাহে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জেগেছে, সেটা হল যে সংসারে কেউই একা নয়—। কেন যে হঠাৎ এই কথাটাই মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন কর্লে নীরব থাকা ছাড়া উপায় নেই আমার তবুও কথাটা যে মনে হয়েছিল তা স্বীকার কর্তে আজ বিন্দুমাত্র

বাধা নেই। এবং এই অদ্ভুত অনুভূতি আমার মনে এমনই এক আবেগ সঞ্চারিত করে দিয়েছে যে, সে আবেগ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই আমার। জীবনের একটা অনতিবিস্তৃত পথ অতিক্রম কর্তে কর্তে আজ যৌবনের মধ্যসীমায় এসে পৌঁছেছি, অথচ এরই মধ্যে পরপারের আহ্বান আমার কাণে এসে পৌঁছেছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায়, একথা সত্য বলে জেনেও মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দিতে পার্চ্ছি না সর্বান্তঃকরণে। কেবল মনে হচ্ছে যে আমার কাজ শেষ হবার আগেই আমার ডাক এসে গেছে। একথা মনে হওয়ার কারণ এই যে আজীবন যেসব মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছি, যাদের আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার সুনিবিড় মিলনকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি; আমার জীবনে যাদের আবির্ভাব আমায় ধন্য করেছে, সার্থক করেছে আমার অস্তিত্বকে, তাদের পরিচয় যদি না দিয়ে যেতে পারি তাহলে মৃত্যুর পরেও হয়ত শান্তি পাব না। যাদের আনন্দ-বেদনা, সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার সঙ্গে নিজের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনাকে জড়িত করে একই সঙ্গে হেসে কেঁদে মানুষ হয়েছি, তাদের কথা যদি তাদেরই কাছে বলে যেতে না পারি তাহলে জীবনধারণের কোন সার্থকতা নেই। তাদের সঙ্গ-মাধুর্য আমার জীবনের সমস্ত শূন্যতাকে নিমেষে পূর্ণ করে দিয়েছে; আজও তাদের স্নেহের অকৃপণ প্রসাদ-ধারা আমায় ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় কি দুর্লভ সম্পদের অধিকারী আমি। আর তাদেরই ছোটখাট সুখ দুঃখ বিজড়িত প্রত্যাশা ক্ষুব্ধ জীবনের সামান্যতম পরিচয়ও যদি মানুষের কাছে দিয়ে যেতে পারি, তাহলে সেইটাই হবে আমার চরম আনন্দ। এবং এই জন্যই এ কাহিনীগুলি আমি একদিন রচনা করেছিলাম। বৈতরণী পার হওয়ার জন্যে কোন মাশুল লাগে কিনা

সঠিক জানা নেই—তবে যদি আদৌ লাগে তাহলে সে মাশুল যে এই ধুলি-মলিন পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকেই চেয়ে নিতে হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আর আমার রচনা পড়ে যদি একটিমাত্র মানুষও আনন্দ পান তাহলে সেই আনন্দের মধ্য দিয়েই আমার পরপারের যাত্রার মাশুল আপনিই সংগৃহীত হবে। অতএব কাহিনী রচনার উদ্দেশ্য হিসাবে এটাকেও ধরা যেতে পারে।—

সরস্বতীর প্রসাদ বঞ্চিত বলে নিজেকে অভিহিত করেছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি লক্ষ্মীর প্রসাদপুষ্ট। বরং সরস্বতী যেটুকুও বা দয়া করেছেন, লক্ষ্মী কিছুমাত্রও করেন নি। এবং রোগশয্যায় ঔষধ-পথ্য জোগানর ভার যদি আমার সহৃদয় বন্ধুরা গ্রহণ না কর্ত, তাহলে চিত্রগুপ্তের খাতায় নামটা অনেকদিন আগেই উঠে যেত। যমরাজের তলব পৌছেছে বহু দিন আগেই এবং তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গেরা কয়েকবার এসে আমার শরীরটার এক প্রান্ত ধরে বারকয়েক টানাটানিও করে গেছে, কিন্তু বন্ধুদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যমরাজের উদ্দেশ্য সফল হয় নি। অতএব অসুস্থ অবস্থাতেও "বেশ আছি," বলার স্পর্দ্ধা যদি কোন মানুষের থাকে তসে আমি। তবু একটা কথা না বলে পারি না যে বন্ধুদের মারফৎ লক্ষ্মীর প্রসাদের ছিটেফোটা লাভ কর্লেও সরাসরি তাঁর দেখা কখনও পাই নি। বরং যতবার তাঁর কাছে নিবেদন জানাতে গিয়েছি ততবারই তাঁর অসভ্য বাহনটার জঘন্য আচরণে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছি। সুতরাং রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের একটা উদ্দেশ্য যে সামান্য কিছু অর্থলাভ, একথাও অস্বীকার কর্তে পারি না। যদিও জানি সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

বাংলাদেশের পাঠকদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করেও একটা কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি সেটা হল তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। সাহিত্যের প্রাঙ্গনে যে কোন নবীন আগন্তুককে সাগ্রহে বরণ করে

নেবার মত ঔদার্য বাঙ্গালী পাঠকদের যতটা আছে, অন্যান্য দেশের পাঠকদের ততটা আছে বলেত শুনিনি। বিশেষতঃ ছাত্রসম্প্রদায়—পাঠক হিসাবে তাঁদের স্থান বাংলাদেশে সবচেয়ে উঁচুতে। যদিও বর্ত্তমানে যাঁরা ছাত্র আছেন অর্থাৎ স্কুল কলেজের পড়া এখনও যাঁরা শেষ করে উঠতে পারেন নি, তাঁদের মাত্র কয়েকবছর আগে আমি কলেজের সীমানা পেরিয়ে এসেছি গুরুতর অসম্মানের সঙ্গে—অর্থাৎ সেখানেও আমার সাধারণত্বের খ্যাতি বজায় রেখেছি। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অগ্রজত্বের দাবী আমি মোটেই করি না, বরং তার বদলে যদি বর্ত্তমান ছাত্রদের সগোত্রীয় বলে তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ কর্তে পারিত, সেইটাই লাভের মধ্যে গণ্য করি। এবং উন্নাসিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সাহিত্যিকদের মত পাঠকবর্গের শিক্ষাদীক্ষার বা রুচির সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করে হাস্যাস্পদ কর্তে চাইনা নিজেকে। পাঠকবর্গ যে নির্বোধ নন একথা আমি একান্তভাবেই বিশ্বাস করি। তাছাড়া সাধারণের কাছে আমার রচনার মূল্য বা মর্যাদার পরিমাণ নির্ণয় কর্ত্তে যাবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। এইটুকুই জানি যে আমি চিরদিনই সাধারণের একজন, সাধারণের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছি সাধ্যমত। তাদের আশাহত জীবনের বিপুল ব্যর্থতা আমায় ব্যথিত, অভিভূত করেছে—তাই তাদেরই জীবনের বাণীমূর্ত্তি রচনা করে, তাদেরই হাতে তুলে দিতে চাই—এবং এরমধ্যে আর যাই থাক সাধারণ মানুষের প্রতি যে কোন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বা শ্লেষ নেই তা আমি শপথ করে বলতে পারি।

ভূমিকার শেষাংশটুকু লিখে ফেলতে পার্লেই কাজ সম্পূর্ণ হয়—অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালাটা চুকলেই ভূমিকা সম্পূর্ণ হয়। এবং এক্ষেত্রেও একটু কিছু বলার আছে—অর্থাৎ মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ

করার মুহূর্ত্ত থেকে আজ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে বহু মানুষের কাছেই আমার ঋণ আছে। তাদের সকলের নাম কর্তে গেলে হয়ত শেষ করে ওঠা যাবেনা—তাই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করে নিচ্ছি যে জগতের প্রতিটি মানুষের কাছেই আমার কিছু না কিছু ঋণ রয়ে গেছে, যে ঋণ পরিশোধ করার মত কোন সামর্থ্যই আমার নেই। এবং তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার মধ্যে অগৌরবের তা কিছু নেইই, বরং নিজের শতসহস্র অযোগ্যতা সত্ত্বেও যে তাদের কাছে অযাচিতভাবে অনেক কিছু পেয়েছি, তার জন্য নিজের অদৃষ্টকে নিয়তই ধন্যবাদ দিই এবং প্রার্থনা করি বারবার যেন এই পৃথিবীর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণের অধিকার লাভ করি—এমনি সাধারণ মানুষ হয়ে।

এছাড়া ব্যক্তিবিশেষের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণের কথা স্মরণ করে একই সঙ্গে আনন্দে এবং বেদনায় মনটা ভরে উঠে। আনন্দ এইজন্যে যে তাদের স্নেহ পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিলাম বলে, আর বেদনার কারণ তাদের একনিষ্ঠ স্নেহের প্রতিদানে কিছু দেবার অক্ষমতা। তবে সুবিধা এই যে যাদের কথা এইবার উল্লেখ কর্চ্ছি তাদের সঙ্গে সৌজন্য বজায় রেখে চলার কোন প্রয়োজন সত্যিই নেই। কৃত্রিম সৌজন্যরক্ষার অনেক উপরে তারা। প্রথম জন সুভাষচন্দ্র। এর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা অনাবশ্যক। একটা আকস্মিক পরিবেশের মধ্যে তার সঙ্গে পরিচয়—এবং অল্পসময়ের মধ্যে অদ্ভুতভাবে মানুষের মন জয় করার কৌশলটা যদি শিখে নেওয়া সম্ভব হত, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দিতাম না। কিন্তু তা যখন পারিনি তখন তার বন্ধুত্বটুকুকে অমূল্য সম্পদ বলে গ্রহণ করে মানুষটিকে মুক্তি দিয়েছি। এরই কাজ ছিল রচনার পুনর্লেখনের ও তত্ত্বাবধান করা ও সময় বিশেষে তার স্বভাব সুলভ পরিহাস-রসিকতার দ্বারা আমার

রোগযন্ত্রণা বা মৃত্যু-ভীতি দূরীভূত করা। বলাবাহুল্য উভয় কাজই সে সমান দক্ষতার সঙ্গে করেছে, এবং অতিরিক্ত হিসাবে যেটুকু করেছে তারজন্য অতীন্দ্রের সঙ্গে যে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটেনি সেটা নেহাৎই ভগবানের ইচ্ছা। সুভাষ না থাকলে যে রচনা করাই সম্ভব হত না, এমন কথা বলতে দ্বিধা করি না। কেন একথা বল্লাম তার কারণ হয়ত প্রকাশ করে বলতাম কিন্তু তার অনুরোধেই নিবৃত্ত হলাম। তবে দু'একজনের মুখে শুনেছি সুভাষচন্দ্র নাকি তাঁদের কাছে একটি জীবন্ত প্রহেলিকা বিশেষ। জানিনা কিজন্যে তাঁরা এমন অদ্ভুত মন্তব্য কর্লেন তার সম্বন্ধে। তবে যতদূর মনে হয় তাঁরা ভুল করেছেন। সুভাষের মুখের cynical কথাবার্ত্তা এবং ওষ্ঠকুঞ্চনকেই যাঁরা সত্য বলে গ্রহণ কর্বেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভুল কর্বেন—cynic যে সে কখনই নয় একথা আমি শপথ করে বলতে পারি; তবে সে যে ঠিক কি সেইটাই আমি জানি না। এবং আমার একটা ভিত্তিহীন দৃঢ়-বিশ্বাস আছে যে, সে যদি একটুখানি মনোযোগ দিয়ে লেখনী গ্রহণ কর্ত, তাহলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিই একটা নূতন পাতা যোজনা হত, এবং তাহলে আমাকেও আর এত কষ্টকরে এত কিছু লিখতে হতনা। কিন্তু মুস্কিল এই যে শত অনুরোধেও সে সাহিত্যের ত্রিসীমানা দিয়ে যায়না, জিজ্ঞাস কর্লে বলে 'ভয় করে'। এই মানুষটার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রয়োজন যতখানিই থাক্ খোলাখুলি ভাবে তা স্বীকার কর্তে সাহস হয় না। কারণ তাহলে হয়ত এ পাতাটা ছাপাখানায় যাবার আগে অগ্নিদেবের ইন্ধন জোগাবার কাজে ব্যবহৃত হবে। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে না থাকলে আমার পক্ষে একটি অক্ষরও লেখা সম্ভব হতনা।

অতীন্দ্রমোহন ভার নিয়েছিল পাণ্ডুলিপি পুনর্লেখনের এবং রচনা

প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দুরূহ কর্ত্তব্যও ছিল তার একারই সে কর্ত্তব্য যে সে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেছে, প্রকাশিত বইখানিই তার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। এর কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উপায় নেই—কারণ এর লজ্জা বস্তুটা এত বেশী পরিমাণে যে মেয়েরাও সময় বিশেষে তাকে নিয়ে কৌতুক করে। আর একজন, যার হাতে ভার ছিল বইটির "শেষকৃত্যের ভার," অর্থাৎ প্রুফদেখা থেকে ছাপাখানার কাজের তত্ত্বাবধান করা তার নামটা উল্লেখ কর্তে নিষেধ আছে তার এবং সুভাষের। অতএব নিঃশব্দে তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি।

শেষ কথাটি এই যে কেউ যেন মনে না করেন যে আমার রচনার সম্বল বুঝি মাত্র একটি গল্প। তা নয়। আরও বহু আছে—কিছু আছে খাতায় এবং কিছু আছে মাথায়। এবং মাথায় বা খাতায় যা আছে তা ছাপার পাতায় তুলবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ এবং উৎসাহের প্রয়োজন তা লাভ করা সম্ভব হবে কিনা, তার চরম মীমাংসা হবে বর্ত্তমান বইটির বিক্রি দেখে। মানুষের কৌতুহল এমনই বস্তু যে দুদিন আগেও যে মৃত্যুর কাছে বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করার জন্য তৈরী হয়েছিল, আজ সেই মানুষটাই ব্যাকুল প্রত্যাশায় বাইরের জানালা দিয়ে চেয়ে আছে উদাস নয়নে।

রোগটা যদিও যক্ষ্মা—এবং সেরে ওঠার সম্বন্ধে একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাই নিশ্চিত—। তবে আমারও সন্দেহ হচ্ছে যে এযাত্রা বোধহয় যমরাজের দখলী-পরওয়ানা আমার উপর জারী করা আর হলনা। কারণ উগ্র নাস্তিক সুভাষচন্দ্র কোথাকার একটা স্বপ্নাদ্য মাদুলী আমার হাতে বেধে দিয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে কোন এক দেবতার প্রসাদী ফুল আমার কপালে বার তিনেক ঠেকিয়ে পরিচিত তরলকণ্ঠে

শাসিয়ে গেছে আমায় নাকি আরও অন্ততঃ ১২টা বছর বাঁচতে হবে। সেটা সম্ভব হবে কিনা জানি না—অন্ততঃ নিজের চেষ্টায়ত আর কিছুই হবে না—। তবে ভাবনা হয় সুভাষের কথা ভেবে—অসাধ্যসাধন কর্ত্তে পারে সে—এবং সে চেষ্টা কর্লে পারেনা এমন কাজই নেই—। হয়ত বা সত্যই আরও ১২টা বছর আমায় বাঁচতে হবে—তবে তারজন্য তার কাছে আমি কোন কৃতজ্ঞতাই স্বীকার কর্ত্তে রাজী নই—।

শ্রীআদিত্যশঙ্কর

পরবাসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

সংসারে একধরণের মানুষ আসে যাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে বা ঘনিষ্ঠতা করিতে হইলে, বিদ্যাবুদ্ধি, বয়স অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অতি-প্রয়োজনীয় গুণগুলির কোনটারই কোন প্রয়োজন ঘটে না। বিশেষতঃ বয়সের কথাটা কাহারও মনে থাকে না। এবং এই ধরণের মানুষগুলি বয়সের মর্যাদা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া এমনি করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে আসিয়া পড়ে যে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা ত কেহ করেই না, উপরন্তু সকলেই মাত্রাহীন আগ্রহাতিশয্যে মানুষটিকে আপন করিয়া লইবার ঐকান্তিক বাসনায় লোলুপ হইয়া উঠে। এবং প্রায়ই দেখা যায় এই ধরণের মানুষগুলি এমন একটা বিশেষ নামে আপনার পারিপার্শ্বিকস্থ মানুষগুলির মধ্যে পরিচিত যে বয়সের মাপে বিচার করিলে হয়ত সে নামের অর্থ, মাধুর্য অথবা মানুষটির ব্যক্তিগত পরিচয়ের গুরুত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কখনও বা দাদু, কখনও বা খুড়ো প্রভৃতি নানা প্রচলিত নামের মধ্য দিয়া এই জাতীয় বহুমানুষ আমাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিয়া বেড়ায়, কিন্তু কেহই তাহাদের এই সার্বজনীনত্বের প্রতিবাদ করে না, কারণ

প্রতিবাদের কোন কারণ ঘটে না। আমার কাহিনীর নায়কেরও তেমনি একটা নাম ছিল। নামটি হইল "গুরুদেব"। তাহার আসল নাম এবং অন্যান্য পরিচয় প্রয়োজন মত দেওয়া যাইবে। শুধু প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটুকু বলিয়া নিই।

বাঙালী ঘরের শতকরা নিরানব্বই জন ভাল ছেলের মত উপযুক্ত বয়সে অনুপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত M.Sc. পাশ করিয়া ঘরে বাইরে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলাম। শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-স্বজনের কয়েকজন আমায় জেলার হাকিম হইবার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দিবার জন্য যখন অতিরিক্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, ঠিক সেই সময় সহসা বাবার মৃত্যু সংসারের যাবতীয় ব্যবস্থার ওলট পালট করিয়া দিল। শুভানুধ্যায়ীর দল, যাঁহারা কয়েকদিন মাত্র আগে আমার মধ্যে খাঁটি হীরকত্বের পরিমাণ কতখানি আছে সে বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন তাঁহারা সহসা সুর পরিবর্ত্তন করিয়া যে সমস্ত কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন তাহাতে মৃতের জন্য বেদনাবোধ অপেক্ষা ঈর্ষা জাগিল বেশী। এবং পারিবারিক অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা হইতে বেশ কিছু দূরে, একটি কারখানার ল্যাবরেটরির এসিষ্ট্যাণ্ট কেমিষ্টের চাকরী লইয়া চলিয়া আসিলাম। জায়গার নামটি প্রকাশ করিতে কিছু বাধা আছে। বৈশাখের এক প্রখর মধ্যাহ্নে ষ্টেশন হইতে এক জরা জীর্ণ ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া যখন কারখানায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় ১২টা বাজে। কোন রকমে ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত মেস-বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। পথে কয়েকজন কারখানার বাঙ্গালী কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাহাদের কাছ হইতে 'বেঙ্গলী মেসের' বিস্তৃত বিবরণী সংগ্রহ করিয়া

মেসে হাজির হইলাম। মেস বাড়ীটা দেখিয়া প্রথমেই একটু সন্দেহ জাগিল, এবং চারিদিকে ফাঁকা মাঠের মধ্যে জরা-জীর্ণ শ্রীহীন বাড়ীটি দেখিয়া মনে হইল যেন বহুশত বৎসরের কোন ঐতিহাসিক স্থানের ভগ্নস্তূপের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বস্তুতঃ ভগ্নস্তূপ ছাড়া বাড়ীটিকে অন্যকিছু বলিতে হইলে তর্কশক্তির প্রাচুর্য চাই। তাই ভগ্নস্তূপই বলিলাম। কোচম্যানকে বিদায় দিয়া দরজায় ঢুকিতেই দেখি সামনের দালানে জন দুই খাইতে বসিয়াছে এবং একজন পরিবেশন করিতেছে। পরিবেশনকারীর শরীরের গঠনভঙ্গী এবং পরনের গামছাখানি দেখিয়া মনে হয় পশ্চিমা, কিন্তু মুখের ভাবে কেমন যেন একটুখানি বাঙ্গালী-সুলভ কোমলতা আছে। এবং সবকিছু মিলাইয়া তাহার পাচকত্বের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষতঃ গলায় একটা সাদা ধবধবে পৈতাও ছিল। তাহার জাতিগত সমস্যার সহজ মীমাংসা করিবার জন্য হিন্দীতেই বলিলাম, "মহারাজ কোই নোকর হ্যায় ইঁহা ?"

মহারাজ অম্লানবদনে পরিস্কার বাঙলায় বলিল, "আজ্ঞে না ত।"

একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিলাম, "ম্যানেজার বাবু কোথায় ?"

কারণ পথে আসিবার সময় জনকয়েক লোক বলিয়া দিয়াছিল যে, মেসে ম্যানেজার এখনও আছে, সেই আমার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এবং সেই আশায়ই ম্যানেজারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মহারাজ তেমনি গম্ভীরভাবে বলিল যে, ম্যানেজার বাবুও নাই।"

বিপদ বাড়িয়া গেল। কারণ বাঙ্গলাভাষী মহারাজকে যখন বহুকষ্টে বাঙ্গালী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইলাম, তখন তাহার গলদেশ লম্বিত মোটা পৈতার গোছাটি দেখিয়া সহসা তাহাকে আমার মালপত্র বহন করিবার গুরুতর অনুরোধ জানাইতে সাহস পাইলাম না। কারণ মহারাজ যদি অবাঙ্গালী হইত তাহা হইলে বিনা দ্বিধায়

সে প্রস্তাব করিয়া বসিতাম। কিন্তু তাহার বাঙ্গালীত্বই বাধা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ পয়সার জন্য মহারাজজীরা এমন অনেক কাজই করিয়া থাকেন যাহা বাঙ্গালী পাচক করিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একটু হতবুদ্ধি হইয়া কি করা যায় তাহাই ভাল করিয়া ভাবিবার পূর্বেই সে বলিল, "কি দরকার বলুন ত আপনার?"

তাহাকে আমার প্রয়োজন জ্ঞাপনে কোন ফল নাই জানিয়াও বলিলাম, "আমি নতুন এসেছি এখানে, আমার মালপত্রগুলো উপরে আনতে হবে···আর,—"

বাধা দিয়া সে বলিল, "ওঃ আচ্ছা, আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি যান।" যে দুজন খাইতে বসিয়াছিল তাহারা এত গম্ভীরমুখে খাইতে লাগিল যে, আমার সহিত একটা কথাও বলিল না। মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলাম, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই। এবং তাহাদেরও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে পাচকটি আসিল, তাহারই সাহায্যে মালপত্রগুলি দোতালার একটি ঘরে আনিয়া হাজির করিলাম। জিনিষগুলি ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কিছু খাবেন?"

'না' বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত। কিন্তু ভদ্রতারক্ষা করার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার নয়। তাছাড়া পাচকের সহিত ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজনও ঘটে না। তবু বলিলাম, "এখন কি কিছু পাওয়া যাবে? সকলেরই ত খাওয়া হয়ে গেছে।"

লোকটি একটু হাসিয়া বলিল, "তাই বল্লে কি হয়? আপনি নতুন এলেন এখানে, এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি—আর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে বলে না খেয়ে থাকবেন?"

লোকটার কথায় আশ্চর্য হইয়া গেলাম। যদিও মেসের সম্বন্ধে আমার খুব বেশী অভিজ্ঞতা ছিল না, তবুও সাধারণ চাকর বাকর হইতে মেসের চাকর-বাকরগুলা যে একটু বেশী রকমের ফাজিল এবং অভদ্র হয় তাহা জানিতাম. দুই একটা ক্ষেত্রে দেখিয়াওছি। কিন্তু এই লোকটার ব্যবহার এত ভাল লাগিল যে, আমার সঙ্গে যাচিয়া আলাপ না করার অপরাধে যে দুইটি লোককে এইমাত্র বাঙ্গালীর স্বভাবজাত মনোবৃত্তি বলিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, এই লোকটির মার্জিত ব্যবহারের কারণ খুঁজিতে গিয়াও তাহার বাঙ্গালীত্বই বেশী করিয়া মনে পড়িল। এবং বুঝিলাম নীচ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও বাঙ্গালী আপনার সৌজন্য ও ভদ্রতা ভুলিয়া যায় না। লোকটি বলিল, "যদি খানতো চান করে নিন, আপনার ভাত বেড়ে রাখি।"

বলিলাম, "হাঁ, চল।" এবং সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পূর্বে তাহাকে মানিব্যাগটা খুলিয়া আট আনা পয়সা দিয়া বলিলাম, "এটা রেখে দাও, জল খেও।" সে কোন কথা না বলিয়া আট আনা পয়সা জোড়হস্তে গ্রহণ করিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমিও স্নান করিয়া খাইতে গেলাম।

লোকটি এত যত্ন করিয়া খাওয়াইল যে মনে মনে গভীর আনন্দ পাইলাম এই ভাবিয়া যে আত্মীয় পরিজনহীন বিদেশে, যে মানুষ এমনি করিয়া আদর-যত্ন করিতে পারে, সে সামান্য বেতনভোগী পাচক হইলেও, মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে সে অনেক উঁচুতে। খাইতে বসিয়া তাহার পরিচয় লইয়া জানিলাম, তাহার নাম বিকাশ; পদবী রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহাদের বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু এখন সেখানে কেহই নাই। বাপ-মা মারা যাইবার পর সে আর দেশে যায় নাই। এবং তাহার কথাবার্ত্তায় যে সহজ ভদ্রতাবোধের, যে মার্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া

প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম, এখন তাহার সমস্ত পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম যে অবস্থা বিপাকে পড়িয়াই সে এই চাকরী করিতে আসিয়াছে, আসলে সে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের অর্দ্ধশিক্ষিত সন্তান। কথা প্রসঙ্গে একথাও সে জানাইল যে সেও অন্যান্য বাবুদের মত ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, এবং মাহিনাও মন্দ পায় না তাহার কথা শুনিয়া অনেক কিছু ভাবিতে লাগিলাম। ফ্যাক্টরী জীবন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। দুই চারিখানা আধুনিক সাহিত্য মারফৎ কারখানা জীবনের সম্বন্ধে যেটুকু জানিয়াছিলাম তাহাতে বিকাশকে একটু অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইল। তবু মানুষের মর্যাদা-বোধ এমনি অদ্ভুত যে তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাইয়াও তাহার সহিত সহজ ভাবে কথা বলিতে পারিলাম না। বেশ বুঝিলাম যে তাহার সহিত সহজ ভাবে আলাপ করিবার পথে আমার অকিঞ্চিৎকর ডিগ্রীগুলা যেন নিষেধের তীক্ষ্ণ সঙ্গীন উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এবং সহসা সে যখন প্রশ্ন করিয়া বসিল যে আমি বিবাহিত কিনা তখন সে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া কণ্ঠস্বরটা একটু অকারণে রুক্ষ হইয়া গেল। কারণ হাজার হোক পাচকের পর্যায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার মত সাম্যবাদী আজিও হইয়া উঠিতে পারি নাই। যাহাই হোক খাওয়া শেষ করিয়া উপরে আমার ঘরে চলিয়া আসিলাম। বিকাশ একটা রেকাবীতে কিছু মসলা আর এক গ্লাস খাবার জল আনিয়া টেবিলে রাখিয়া জানাইল যে সে এবার কাজে যাইবে।

বলিলাম, "তুমি খেলে না ?"

অমায়িক হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আর এখন কিছুই নেই। যা ছিল আপনাকে সব দিয়ে দিয়েছি—উনুনেও আঁচ নেই—"বাধা দিয়া বলিলাম, "তা কেন কর্ত্তে গেলে, আমায় খাবার আনিয়ে দিলেই হত—এত বেলায় তুমি না খেয়ে যাবে—"

কথার মধ্যেই সে বলিয়া উঠিল, "তাতে কি হয়েছে? আপনি নতুন মানুষ এলেন, আপনার খাওয়া যদি না হয় সেটা আমাদের লজ্জার কথা—তাছাড়া ৫টার সময় ছুটি হয়ে যাবে তখন এসে খাওয়া যাবে।"

এমন ভাবে কথাগুলা বলিল যেন সে এসব ব্যাপারে চির অভ্যস্ত। তবুও একটু বিরক্তি বোধ করিলাম। কারণ আমার জন্য একটা মানুষের খাওয়া হইল না কথাটা ভাবিতেও যেন মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু উপায় যখন কিছুই নাই তখন আর কি করা যায়।

বলিলাম, "আচ্ছা, যাও—"বিকাশ চলিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া বাহির হইলাম; ম্যানেজারের নির্দেশমত কেমিষ্টের সাথে দেখা করিতে হইবে।

কেমিষ্টটি বাঙ্গালী, মোটাসোটা, আকারে খাটো মানুষটি, বয়স প্রায় ৩৮ বছর হইবে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমার নীচে বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখে যেন একটা কৌতুকের আভাস পাওয়া যায়। মুখে মিষ্টি হাসি লাগিয়াই আছে। কথাবার্তা বলেন যদিও যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সহিত, কিন্তু কথার মধ্য দিয়া পদমর্যাদার আভাস পাওয়া যায় না। পরিচয় পর্বের সমাধা হইতেই বলিলেন, "আপনি হঠাৎ এই পাণ্ডব-বিবর্জিত দেশে চলে এলেন কি বলে? কলকাতা সহরে কি M.Sc. পাশ ছেলেদের জায়গা হচ্ছে না?" হাসিয়া বলিলাম, "আপনিওত শুনেছি Research Scholar, আপনিই বা হঠাৎ এখানে এসে হাজির হলেন কেন?"

ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথা বাদ দিন্। M.Sc. পাশ করার পর বছর দুই Research করে একটা মনোমত চাকরী পাইনি, তাছাড়া আরও কিছু ঘটনা জড়িত আছে—অবশ্য এমন কিছু serious নয়—তবুও নেহাৎ বাজেও নয়—হঠাৎ পেয়ে গেলাম এই চাকরীটা একজনের থ্রু দিয়ে। সেই থেকেই রয়ে গেছি, সে আজ প্রায়

১৪ বছর হয়ে গেল—যাক্ সেসব কথা, উঠলেন কোথায় ?"

বলিলাম, "বেঙ্গলী মেসে।"

বলিলেন, "বিয়ে করেন নি ?"

বলিলাম, "না, ভাগ্য এখনও বঞ্চিত করে নি আমায়।"

ভদ্রলোক আবার হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "কেন, কেন ? বিয়ে যারা করে তারা কি ভাগ্য-প্রবঞ্চিত ?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমার ত তাই মনে হয়।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা এর মিমাংসা হবে একদিন। এখন চলুন আপনাকে আমাদের ল্যাবরেটারীটা দেখিয়ে আনি।" কেমিষ্টটির নাম যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, মিঃ ঘোষ বলিয়াই সমধিক পরিচিত। মিঃ ঘোষের সঙ্গে ল্যাবরেটরী দেখিতে বাহির হইলাম।

চলিতে চলিতে বলিলেন, "কোয়ার্টার নেবেন নাকি ?"

বলিলাম "না, কোয়ার্টার নিয়ে সুবিধা হবে না। কারণ মা কিংবা বোনেরা এখানে এসে থাকতে পারবে না। তা'ছাড়া ছোট ভাইটা স্কুলে পড়ছে, সামনের বারে Matric দেবে। এখানে স্কুল কলেজও ত নেই—"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "মেসে থাকতে পারবেন ?"

বলিলাম, "না পার্লেও চেষ্টা কর্তে হবে। সব জিনিষটাই কি প্রথম থেকেই পারা যায় ?"

মিঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "That's a fact কিন্তু কথা হচ্ছে মেসের আর কোন অসুবিধা না হোক, খাওয়ার অসুবিধা হবে ভয়ানক। হিন্দুস্থানী মহারাজের 'হড়হড়কা ডাল' আর তরকারী কি আপনার সহ্য হবে ?" বলিলাম, "কিন্তু মেসের ঠাকুর ত বাঙ্গালী। আর রান্নাও যা

পেলাম যথেষ্ট ভালই—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন, "বাঙ্গালী? বাঙ্গালী কোথায় দেখলেন মশাই? মেসটা start করেছিলাম আমরা 1932তে, ৫৲ টাকা দিয়ে রামবিলাস বলে এক হিন্দুস্থানী আমদানী করেছিলাম গোরখপুর থেকে। সে বেটা increment পেতে পেতে ৬৫৲ টাকা পাচ্ছে —আর আপনি তাকে বেমালুম বাঙালী বলে বসলেন?"

এইবার বিস্মিত হইলাম আমি। বলিলাম, "আপনি বলছেন কি? ঠাকুর নিজে বসিয়ে আমায় খাওয়ান। বল্লে সেও এই ফ্যাক্টরীতে কাজ করে—"

বাধা দিয়া বিস্ময়ের সহিত মিঃ ঘোষ বলিলেন, "এ্যাঁ? ফ্যাক্টরীতে কাজ করে? কি নাম বলুন ত?"

বলিলাম, "বিকাশ রায়?"

মিঃ ঘোষ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসি যেন আর থামিতেই চায় না। বুঝিতে পারিলাম না সহসা এত হাসিবার কি কারণ থাকিতে পারে।

বলিলাম, "কি ব্যাপার বলুন ত মশাই? এত হাসছেন কেন?"

ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে বিষম খাইয়া কোন মতে হাসি থামাইয়া বলিলেন, "প্রথম দিন এসেই ওর পাল্লায় পড়ে গেছেন?"

বলিলাম, "তার মানে?"

ঘোষ বলিলেন, "মানে—বিকাশ আপনার মেসের ঠাকুর নয়, বিকাশ হল ফ্যাক্টরীর Mechanical Foreman, ৩৫০৲ টাকা মাইনে পায়।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে বলিলাম, "সে কি মশাই সে যে আমায় নিজে বল্ল সব।'

ঘোষ তখনও হাসিতে ছিলেন।

বলিলেন, "কি বল্ল ?"

আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলাম, এবং তাহাকে যে আট আনা বকশিস দিয়াছি একথাটাও বলিতে ভুলিলাম না।

সব কথা শুনিয়া মিঃ ঘোষ আর একদফা প্রচণ্ড হাসিয়া বলিলেন, "আট আনা পয়সাও দিয়েছেন ? তা বেশ, বেশ !"

বলিলাম "ভদ্রলোক তাহলে ওকথা আমায় বল্লেন কেন ?"

ঘোষ বলিলেন, "এইটাই কেউ বোঝে না। রসিকতা করবার সুযোগ পেলে ও ছাড়ে না। বড় রসিক ছোকরা। সংসারের সব কিছুর সঙ্গেই তার রসিকতা। তবে মানুষটা কখনও কারুর ক্ষতি করে না। বরং উপায় পেলে মানুষের উপকারই করে। তাছাড়া মানুষটার মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে—দেখবেন অখন থাকছেন ত এক সঙ্গেই। তবে আপনাকে বড জব্দ করেছে কি বলেন ?" অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মিঃ ঘোষ আমায় loboratary তন্ন তন্ন করিয়া কি দেখাইলেন মনে নাই। কেবল ভাবিতে লাগিলাম বিকাশের কথা, এ কেমন অদ্ভুত মানুষ ? রসিকতার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ঐযে সারাদিন খাটুনীর পর নিজের মুখের ভাত কটি আমায় তুলিয়া দেওয়া, এবং মশলা জল আনিয়া রাখিয়া দেওয়া ইহা যে শুধুই তামাসার জন্য করিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। বরং তাহার আদর যত্নের মধ্যে যে আন্তরিকতার সুরটুকু লাগিয়াছিল তাহারই রেশটুকু মনের মধ্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার আদর যত্নে মুগ্ধ হইয়াও তাহার সহিত সহজ ভাবে কথা বলিতে পারি নাই পদমর্যাদা বা ব্যক্তিগত আভিজাত্যের গর্বে। কিন্তু সে যে তাহার সমস্ত কিছু বিস্মৃত হইয়া আমায় এমনি করিয়া খাওয়াইল, সেকি শুধুই আমার অজ্ঞানতাকে পরিহাস করিবার জন্য ?

শুধুত আমাকেই নহে আরও যে দুইটি লোক খাইতে বসিয়াছিল তাহাদের পাতে পরিবেশন করিবার সময় যেটুকু তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছি তাহা হইতে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, যে আমার সহিত তাহার আচরণটা আগাগোড়া পরিহাস মাত্র। এবং তাহার সযত্ন আতিথেয়তার সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব নানা কথা চিন্তা করিয়া যে মানুষটাকে অবজ্ঞার সহিত অনাদৃতের কোঠায় ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম, মিঃ ঘোষের কথা শুনিয়া যেন আমার মনের একটি বহুদিনের রুদ্ধদ্বার সহসা খুলিয়া গেল। এবং তাহার মধ্যদিয়া বিস্ময়ের প্রচণ্ড আলোর মধ্যে সেই মানুষটির সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ কৌতুহলের উদ্রেক হইল। ভাবিলাম কে এই মানুষটি যে নিজের ৩৫০৲ টাকার মাহিনার পদগর্ব তুচ্ছ করিয়া নিতান্ত সাধারণের মত আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করে? হয়ত অনেকে ভাবিবেন, ৩৫০৲ টাকার মধ্যে কি এমন অসাধারণত্বের ছাপ আছে? প্রত্যুত্তরে এইটুকু বলিব যে কাবখানা জীবনে যেখানে ১০/২০ টাকা মাহিনার তারতম্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ ঘটে সেইখানে যে মানুষ আপনার ৩৫০৲ টাকা মাহিনার কথা ভুলিয়া নিজে অভুক্ত থাকিয়া অপরিচিত মানুষের পাতে নিজের খাবার তুলিয়া দিতে পারে সে মানুষ নেহাৎ সামান্য নয়। হঠাৎ মিঃ ঘোষ বলিয়া উঠিলেন, "আমি নশাই বকে যাচ্ছি, আর আপনি আপন মনে কি ভাবছেন বলুন ত?" বিনা দ্বিধায় বলিলাম, "ভাবছিলাম বিকাশ বাবুর কথা।" মিঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ—তার সম্বন্ধে এত কিছু চিন্তা করার নেই। আলাপ হলেই বুঝতে পার্বেন একটি অদ্ভুত মানুষ সে—চলুন না দেখা কর্বেন ওর সঙ্গে? ঐত Mechanical Foreman এর office—" কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিলাম, "চলুন যাই।" দুইজনে Mechanical

Foreman এর আফিসে আসিয়া হাজির হইলাম! অফিস ঘরের বর্ণনা দিবার সাধ্য আমার নাই। ঘরটি নিতান্তই ছোট, এবং সেই অকিঞ্চিৎকর ঘরটির মধ্যে নানা রকমের যন্ত্রপাতি ও লোহালক্কড়ের অপরূপ সঞ্চয় দেখিয়া মনে হইল প্রতিবাদ করিবার ভাষা থাকিলে হয়ত সেই ছোট ঘরটি তাহার স্বল্প আয়তনের তুলনায় গুরুভার বহনের অক্ষমতা জানাইয়া কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য লাগিল রাশিকৃত জিনিষ পত্রের স্তূপের মধ্যে পরম নিশ্চিন্ত মনে যে মানুষটি বসিয়া আছে তাহাকে দেখিয়া। পরিধানে একটি খাকি প্যাণ্ট ও পায়ে জুতা-জোড়া ভিন্ন আর কিছুই নাই। এবং না থাকিবার যথেষ্ট কারণও আছে। কারখানা ঘরের মধ্যে আলোর প্রাচুর্য যেটুকুও বা থাকে বাতাসের প্রাচুর্য নাই বলিলেই হয়। এবং যে মানুষগুলা কাজ করে তাহারা যেন সকালবেলায় কারখানা গেটে ঢুকিবার আগে বাহিরের মুক্ত বাতাস বুক ভরিয়া লইয়া আসে, এবং যতক্ষণ ভিতরে থাকে সেই সঞ্চিত বাতাসের সাহায্যে কাজ করিয়া যায়। বিশেষতঃ Mechanical Foreman বলিয়া খ্যাত যে মানুষটি আপনার ছোট্ট টেবিলের উপর কয়েকটা বিচিত্র আকারের ও আকৃতির যন্ত্র লইয়া, ঘর্মাক্ত অর্দ্ধনগ্নদেহে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিতেছে তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ এই কথাই মনে হইল, যে ফ্যাক্টরীটা যেন যন্ত্রদানবের লৌহ-মুষ্টির মধ্যে অবস্থিত একটি জীবন্ত প্রাণী--তাহার নিপীড়িত জীবনের লক্ষণ এবং আর্ত্তনাদ ফ্যাক্টরীর অগণিত কলকব্জার অবিশ্রান্ত আওয়াজ —চিমনীর ধোঁয়া যেন এই সচল প্রাণীটির বেদনা-বিজড়িত দীর্ঘশ্বাস এবং কারখানার অসংখ্য শ্রমিক যেন প্রাণীটির রক্ত কণিকা। এই জীবন্ত প্রাণীটির অবিরত কর্কশ আর্ত্তনাদের মধ্যে Mechanical

Foreman বিকাশ রায় চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া গম্ভীর মনোযোগের সহিত স্ক্রুড্রাইভার দিয়া কি একটা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। এবং সেই অদ্ভুত পরিবেশের সঙ্গে তাহার উপস্থিতি যে বিস্ময়কর সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কিছুক্ষণ আগে যে মানুষটাকে আট-হাতি গামছা পরিয়া অন্ন-পরিবেশনরত দেখিয়া পাচক বলিয়া স্থির করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি নাই, সেই মানুষটিকে এই লোহালক্কড়ের মাঝখানে সমাহিত চিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মনে হইল, যেন বিশ্বের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মাঝখানে স্বয়ং বিশ্বকর্মা আপনার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। এবং মানুষটিকেও সেই যন্ত্র-পাতিগুলির মত রহস্যময় ও স্তূপীকৃত লোহালক্কড়ের মতই জড় পদার্থ বলিয়া মনে হইল। আমাদের পায়ের শব্দ পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; তবুও আমরা ঘরে ঢুকিতেই কর্মব্যস্ত বিকাশ রায় বলিয়া উঠিল, "ধুত্তোর শালার নিকুচি করেছে, এই রফিক বড় স্ক্রু ড্রাইভারটা দে, এ শালার ছেলে শালা সহজে খুলবে না"—বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই আমাদের দেখিয়া হঠাৎ যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। মিঃ ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আরে, দাদা যে?" আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, অদ্ভুত সে হাসি। এক মুহূর্ত্তে যেন জড় পদার্থটি প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল। এ পর্যন্ত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। এইবার দেখিলাম। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় বছর ৩২ হইবে। বলিষ্ঠ গঠন, গায়ের রং এক সময়ে যথেষ্ট ফর্সা ছিল তাহা তাহার উপস্থিত তামাটে রঙের আবরণ সত্ত্বেও বোঝা যায়। প্রশস্ত কপালের নীচে ঈষৎ কোটর-গত ছোট দুটি চোখ, সহসা দেখিলে সে চোখের মধ্যে কিছু পাওয়া

কঠিন—একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় বুদ্ধির কোন চিহ্ন থাক বা নাই থাক মানুষটার শরীরের গঠন প্রণালীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া চোখ দুইটি অসাধারণ প্রাণের দীপ্তিতে দীপ্তিমান। মানুষটা যে বাঁচিয়া আছে এবং দেহে মনে সম্পূর্ণ বাঁচিয়া আছে তাহা তাহার চোখ দুইটি দেখিলেই বুঝা যায়। নাকের অগ্রভাগটি কোন দৈব দুর্ঘটনাবশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, নাকের ডান পার্শ্বের কাটার দাগটিই তাহার সাক্ষ্য দেয়। ঠোঁট দুইটির মধ্যে অধরোষ্ঠ অকারণ আগ্রহাতিশয্যে উপরের ওষ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ প্রসৃত হইয়া মুখের চেহারার মধ্যে একটা অকুণ্ঠিত আত্ম-বিশ্বাসের দীপ্তি আনিয়া দিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য তাহার মুখের হাসিটি। সমস্ত শরীরের সহিত সামঞ্জস্যহীন স্বচ্ছ হাসি তাহার বয়সের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয় বটে, কিন্তু দেখিবার মত চোখ থাকিলে সেই সদা বিচ্ছুরিত হাসির মধ্য দিয়া মানুষটির মনের চেহারা এক মুহূর্তেই দেখিয়া লওয়া যায়। এবং সমস্ত মিলিয়া মানুষটির মুখটিকে এমন একটা অস্বাভাবিকত্ব দান করিয়াছিল যে সহসা মনে হইল লোকটাকে যে শুধু পাচক এবং Mechanical Foreman হিসাবেই মানায় তাহা নহে, বরং সংসারের কোনখানেই তাহাকে বেমানান দেখায় না। কেন যে একথা মনে হইল বলিতে পারি না। এবং তাহাকে যে হঠাৎ পাচক বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম সে কথাটা মনে হইতেই ভাবিলাম, এই যে এখন ইহাকে Mechanical Foreman এর চেয়ারে বসিয়া যন্ত্রপাতির আবর্জনা পরিবেষ্টিত নিখুঁৎ কারখানার মানুষ হিসাবে দেখিতেছি, ইহাও হয়ত লোকটার সত্য রূপ নহে। বিশেষতঃ তাহার কোটরগত চোখ দুইটি হইতে অন্তহীন রহস্যের আভাস যেন ক্ষণে ক্ষণে বিকীর্ণ হইতেছিল। আরও হয়ত কিছু ভাবিতেছিলাম হঠাৎ বিকাশ রায়ের কথায় চিন্তাজাল ছিন্ন হইল।

বলিল, "কি মশাই, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যে একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন? ভাবছেন বুঝি এরকম কুৎসিত মানুষ আর জীবনে দেখিনি?"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "নাহে, তা'নয়। প্রথম দর্শনে তুমি যা জব্দ করেছ ভদ্রলোককে, তার জের এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।"

বিকাশ হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি যেন তাহার বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। ৩৫০৲ টাকা মাইনের Mechanical Foreman এর হাসি নয়—বরং মনে হইল যেন সংসারানভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক বালকের কৌতুকময় হাসি। হাসিতে হাসিতেই বলিল, "তা আমায় হিন্দুস্থানী মহারাজ বলে ভাবাটা আর ওঁর অপরাধ কি—চেহারাটাত কার্ত্তিকের মত বল্লেই হয়—" বলিয়া আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ও নিয়ে ভাববেন না·· ওটা কিছু নয়—তবুও ত আপনি অন্য কিছু ভাবেন নি—বলব নাকি দাদা আপনার মিসেসের কথাটা?"

মিঃ ঘোষ হাসিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন আসিয়া খবর দিল মিঃ ঘোষকে ম্যানেজার ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। মিঃ ঘোষ চলিয়া গেলেন।

রায় বলিল, "আরে বসুন না—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ভদ্রলোকের মত?"

একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে বলিলাম, "তার মানে, ভদ্রলোকের মত দাঁড়িয়ে রইলাম মানে?"

রায় বলিল, "ভদ্রলোকেরা কোথাও গেলে বসতে না বল্লে দাঁড়িয়ে থাকে, খেতে দিয়ে "খাও" না বল্লে খায় না, কথা বলতে না বল্লে কিছু বলে না। আপনিও সেই রকম দাঁড়িয়ে রইলেন বলেই বল্লাম। মানে এটা কারখানা ত—ভদ্রলোকদের স্থান এটা নয়—সব শালাই

ছোটলোক—"বলিয়াই এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে জিভ কাটিয়া কান মলিয়া বলিল, "অবশ্য আপনারা বাদ দিয়ে—কারণ আপনারা হচ্ছেন ইয়ে, মানে—এই রফিক্ কর্চিস কি তখন থেকে? বড় স্ক্রুড্রাইভারটা দে, দিয়ে যা ২নং শীটমিলে কি হয়েছে দেখে আয় চট্ করে—বেশী দেরী করিসনে।"

রফিক স্ক্রুড্রাইভারটা দিতে দিতে বলিল, "কি হয়েছে কি শীটমিলে?"

স্ক্রুড্রাইভারটি লইয়া যে যন্ত্রটি খুলিবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল, সেইটা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "বড়সাহেবের প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে দিয়ে আয়,—দেখিস খুব সাবধানে—সেলাই করতে গিয়ে শেষে—"কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই আমার পানে চাহিয়া বলিল, "Sorry কিছু মনে করবেন না। সর্ব্বদা খিস্তি কর্তে কর্তে জিভটা বড় আল্‌গা হয়ে গেছে—।" তাহার কথার ধরণেই বুঝা যায়, সে রহস্য করিতেছে। তাই জবাব দিবার প্রয়োজন ঘটিল না। মুস্কিলে পড়িলাম আমি। ভদ্রলোকের সাথে কি কথা বলা যায় তাই ভাবিতেছি। কারণ প্রথম পদার্পণের মুহূর্ত্তে সেই যে তাহাকে পাচক সাব্যস্ত করিয়াছিলাম সেই লজ্জায় কিছুতেই মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে চায় না। শুধু ত পাচক সাব্যস্ত নয়, আট আনা পয়সা বক্‌শিস্‌ও দিয়াছি। এবং নিজের নিদারুণ নির্বুদ্ধিতার কথা মনে করিয়া কিছুতেই কোন কথা বলিতে পারিলাম না। ভদ্রলোক যেন আমার মনের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আপনি কি কোন কথা বলবেন না নাকি?"

লজ্জা সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিলাম, "না—মানে কি জানেন? একটা কথা বলব মনে কিছু কর্বেন না।"

ভদ্রলোকের চোখ দুইটি যেন কৌতুক হাস্যে নাচিয়া উঠিল, 'বলিলেন,

"কিছু না, কিছু না, একটা কেন একশ'টা কথা বলুন না—বরং কথা না বলে যে চুপ করে আছেন এইটাই বেশী বিরক্তিকর।"

অনেক কষ্টে সমস্ত জড়তা কাটাইয়া উঠিয়া বলিলাম, "বলছিলাম কি দুপুর বেলা—?"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই দুই হাত তুলিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যস্ ব্যস্ বুঝেছি—দুপুরবেলায় মহারাজ বলার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত এই কথাটা বলবেনত? কিন্তু তার কোন দরকার নেই—."

বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম, "কেন?'

বলিলেন "কি জানি মাপ টাপ চেয়ে শেষে যদি আট আনা পয়সা ফেরৎ চান—? মাইরী বলছি আট আনার সিগ্রেট খেয়ে নিয়েছি, বিশ্বাস না হয় রফিক এলে জিজ্ঞাসা করবে'ন।"

এবার তাহার কথায় আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

বলিলাম, "বেশ আট আনা পয়সা ফেরৎ না হয় নাই চাইলাম—কিন্তু—?"

আবার বাধা দিয়া বললেন, "আবার কিন্তু কী? দেখুন মশাই আপনাদের ঐ ভদ্রসমাজের 'কিন্তু' 'যদি' 'প্লীজ' এই শব্দগুলো এখানে চলবে না বুঝেছেন?" বলিলাম, "বুঝলাম, তবু দোষ করে'—?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "মাপ চাওয়ার দরকার এই ত বলবেন?"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

বলিলেন "বেশ, মাপ করতে পারি—একটা সর্ত্তে—"

তাহার কথার গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "সর্ত্তে? কি সর্ত্তে?"

"সর্ত্তটা এই—যে মাপ করতে পারি যদি আপনাকে তুমি বলবার

অধিকারটুকু দেন—আপনি আমার চেয়ে বয়সেও অন্ততঃ দশ বারো বছরের ছোট ত নিশ্চয়ই।"

এতক্ষণে যেন আমার মনের সব জড়তা, সব লজ্জা নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। মানুষটির অকপট সারল্য এবং স্বচ্ছ মনের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম আর যাহাই হোক এই মানুষটার সহিত অহেতুক সৌজন্যের প্রয়োজন নাই।

বলিলাম, "বেশ তা না হয় দিলাম কিন্তু আপনি—"

স্ক্রু-ড্রাইভারটা আমার নাকের কাছে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুরাইয়া বলিল "ঐটি হবে না—আমাকে ত প্রথমেই 'তুমি' বলেছ বাবা, আবার এখন কেন ভদ্রলোক সাজছ? ও চলবে না।—"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "বেশ তাই হবে।"

মুখে বলিলাম 'বটে তাই হবে' কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যে কি করিয়া তাহা হইবে তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। কারণ বয়সের পার্থক্য সম্বন্ধে পুরুষ মানুষেরা অত্যন্ত সচেতন। এবং এই সচেতনতা একটি মানুষের সঙ্গে অপর একটি মানুষের হৃদ্যতার প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। আমার সৌভাগ্য যে সেদিন তাহার প্রস্তাবকে সহজেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে সেদিন কোন তুচ্ছ কারণবশতঃ যদি এই মানুষটিকে আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ না দিয়া নির্বোধের মত দূরে সরিয়া থাকিতাম তাহা হইলে মানব মনের যে অপ্রকাশিত রহস্যের বিদ্যুৎ-দীপ্তি মানব-চিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়, সে রহস্যের আভাসটুকু হয়ত জীবনে পাইতাম না। একটি মানুষের জীবনের ইতিহাসের কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষটির জীবন যে কিভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় সে রহস্যের সন্ধানটুকু হয় ত কোন দিন পাইতাম না। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন অভিজ্ঞতা

বাড়িয়া যায় তখন সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আভিজাত্য বিস্মৃত হইয়া মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকু সহজভাবে দেখিবার শক্তি থাকে না। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি দেখিয়া দেখিয়া মনের পরশ-রতনটি বুঝি নষ্ট হইয়া যায়। অনভিজ্ঞ মনের সহজ সারল্য দিয়া মানুষের বাহ্যিক আচরণের অন্তরালস্থিত অন্য মানুষটাকে চিনিয়া লওয়া প্রথম-জীবনে খুব কঠিন হয় না। কারণ ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা করিবার জন্য আকুলতাও থাকে যতখানি, ঘনিষ্ঠতা করিবার সময় আন্তরিকতাও ঠিক ততখানিই থাকে। কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহারে সাংসারিক বুদ্ধির ছাপ থাকেনা বলিয়াই বোধ হয় মনের কথাটি সোজা কথায় যেমন বলিতে দ্বিধা জাগে না, শুনিবার সময়ও উন্নাসিক মনোবৃত্তি প্রসূত নীরব ঔদাসীন্য বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সহিত মানুষের বেদনাকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাই কথাচ্ছলে আমায় 'তুমি' বলিবার অধিকার প্রার্থী মানুষটির ইচ্ছা পূর্ণ করার মধ্যে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার ইচ্ছাটাই প্রকারান্তরে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মানুষকে চিনিবার সুযোগ জীবনে খুব কমই আসে। আর যদিও বা কাহারও জীবনে সে সুযোগ আসে, তখন হয় ত তাহারই কোন নির্বুদ্ধিতার জন্য সেই সুযোগ অবহেলায় হারাইয়া যায়। সব মানুষই যদিও মহামানুষ হইবার জন্য জন্মায় না; তবু প্রতিটি মানুষের জীবনেই সময় বিশেষে এমন দুই একটি ঘটনা ঘটিয়া যায়, যে সব ঘটনার মূল্য সেই ব্যক্তি বিশেষের কাছে ছাড়া অন্যের কাছে কিছুই নয়—হয়ত বা অন্যের কাছে তাহা নিতান্তই বিদ্রূপ বা অবজ্ঞার সামগ্রী। অথচ এমনি দুই-একটা ছোট বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের জীবনটাকে এমনি এক অদ্ভুত পথে ঠেলিয়া দেয় যে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে মনে হয় ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি মানুষই অসাধারণ। সাধারণ মানুষের

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে এমনিতর ঘটনার প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয়; এবং প্রতি মানুষের জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে ঘটিয়া চলিয়াছে। অথচ এমনি নিঃশব্দে এবং অনাড়ম্বরভাবে এইসব ঘটনাগুলি ঘটে যে পাশের মানুষটি পর্যন্ত টের পায় না। অথবা জানিতে পারিলেও স্বভাবসুলভ অবজ্ঞার দ্বারা কিংবা নিজের জীবনের কোন অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিয়া ইহার মূল্য নির্ধারণ করে—এইটুকুই বোধ হয় ভুল ঘটে। আমার জীবনেও হয়ত ইহার ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু কেমন করিয়া জানি না আমার অন্তর্দৃষ্টি সহসা জাগিয়া উঠিল, তাই নিজের অজ্ঞাতসারেই বিকাশ রায়ের জীবনের সম্বন্ধে একটা কৌতুহল জাগিয়া উঠিল এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার প্রতি আমার সংসারানভিজ্ঞ মনটা ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিকাল বেলা মেসে ফিরিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া, হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগের উদ্যোগ করিতেছি সহসা সমস্ত মেসটা জুড়িয়া এমন একটা চীৎকার সুরু হইল যে প্রথমটা ভাবিয়া পাইলাম না যে কি ঘটিয়াছে। সে চীৎকার যে প্রাণভয়ের চীৎকার নহে এবং মানুষের চীৎকার তাহা বুঝিবার মত ভাবাজ্ঞান আমার ছিল। কিন্তু চীৎকারটা কিসের এবং কিজন্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঘরের সম্মুখের বারান্দা দিয়া উঁকি মারিতেই "গুরুজী কি জয়" ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলাম। হিন্দু মেসের হিন্দু ছেলেদের গুরু থাকাটা কিছু অন্যায় নহে অথবা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাই বলিয়া গুরুজীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করিবার জন্য এমন পরিত্রাহি চীৎকার শুনিয়া গুরুজীটি কোন জাতীয় জীব তাহা দেখিবার জন্য ভাল করিয়া উঁকি মারিতেই দেখি Mechanical foreman বিকাশ রায় দুটি নধর কালো পাঁঠা সঙ্গে করিয়া সহাস্যমুখে উঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়া। এবং তাহাকে ঘিরিয়া মেসের অন্যান্য লোকজন

এমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যে হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় দীর্ঘ অদর্শনের পর নাবালক পুত্রদের জন্য সামান্য কিছু উপহার লইয়া বিদেশ হইতে সদ্য আগত পিতাকে ঘিরিয়া তাহার শিশু সন্তানেরা উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি করিয়া উঠিতেছে। এবং কলধ্বনি মুখরিত সেই সাবালক শিশুর দলটিকে কোনমতে নিরস্ত করিয়া বিকাশ রায় বলিল, "চেঁচাসনে ষাঁড়ের মত, চুপ কর্। তোদের চেঁচামেচি শুনে পাঁঠা দুটো পর্যন্ত ভড়কে গিয়েছে—"

বস্তুতঃ পাঁঠা দুইটাও আপন ভাষায় কি কতকগুলো শব্দ করিয়া উঠিতেছে। বিকাশ বলিল, "খেতে দে পাঁঠা দুটোকে। সারাদিন উপোস করে আছে।"

কে একজন রসিকতা করিয়া বলিল, "আমরাও না হয় ওদের জন্য রাত্রি পর্যন্ত উপোস করে থাকবো।"

বিকাশ বলিল, "তাতে ত লাভ হবে না কিছু, বরং কিছু খেতে দে এখন তারপর দেখা যাবে।"

কে একজন বোকার মত প্রশ্ন করিল, "হঠাৎ পাঁঠা নিয়ে এলে যে গুরুদেব ?"

গুরুদেব উত্তর করিল, "ভেবে দেখলাম তোরা একা একা মেসে থাকিস গল্প টল্প করার লোকের অভাব হয়; তাই দুটো নিয়ে এলাম।"

আর একজন কে বলিল, "গল্প করার জন্য তুমিই ত আছ।"

প্রত্যুত্তরে বিকাশ বলিল, আমার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছে না কিনা—তাই—বঙ্কু কোথায় গেল, বঙ্কা ?"

বঙ্কু মেসের চাকর। ডাক শুনিয়া হাজির হইতেই পাঁঠা দুটোকে তাহার কাছে দিয়া বলিল, "একটা আজকে কাটিস, আরেকটা রেখে দিস্। বুঝলি ?"

বঙ্কু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে।

বিকাশ সমবেত লোকগুলিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "সর সর ভিড় ছাড় পাঁঠা দুটো হাঁপিয়ে উঠেছে" আবার একটা হাসির রোল উঠিল এবং আরেকবার 'গুরুজীকি' জয় ধ্বনির মধ্যে গুরুজীকে আপ্যায়িত করিয়া সকলে চলিয়া গেল। বিকাশ রায় ধীরে সুস্থে উপরে আসিয়া আমাকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কি মাষ্টার কি রকম দেখলে ?"

হাসিয়া বলিলাম, "কোনটা ? পাঁঠাদুটোকে না তোমার দলবলকে ?"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "সাবাস, তুমিত humour ও জানহে। আমি ভেবেছিলাম তুমি নিরেট 'Science.'

বলিলাম "তা না হয় হল কিন্তু হঠাৎ 'মাষ্টার' নামটা কেন বলত ?"

বলিল, "ওঃ, ওটা কিছু নয়, আমি অনেককেই অনেক নাম দিয়েছি— ওটা আমার ভালবাসার নাম।" বলিয়া একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিল।

বলিলাম, "আমায় এর মধ্যেই ভালবেসে ফেলেছ নাকি ?"

কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বিকাশ বলিল, "এর মধ্যে মানে ? 'তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।' তুমি বলছ কি মাষ্টার ?"

হাসিয়া বলিলাম, "রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়া অভ্যেস আছে দেখছি।" আমার কাঁধে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, "আছে হে আছে, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসুন্দর সবই একটু-আধটু পড়া আছে। শুনতে চাও ত শোনাব। By the way সন্ধ্যেবেলা কোথাও বেরুবে নাকি ?"

বলিলাম, "কোথায় যাব ? আজ সবে মাত্র এসেছি। এখনও মেসের লোকদের ভাল করে চিনি না। বাইরে কোথায় যাব ?"

বামচক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটা পরিচিত ভঙ্গী করিয়া বলিল, "যাবার জায়গার অভাব হবে না হে, যাবার জায়গা আছে অনেক—"

রহস্যটা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "না, সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই।"

বিকাশ কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। সত্যি কথা বলিতে কি তাহার এই রহস্যটুকু আমার বিশেষ ভাল লাগে নাই। এমন কি কথাটা শুনিয়া লোকটার প্রতি একটু বিরক্তই হইলাম। তাহার রহস্যপ্রিয়তার পরিচয় আগেই পাইয়াছি এবং মিঃ ঘোষের মুখেও শুনিয়াছি। কিন্তু অল্প পরিচয়ে যে রহস্য ভাল লাগিয়াছিল—স্বল্প ঘনিষ্ঠতার পরে এই রসিকতা ভাল লাগে নাই। তখনও বুঝিতে পারি নাই মানুষটিকে চিনিতে ভুল করিয়াছি।

(২)

বিকাশের সঙ্গে আমার পরিচয় নিতান্ত অভাবিত ভাবেই। এবং এমন এক পরিবেশের মধ্যে তাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল যে সেই পরিবেশের মধ্যে মানুষের স্বরূপটি বুঝিতে পারা সহজ নহে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সম্মত যান্ত্রিক সভ্যতার নারকীয় পরিবেশের মধ্যে তাহার সহিত পরিচয়। সেই বিপুল কর্ম কোলাহলের মধ্যে মানুষের কণ্ঠের স্বাভাবিক সুরটুকু নিঃশেষে মিলাইয়া যায়, এবং প্রাণশক্তির সেই নিদারুণ অপচয়ের মধ্যে মানুষের মনের স্বাভাবিক বিকাশটুকু চোখে পড়েনা। এই জীবনের এমন একটা মাদকতা আছে যে সেই যন্ত্রদানবের লৌহমুষ্টির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে মানবাত্মার আকুল আর্তনাদের মধ্যে যদিও বা সহসা কোন সতেজ মানুষের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কাণে আসে তবুও তাহা যন্ত্রদানবের উন্মত্ত অট্টহাস্যের নীচে চাপা পড়িয়া যায়, এমন কি বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তিও হয়না। সুতরাং সেই পরিবেশের মধ্যে যখন হঠাৎ বিকাশের দেখা পাইলাম তখন তাহাকে যে কিছুটা ভুল বুঝিয়াছিলাম তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। শুধু পরে অদৃষ্টকে এই কথা স্মরণ করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছি যে আমার সেই ভুল নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল অতি অল্পকালের মধ্যেই। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে যে কি হইত তাহা বলা যায় না। এবং এ ভুল ধরা না পড়িলে বিকাশের জীবনের কতখানি ক্ষতি হইত জানিনা তবে আমার জীবন যে সত্যই অপূর্ণ থাকিয়া যাইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রতি মানুষের অন্তরের গভীরে যে কত

অপ্রকাশিত বেদনা প্রতিনিয়ত কি ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিনা। দেখিবার সুযোগও হয় না। কারণ প্রথমতঃ আমরা নিজেদের জীবন লইয়াই এত বিব্রত বোধ করি যে অপরের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগ মেলে না। দ্বিতীয়তঃ সব মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গেলে নিজের জীবনটা অনাবশ্যক ভাবেই ব্যর্থতার পানে চলিয়া যায়। তবুও মাঝে মাঝে নিতান্ত কৌতূহলের বশে অন্যের অন্তরের মধ্যে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া যখন মানুষটির অন্তরের অন্তহীন রহস্যের কিয়দংশ দেখিতে পাই তখন বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এমনই হইয়াছিল বিকাশের ক্ষেত্রে। মানুষটাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম সত্যই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সেভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহাই নহে, বরং অপ্রয়োজনীয় বোধে যে মানুষটার জীবনটাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িত না হইতে দিবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হইয়াছিলাম, সেই মানুষটার সঙ্গ লাভের ব্যর্থ প্রত্যাশায় কারখানা জীবনের শেষ দিনগুলি লোক চক্ষের অন্তরালে অনেক চোখের জল ফেলিয়াছি। মানুষকে ভুল বুঝিবার জন্য বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না, সঠিক বুঝিতে পারাই অধিক কঠিন। এবং বিকাশকে অনেকে যে ভুল বুঝিয়াছিল সেজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। কারণ সে নিজেকে ভুল বুঝাইবার জন্য এত রকম আয়োজন করিয়াছিল যে সেই আয়োজনের বোঝা ঠেলিয়া তাহাকে চিনিবার মত কষ্ট করিবার মানুষ কারখানা জীবনে পাওয়া কঠিন। আমি যে কেমন করিয়া পারিয়াছিলাম জানিনা। বোধহয় অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ছিলাম না বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

বিকাশের ঘরটা ছিল আমার ঘরের পাশেই। মেসে আসিবার

দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাথার কাছে ঘড়িতে দেখি প্রায় ১টা বাজে। অসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বদ অভ্যাস কোনদিনই ছিল না, বলিয়া আবার শুইবার উপক্রম করিতেছি হঠাৎ একটা করুণ সুরের রেশ কানে আসিয়া বাজিল। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। অপর্যাপ্ত চাঁদের আলোয় চতুর্দিক যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছে—দূরে কারখানা ঘরের ইলেকট্রিকের আলোগুলো জ্বলিতেছে; নাইট সিফ্‌টের কাজ চলিতেছে। কারখানার মেসিনের মৃদু আওয়াজটুকু ছাড়া অন্য কোন শব্দ নাই। ছোট্ট সহরটা যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতার মধ্যে দূরাগত করুণ সুরের আভাসটুকু মনের মধ্যে যে কি এক অপরিচিত বেদনা জাগাইয়া তুলিল জানিনা। শুধু হঠাৎ মনে হইল যেন এত করুণ সুর জীবনে কখনও শুনি নাই, এবং সেই সুরের দুনিবার আকর্ষণে বুকের ভিতরটা যেন অব্যক্ত ব্যথায় গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। কে যেন বেহালা বাজাইতেছে। কে বাজাইতেছে জানি না, কি সুর তাহাও জানি না, তবুও সেই অপরিচিত বাদকের উদ্দেশ্যে অস্ফুটে কি যেন বলিয়া উঠিলাম। সহরের মানুষ আমি, বেহালা কখনও শুনি নাই তাহা নহে। যথেষ্টই শুনিয়াছি। কিন্তু সেই চন্দ্রালোকিত নির্জ্জন রাত্রে একান্ত স্তব্ধতার মধ্যে যে সুর শুনিলাম তাহা যেন শুধু বেহালারই নহে। মনে হইল যেন বাদকের অন্তরস্থিত গোপন বেদনা-রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া বেহালার সুর আমায় পাগল করিয়া দিল। সাবধানে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম পাছে বিকাশ জানিতে পারে। বিকাশ জানিলে ক্ষতিটা যে কি হইবে তাহা ভাবি নাই। শুধু মনে হইল যেন শুদ্ধ রাত্রে বেহালার সুর শুনিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘরের বাহির হইবার কথাটা

তাহার না জানাই ভাল। তাই ধীরপদে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিতেই দেখি বিকাশের ঘরে বাহির হইতে শিকল লাগান। বুঝিলাম সে ঘরে নাই; মনে হইল বেহালার সুর তাহাকেও ঘর-ছাড়া করিয়াছে। বিকাশকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ইচ্ছা ছিল না। তবু সে যে ছাদে গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া আমিও উঠিয়া আসিলাম। এবং সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ছাদের পশ্চিম দিকের পাঁচিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাই-তেছে বিকাশ স্বয়ং। তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না বটে কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখিয়া ভুল করিবার মত লোক দ্বিতীয় কেহ মেসে ছিল না এবং আরও আশ্চর্য্য হইলাম পাঁচিলের উপর একটি বোতল ও গেলাস দেখিয়া। কারণ বোতলের মধ্যে যে গঙ্গাজল ছিল না তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার ছিল। কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া নিস্পলক নয়নে সেই অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীতের সুধারস আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলাম। বোধ করি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চেতনা হারাইয়াছিলাম।

কতক্ষণ যে দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ যখন বেহালা থামাইয়া বিকাশ রায় স্তব্ধ আকাশের পানে কাহার উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রণতি জানাইয়া মদের বোতলটি লইবার জন্য হাত বাড়াইল, তখন বলিয়া উঠিলাম, "বাঃ!"

বোধ করি ঐটুকু বলা আমার উচিত হয় নাই এবং অশরীরী প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে আমার কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া বিকাশ যেন ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কে?"

বলিলাম, "আমি।"

আমায় চিনিতে পারিয়া বলিল, "কে মাষ্টার? এত রাত্রে কি কর্চ্ছ?"

জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "তোমার বেহালা শুনছিলাম।"

বিকাশ কোন কথা না বলিয়া হাসিয়া গেলাসটার অর্দ্ধেক মদে পূর্ণ করিয়া একটা চুমুক দিল।

এতক্ষণে যেন হারাণ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিলাম, "বিকাশ—?"

বাধা দিয়া বলিল, "উঁহুঃ, No question to night please."

তাহার কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না কিন্তু তাহার মধ্যে নিছক রহস্যের সুর যে ছিল না তাহা নিশ্চিত এবং যেন একটু দৃঢ় আদেশব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর বলিয়াই মনে হইল। ইহার পর কোন কথা বলিতে নিজেরই মনের মধ্য হইতে কোন সমর্থন পাইলাম না। আজ বুঝিতে পারি ভালই করিয়াছিলাম। কারণ কিই-বা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল? হয়ত কতকগুলা অর্থহীন প্রশ্ন করিয়া তাহার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইতাম। কারণ একান্ত নীরবতার মধ্য দিয়া দুইটা মানুষ যখন অতি কাছাকাছি আসিয়া পড়ে তখন সামান্য শব্দের আঘাত সেই নীরবতা বিচ্ছিন্ন করিয়া যে ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তাহারই স্রোতে মানুষ দুইটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং ভালই হইয়াছিল যে তাহাকে প্রশ্ন করি নাই।

শুধু বলিলাম, "আর একটু বাজাও।"

প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আজ আর নয়। চল নীচে যাই।"

গেলাসের মদটুকু অবলীলাক্রমে মুখের মধ্যে ঢালিয়া গেলাস বোতল এবং বেহালাটা লইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিল। আমিও সাথে সাথে নীচে আসিয়া তাহার ঘরে ঢুকিতেই ডান হাত প্রসারিত করিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে বলিল, "No no, not here. Good night."

অপরিসীম বিস্মিত হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়াও বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটিতে চাহিল না। বিছানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এই রহস্যময় মানুষটির কথা। কিছুক্ষণ আগে পূর্ণিমার আলোক প্লাবিত নিস্তব্ধ রাত্রের বুকে ধ্যানমুগ্ধ মানুষটির যে ছবি দেখিয়া আসিয়াছি তাহারই স্মৃতিটুকু বারবার ভাসিয়া উঠিয়া আমার অনভিজ্ঞ চিত্তের তলদেশে এক গভীর বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিল। মনে হইল কে এই অদ্ভুত মানুষটি?

(৩)

কয়টা দিন বেশ ভালভাবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু মুস্কিলে পড়িলাম আমি। একে ত কারখানা জীবনের সহিত আগে কোন পরিচয় ছিল না, তাহার উপর মেসে থাকার অনভ্যাস আমায় মনে মনে পীড়িত করিয়া তুলিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া কারখানার চাকরী লইয়া আসিয়াছিলাম, দূরদৃষ্টির অভাব ছিল বলিয়া নয়, উপায় ছিল না বলিয়াই। আশৈশব পারিবারিক জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে বড় হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে গৃহচ্যুত হইবার মত দুর্ভাগ্যের কথা কখন চিন্তায়ও স্থান পায় নাই। এবং কার্যকালে যখন তাহা ঘটিল তখনও কারখানা জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য বিশেষ চিন্তিত হই নাই। ভাবিয়াছিলাম কিই-বা এমন অসুবিধা হইবে? আমার মত আরও কত মানুষই ত সেখানে কাজ করে, আমিই বা পারিব না কেন? তখনও বুঝি নাই যে জেদের বশে নিজের শক্তির উপর একটু অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। নিজের ভুল বুঝিতে পারিলাম কয়েকদিনের মধ্যেই। ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করার ফলে মানুষ হিসাবে যে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করি নাই তাহার প্রমাণ পাইলাম কারখানা জীবনে। সচরাচর ভাল ছাত্রদের মত আমিও কমকথা বলিতাম। কিছুটা সংস্কারবশতঃ, কিছুটা অভ্যাসজনিত। বিশেষতঃ বেশীকথা বলিতে হইলে এমন কয়েকটা কথা বলিতে হয় যাহার অপ্রয়োজনীয়তা সর্ববাদিসম্মত। তাই কোন রকমে সহপাঠিদের সহিত সহজ সৌজন্য রক্ষা করিয়া ছাত্র-জীবনের উজ্জল মুহূর্ত্তগুলির সদ্ব্যবহার

করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছি কিন্তু কারখানা জীবনে পদার্পণ করিয়াই বুঝিলাম আর যাহাই করিয়া থাক ছাত্রাবস্থার সেই অখণ্ড নির্লিপ্ততা নিছক মঙ্গলই করে নাই। কারণ কারখানা জীবনে গম্ভীর প্রকৃতি মানুষের অবস্থা যে কত মর্মান্তিক তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। দিনের বেলা কাকের দলের মধ্যে যদি ভুল করিয়া একটি পেঁচক আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার যে দুরবস্থা হয় আমার অবস্থা বোধকরি তাহা অপেক্ষা কিছু কম খারাপ হইল না। যাচিয়া আলাপ করা ত দূরের কথা, কেহ আলাপ করিতে আসিলে সহজ ভাবে কথা বলিতে পারিতাম না। ফলে সহকর্মী মহলে অহংকারী বলিয়া একটা অকারণ মিথ্যা দুর্ণাম রটিতে বিশেষ দেরী হয় নাই। অথচ কেহই ভাবিয়া দেখিল না ইহার কারণটা কি? ইহার পর আবার মেসে থাকাটাত একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

মেসে যাহারা থাকে তাহারা অধিকাংশই অল্প বেতনের কর্মচারী! এবং তাহাদের কাজের ধারা যতই বিভিন্ন প্রকারের হউক না, শিক্ষার ধারা একই প্রকার। অর্থাৎ I.A অথবা Isc. পাশ (যদিও লিখিবার সময় BA অথবা Bsc. Plucked)—কিন্তু সমস্যা এ জন্যও নহে। সমস্যার কারণ আরও অদ্ভুত। নিজের সম্বন্ধে একটা বিরাট ধারণা কোন দিনই ছিল না। কিন্তু কারখানা জীবনের আবেষ্টনীর মধ্যে যে সমস্ত মানুষের সহিত পরিচয় ঘটিল, তাহাদের সহিত নিজের কোথাও যেন কোন মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। জীবনের প্রতি তাহাদের গোপন অশ্রদ্ধার আভাস যেন তাহাদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে, তাহাদের কথাবার্ত্তা বা আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িত। সত্য কথা বলিতে কি জীবনের প্রতি এই কৌতুক মিশ্রিত অশ্রদ্ধাই যেন আমায় আঘাত করিত' বেশী।

অনভিজ্ঞ বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, জীবনকে এতটা অশ্রদ্ধা করিতে শিখি নাই কখনও। কেমন যেন মনে হইত জীবনে অসীম আনন্দ বা সুখের অধিকারী হয়ত নাও হইতে পারি, কারণ সকলের ভাগ্যে তেমন সুযোগ ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু তবুও নিজের মনের পরশমনির সাহায্যে নিজের সামান্য জীবনকেও যেন মহনীয় করিয়া তোলা যায়। এই বিশ্বাস কেমন করিয়া আসিয়াছিল জানি না। কিন্তু ইহা আমার শুধু বিশ্বাসই নয়, বরং যেন আমার জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য। আমি কিছুতেই ভাবিতে পারি নাই এবং আজও ভাবিতে পারি না যে কেবল মাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে একটা মানুষের জীবন বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। কেবলই মনে হইত ইহা কখনই সত্য নয়। তাই যখন দেখিতাম আমারই মত কয়েকজন সামান্য মানুষ জীবনের প্রারম্ভেই জীবন সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়া পরিবেশকে যোগ্যতার অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়া, শোচনীয় পরাজয়ের হাত হইতে নিজেদের জীবনকে বাঁচাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টায় মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতেছে, তখন কেবলই যেন অনুভব করিতাম কোন এক অপরিচিত বেদনায় আমার সমস্ত অন্তর দুঃসহ ব্যথায় গুমরিয়া উঠিতেছে। এবং এই অনুভূতির জন্যই সেই মানুষগুলির সঙ্গে নিজের জীবনের অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য চোখে পড়িয়া যাইত যে শত চেষ্টায়ও আর তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে পারিতাম না। এই অবস্থায় বেশী দিন থাকিলে আমার অবস্থা কি যে হইত তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। কিন্তু যাহার জন্য হইতে পারে নাই, যে মানুষটার উপস্থিতি আমায় এক শোচনীয় পরিণাম হইতে অক্লেশে রক্ষা করিয়াছিল তাহার রহস্য আর ও দুর্জ্ঞেয়!

কয়েকদিন পর একদিন বিকালবেলায় চুপচাপ নিজের ঘরে বসিয়া আছি এমন সময় বিকাশ ঘরে ঢুকিল, বলিল, "কি মাষ্টার কোথাও বেরোওনি যে ?"

নীরস কণ্ঠে জবাব দিলাম, "যাব কোথায় ? যাবার যায়গা কি আর রেখেছ তোমরা ?"

হাসিয়া বিকাশ বলিল কেন, "জায়গা কি আমরা খেয়ে ফেলেছি নাকি ?"

বলিলাম, "একরকম তাই, যেদিকে তাকাই খালি বস্তী না হয়ত ফ্যাক্টরীর চিমনী, না হয়—"

বাধা দিয়া বিকাশ বলিল, "ওগুলো বুঝি একটুও ভালো লাগে না ?"

মাথা নাড়িয়া জবাব দিলাম, "না ।"

বলিল, "যাবে আমার সঙ্গে এক জায়গায় ?"

তাহার কথার ধরণটা শুনিয়া সপ্রশ্ননেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিলাম। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না। কয়েক-দিন আগে এমনি ধরণের একটা কথা সে বলিয়াছিল, তাহা ভুলি নাই। তাই কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

আমায় নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কি হে, যাবে না ?"

এইবার বলিলাম, "কোথায় ?"

"চল না আগে।"

সে যেন কিছুটা জোর করিতেছে বলিয়া মনে হইল। তাই সন্দেহ দ্বিগুণ হইয়া গেল।

বলিলাম, "আগে বল কোথায় ?"

বলিল, "না বল্লে যাবে না ?"

বলিলাম, "না শেষে কোথায় নিয়ে যেতে নিয়ে যাবে তুমি ?"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ঠিক ধরেছ। তবে জায়গাটা খারাপ নয়। বিনা দ্বিধায় যেতে পার, চল—।"

ভাবিলাম দেখাই যাক না কোথায় লইয়া যায়। বলিলাম, "চল। কিন্তু আজেবাজে জায়গায় নিয়ে গেলে ভাল হবে না।"

সহসা আমার ঘাড়টা ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "তুমি কি কচি খোকা নাকি ?"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া মনের মধ্যে আবার সন্দেহ জাগিল। কি আছে লোকটার মনে ? যাহাই হউক বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর হঠাৎ বিকাশ প্রশ্ন করিল, "পকেটে টাকা আছে ত মাষ্টার ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, "কেন বল ত ?"

ধূর্ত্তহাসি হাসিয়া বলিল, "প্রয়োজন হতে পারে।"

ইহার পরও গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে সন্দেহ হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলাম, "তোমার মতলবটা কি বলত ?"

হঠাৎ সবলে আমার হাতটা ধরিয়া বলিল, "মৎলব খুবই খারাপ চল—" বলিয়া একটা টান দিল।

বজ্রমুষ্টি বলিয়া একটা কথা গল্পের বইতে বহুবারই পড়িয়াছি, কিন্তু বস্তুটা যে কিরকম সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। হঠাৎ বিকাশের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে নিজের হাতখানার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বুঝিলাম বজ্রমুষ্টি বোধহয় ইহাকেই বলে। মনে হইল শুধুত হাতটা নয়, যেন আমার দেহের সমস্ত পেশীগুলিকে কে একটা যন্ত্রের সাহায্যে পিষিয়া ফেলিতেছে। এবং সেই সঙ্গে এই মানুষটির

শারীরিক শক্তির অসামান্যতা উপলব্ধি করিয়া সহসা মনে হইল সে ইচ্ছা করিলে বোধ হয় এখন আমায় দিয়া সব কিছুই করাইয়া লইতে পারে। কারণ তাহার লৌহ-মুষ্টির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সমস্ত ডান হাতটা অবশ হইয়া গিয়াছিল যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করিয়া বলিলাম, "দোহাই তোমার হাতটা ছাড়ো—ভেঙ্গে যাবে।" বলিল, "ছাড়লে দৌড মার্বেনা ত ?"

হাসিবার কথা হইলেও হাসিবার মত মনের অবস্থা তখন নয়।

বলিলাম, "না দৌড়েও যে তোমার সঙ্গে বিশেষ সুবিধা কর্তে পার্ব তা মনে হয় না।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া হাতটা ছাড়িয়া দিল।

বেশ মনে আছে তাহার হাতের চাপে যে দাগ পড়িয়াছিল তাহা পরদিন মিলাইয়া গেলেও ব্যথা ছিল বেশ দুইচারি দিন।

হাতটা ছাড়িয়া দিয়া ডানদিকের একটা বাড়ী দেখাইয়া বলিল, "ঐ বাড়ীর কাছে গিয়ে লীলা বলে ডাক দেখি ?"

সে আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছে কিনা বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু একটা কেমন যেন ঘৃণায় সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিলাম, "আমায় তুমি কি পেয়েছ বল ত ?"

বলিল, "কিছুই না। কেন ?"

বলিলাম, "আমি ডাকতে পার্ব না।"

বলিল, "ডাকতেই হবে।"

বলিলাম, "যদি না ডাকি ?"

বলিল, "হাতের জোরটা'ত টের পেয়েছ, এখনও মালিশ কর্ছ—আবার চেপে ধর্ব।"

বলিলাম, "তোমার ইচ্ছে হয় বুকের উপর চাপতে পার কিন্তু আমি

ডাকতে পারব না।"

কঠিন কণ্ঠে বলিল, "ডাকবে না ?"

বলিলাম, "না।"

বলিল, "বেশ আমিই ডাকছি। সঙ্গে চল।"

যাইবার ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু পাছে যাইতে রাজী না হইলে হাতটা বা অন্য কিছু চাপিয়া ধরে এই ভয়ে তাহার সঙ্গে চলিলাম। কাঠের গেটটা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বাড়ীটার দরজার সামনে দুজনে দাঁড়াইলাম। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী বলিয়াই মনে হইল। অবশ্য বাড়ীর মালিক যে ফ্যাক্টরীর কর্মচারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ফ্যাক্টরী কোয়াটার্স ছাড়া অন্য বাড়ী এ তল্লাটে ছিল না। বুঝিতে পারিলাম না যে এখানে বিকাশের কি দরকার থাকিতে পারে। কিন্তু বেশী কিছু ভাবিবার আগেই বিকাশের ডাকে বছর সাতেকের একটি মেয়ে এবং দুটি ছেলে কলধ্বনি করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। এবং বিস্মিত হইয়া গেলাম যখন সেই ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে সমস্বরে "মা কাকু এসেছে" বলিতে বলিতে আনন্দের আতিশয্যে বিকাশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিকাশ ছেলে দুইটিকে দুইহাতে কোলে তুলিয়া লইল, মেয়েটা বিকাশের গলা ধরিয়া নিতান্ত অনাবশ্যকের মত ঝুলিতে লাগিল।

ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল "তোদের কাকুকে বল, এ বাড়ীতে যেন আর না ঢোকে।"

প্রত্যুত্তরে বিকাশ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বটে, মেয়ে জাতটা এমনি নিমকহারামই বটে। সে যাক্ কাকে নিয়ে এসেছি দেখুন।"

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল তিনি তেমনি ভাবেই বলিলেন, "কাকে এনেছ আমার সতীনকে।"

কথাটা শুনিয়া সভয়ে দুইপা পিছাইয়া গেলাম। ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কার বাড়ী হে?"

বলিল, "তোমার শ্বশুরবাড়ী। এই যে তোমার বউ ঝুলছে আমার গলায়"—বলিয়া লীলাকে দেখাইয়া দিল।

এতক্ষণ ধরিয়া সে যে আমার সঙ্গে কঠিন পরিহাস করিতেছিল সেটা বুঝিয়া লইয়া বলিলাম, "মুখে আগুন তোমার।"

বিকাশ চীৎকার করিয়া বলিল, "শুনছেন বৌদি, যাকে সঙ্গে এনেছি সে আমার মুখে আগুন দিতে চাইছে।"

উত্তর আসিল, "তা নেহাৎ অন্যায় বলেনি।"

বিকাশ বলিল, "বেশ তাহলে চল্লাম এখান থেকেই। আপনার কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হলে বলব যে এমন রায়বাঘিনী পুষেছেন যে ভদ্রলোক সঙ্গে করে আপনার বাড়ী যাওয়া যায় না।"

অন্তরালবর্ত্তিনী বলিয়া উঠিলেন, "ঝাঁটা মারো—এই কুলীর দেশে আবার ভদ্রলোক কোথায় গো? সবত তোমাদের মত—ওমা!"

কথাটা বলিতে বলিতে তিনি দরজার বাহিরে আসিয়া আমায় দেখিয়াই শেষ কথাটুকু বলিয়া দেড়হাত ঘোমটা টানিতে টানিতে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

বিকাশ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, "ওকি লজ্জা পাচ্ছেন যে—এই যে বল্লেন আপনার সতীন", বলিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল "চলহে মাষ্টার ভিতরে যাওয়া যাক্।"

তখনও বুঝি নাই বাড়ীটা কাহার। তবুও এখানে আসিবার আগে বিকাশ যে নাটক অভিনয় করিয়াছিল তাহার শেষাংশটি দেখিয়া বুঝিলাম আর যাহাই হোক্ বিকাশের কথাই ঠিক অর্থাৎ জায়গা খারাপ নহে। ভিতরে ঢুকিয়া সস্ত্রীক মিঃ ঘোষের ছবি দেখিয়া

বুঝিলাম এটা মিঃ ঘোষের কোয়ার্টার। এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইলাম। এবং বিকাশের প্রথমদিনের কথাবার্তায় তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যে হীন সন্দেহ জাগিয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া নিদারুণ লজ্জায় নিজের কাছেই মাথা নীচু হইয়া গেল। সেই সঙ্গে তাহার অসামান্য পরিহাস-রসিকতা স্মরণ করিয়া মিঃ ঘোষের বলা কথাটি মনে পড়িয়া গেল যে রসিকতা করিবার সুযোগ পাইলে বিকাশ ছাড়ে না। কথাটা কি মর্মান্তিক সত্য কথা।

ঘোষ-গৃহিনী এই কুলির দেশে ভদ্রলোকের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সম্বন্ধে গুরুতর অবিশ্বাস লইয়া বাহিরে আসিয়া আমায় দেখিয়া যে ভাবে অন্তর্ধান করিলেন তাহাতে মনে হইল হয়ত বা ভদ্রলোকের পরিচয়টুকু আমার চেহারার মধ্য দিয়া কোন রকমে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে যাহার জন্ম ঘোষ-গৃহিনীর চিনিতে কষ্ট হয় নাই। এবং সেই যে চকিতে অবগুণ্ঠনের তলায় আত্মগোপন করিয়াছেন আর বাহির হন নাই। বাহির হইবেন বলিয়া আশাও করি নাই। কারণ স্ত্রীলোক সহসা লজ্জা পাইলে, সে লজ্জা কাটাইয়া উঠিতে যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ঘোমটাত মাথায় নাইই; উপরন্তু সাংসারিক প্রয়োজনে পরনের কাপড়টাকে নিতান্ত বাহুল্য বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু সেই অসম্বৃত আবরণের মধ্যে হাল-ফ্যাসানের অশ্লীলতা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার চেহারার সংযত শ্রী এবং লাবণ্য তাঁহাকে এমন অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে যে রূপের মধ্যে মাদকতার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। এক ধরণের মেয়েদের চেহারায় একটা অটল গাম্ভীর্য ও কঠোরতার সঙ্গে কমনীয়তা ও লালিত্য মিশিয়া এমন এক অপরূপতার সৃষ্টি করে যে সহসা দেখিলে মনে হয় যেন

পরিপূর্ণ মাতৃত্বের পূর্ণ প্রতিকৃতি ; তাহাদের কথাবার্ত্তার সাবলীল ভঙ্গী, সস্মিত মুখের ঈষৎ বিচ্ছুরিত দীপ্তিময় হাস্যচ্ছটা, ক্ষমাসুন্দর চোখের শান্ত স্তিমিত দৃষ্টি সব কিছু মিলিয়া তাহাকে যেন এক কল্পলোকের মানুষ বলিয়া মনে হয়।

ঘরে ঢুকিয়াই সহাস্য মুখে বলিলেল, "তোমায় দেখে প্রথমে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে ছিলাম ভাই ? ভেবেছিলাম কেনা কে হবে বুঝি। তারপর আড়াল থেকে দেখি—ওমা গোঁফ দাড়ি নেই, একটা বাচ্চা ছেলে, তাই সাহস করে সামনে এলাম।"

তাঁহার কথার সহজ সুরটি আমায় সত্যিই মুগ্ধ করিয়া দিল। অপরিচিতা নারীদের সহিত পরিচয় করিবার মত সৌভাগ্য বা সুযোগ কোনদিন হয় নাই, এবং এজন্য চিন্তিতও হই নাই কখনও। কিন্তু একটি নারী যখন সমস্ত অপরিচয়ের দূরত্ব বিস্মৃত হইয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে একজন পরিণত বয়স্ক যুবককে অসঙ্কোচে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে তখন বিস্ময় না জাগিয়া পারে না। যদিও তিনি বিবাহিতা ও তিনটি সন্তানের জননী তবুও বয়স তাঁহার খুব বেশী হয় নাই, বড়জোর ২৭।২৮ হইবে। এবং আমার অজাতশ্মশ্রু মুখের চেহারা দেখিয়া তাঁহার মনে বাৎসল্যরস সঞ্চারিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তবুও তাঁহার কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহারের মধ্যে কি যেন একটা ছিল যাহা অবর্ণনীয়। এবং তাহারই জন্য তাঁহার সাবলীল ভঙ্গী এবং স্বাভাবিক আচরণে বিস্মিত হইলেও সন্দিগ্ধ হয় নাই। বরং কেমন করিয়া যেন মনে হইল আমাদের দেশে এমনি ধরণের নারীর প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু কেন যে একথা মনে হইল জানি না। তাহার মুখে 'ভাই' কথাটি শুনিয়া বেশী বিস্মিত হইলাম। কিন্তু তবুও স্বাভাবিক সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া কোন কথাই বলিতে পারিলাম না।

তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি এত লাজুক হয়ে বিকাশের সঙ্গে থাক কি করে?"

এইবার একটু জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলাম, "ওই আমার সঙ্গে থাকে, না হলে—"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। বিকাশ এতক্ষণ লীলার সঙ্গে কি যেন কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, আমার কথা শুনিয়া বলিল, "ইস্ আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোমার সঙ্গে থাকি।"

মিঃ ঘোষের স্ত্রী কৃত্রিম রাগের সহিত বলিলেন, "কাজ নেই ওর তোমার সঙ্গে মিশে, দুদিনে মাথাটা খেয়ে দেবে।"

বিকাশ তেমনি নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিল, "আমি খাব ওর মাথা? পাগল হয়েছেন। ওর মাথা খেয়ে আমার লাভ? কিছুই ত নেই মাথায়। যা ছিল M.Sc. পাশ কর্ত্তে কর্ত্তে শুকিয়ে গেছে সব।"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, "ওমা তুমি M.Sc. পাশ করেছ এই বয়সে? তোমার বয়স কত হল বল ত সত্যি করে? ২২ বছরের বেশী নয় তাই না?"

বয়সের প্রসঙ্গে লজ্জা পাইলাম। কারণ কেবলমাত্র বয়সের জন্যই যে একটি অপরিচিতা নারী আমাকে বালখিল্য বলিয়া ধরিয়া লইবে ইহা সত্যিই লজ্জাকর। বয়সটা বাড়াইয়া বলিলেও চলিত। কিন্তু বিকাশের ভয়ে পারিলাম না। নীরবে সম্মতি জানাইয়া স্বীকার করিলাম যে বয়স আমার ২২ বছরের বেশী নয়।

বৌদি বলিলেন, "আমি ঠিক ধরেছি—তবে হাঁ ভাই তোমার নামটা ত জানা হল না।"

আমি নাম বলিবার পূর্বেই বিকাশ একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ওর নাম সত্যেন।"

বৌদি বললেন "পদবী কী ?"

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি বৌদির মুখের সামনে বারকয়েক নাড়িয়া বলিল, "হুঁ হুঁ সেটি হচ্ছে না, ও বামুন, মুখুজ্যে আপনি ভেবেছেন যে চাঁদপানা ছেলে দেখবেন আর জামাই করে নেবেন সেটি হবে না।"

বৌদিও সহাস্যমুখে জবাব দিলেন, "সেত বটেই। ও কোনদুঃখে আমার জামাই হবে ? আমার ভাগ্য কি অত ভাল হবে ?"

বিকাশ লীলাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিল, এইবার তাহার মুখটা আমার পানে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "দেখ ত লীলা, ও লোকটাকে তোর পছন্দ হয়, বিয়ে কর্বি ?"

লীলা বেচারী লজ্জায় লাল হইয়া 'ধ্যেৎ' বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল !

বৌদি ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে লীলা, যাস্‌নে শোন—এই ?"

লীলা ততক্ষণে কোথায় পালাইয়াছে।

বিকাশ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "এঁঃ, বিয়ের কথায় এতটুকু মেয়ের আবার লজ্জা।"

আমায় বলিল, "কি হে মাষ্টার চা খাবে নাকি একটু।"

বৌদি বলিলেন, "খাবে নাকি মানে ? নিশ্চয় খাবে। আর শুধু চা দেব নাকি ? প্রথম দিন এসেছে বেচারা একটু মিষ্টিমুখ কর্বে না।"

প্রচণ্ড ক্ষুধা পাওয়ায় খাওয়ার কথা লইয়া আর কথা কাটাকাটি করিলাম না।

বিকাশ বলিল, "কি হে তুমি এমন গম্ভীর হয়ে গেলে যেন সত্যাই এটা তোমার শ্বশুরবাড়ী—আরে মুখ ফুটে কিছু বল ? নাঃ—তোমায় মানুষ করে তুলতে ভুগতে হবে দেখছি।"

বৌদি ভিতরে যাইতেছিলেন, যাইতে যাইতেই বলিলেন, "থাক্, ওকে আর মানুষ করতে হবে না তোমায়। তুমি নিজে একটু মানুষ হও দেখি ?"

বিকাশ বলিয়া উঠিল, "ইচ্ছে ত করে, ভয় লাগে যে। ভাবি বেশ আছি জন্তু জানোয়ারের মত, মানুষ হলেই হয়ত কে আবার জামাই করে নেবে আমায়।"

বৌদি পাশের রান্নাঘর থেকে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, তোমায় জামাই করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই।"

বিকাশ কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। আগাগোড়া সব কিছুই কিন্তু আমার কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রথমতঃ বিকাশের সঙ্গে বৌদির পরিচয়ের এত গাঢ়তা যে কি করিয়া হইল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অকুণ্ঠ আচরণ সত্যিই বিস্ময়কর। আমার না হয় বয়স ২২ বছর। কিন্তু বিকাশ ত তাঁহার অপেক্ষা বড়। অথচ তাহার সঙ্গে কথা বলিবার মধ্যে কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই। ইহাযে কেমন করিয়া সম্ভবপর হয় তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম। কিছুক্ষণ পরে বৌদি জল খাবারের থালা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বিকাশকে বলিলেন, "তুমি আজ এইখানে বসেই খাও।"

বিকাশ হাত বাড়াইয়া থালাটা লইয়া বলিল, "তার মানে আজ অন্নপূর্ণার ভাঁড়ারে ঘাটতি পড়েছে।"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন "হাঁ।"

আমি কিন্তু কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "তার মানে ?"

বৌদি বলিলেন, "বিকাশ ত মানুষ নয়। মনুষ্যরূপী—

বাধা দিয়া বিকাশ বলিল, "ষাঁড়।"

বৌদি বলিলেন, "তা নেহাৎ মিথ্যা নয়। যেমনি চেহারা, তেমনি গলার স্বর, তেমনি চালচলন "

বিকাশ লুচি চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "শুধু ষাঁড়ের বৌদিটি বেশ লোক" বলিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা মাষ্টার বলত আমাব চেহারাটা খারাপ।"

বলিলাম, "মোটেই না বেশ ত—"

আবার বাধা দিয়া বলিল, "নাকটা আমার একটু কাটা, তা এরকম নাক কান কাটা বড় বড় ভদ্রলোক ধুতি চাদর পরে বেড়ায়, আমিত তাদের চেয়ে অনেক ভাল।"

বৌদি বল্লেন, "কে তোমায় বলেছে তুমি তাদের চেয়ে ভাল।"

বিকাশ বলিল, "আপনিই বলেছেন।"

বৌদি গালে হাত দিয়া একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গী করিয়া বলিলেন "হা কপাল, ওকথা আবার আমি কবে বল্লাম ?"

বিকাশ বলিল, "আপনার আট আনার অংশীদার বলেছিলেন।"

বৌদি তর্জন করিয়া বলিলেন, "মিথ্যাবাদী কোথাকার।"

বিকাশ বলিল, "বটে আমি মিথ্যাবাদী ? বেশ তাহলে বলি আপনার প্রথমদিনের পরিচয় পর্বটা ?"

বৌদি যেন কিছুটা লজ্জা পাইয়া বলিলেন, "না, না, আবার সে সব কথা কেন ? তোমার যত সব ইয়ে—লোকের পিছনে লাগতে পেলে ছাড় না।"

বিকাশ বলিল, "ভয় নেই, আপনি ত একা নন—আরও দুচারজন লোক ঐরকম কথা বলেছেন, ঐ দেখুন না এই ভদ্রলোকটি সত্যেন—ইনিও আপনার মতই ভুল করেছিলেন ; তবে আপনার মত এত ছোট ধারণা করেনি—হাজার হোক আপনি মেয়েমানুষ ত, মেয়ে

মানুষের দৃষ্টি আর কত উঁচু হবে। কোন জিনিষের খারাপটুকু না দেখে মেয়েরা তৃপ্তি পায় না ”

বৌদি কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন আমি বাধা দিয়া বলিলাম "তোমার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় তুমি যেন মেয়েদের সব জেনে বসে আছ ?”

কথাটা এমনি কিছু উদ্দেশ্য লইয়া বলি নাই।

বিকাশ উত্তর দিল, "পাগল হয়েছ, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবাঃ ন জানন্তি, আমি ত কোন ছার।”

বলিলাম, "কিন্তু কথা শুনে ত তা মনে হয়না”

বৌদি বললেন, "দেখত ভাই! কথায় কথায় মেয়েদের গালাগাল দেয়। কেন মেযেরা তোমার কি ক্ষতিটা করেছে ? তুমি ত বিয়ে করনি।”

চক্ষের পলকে জিভ কাটিয়া চোখ বুজিয়া দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল "শিব শিব! ওসব অলুক্ষণে কথা কেন ?”

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা হে ভীষ্মদেব, বিয়েব বয়স এখনও পেরিয়ে যাওনি দেখা যাবে এসব রসিকতা কতদিন থাকে ?”

বিকাশ তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিল, "দুর্গা, শ্রীহরি। মা পাপপথে মতি দিও না!’

বৌদি তাহাব ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমিও হাসি চাপিতে পারিলাম না।

বৌদি সহসা গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো বিয়ে কি তুমি সত্যিই করবে না ?”

কৃত্রিম বিস্ময়ে বৌদির ভঙ্গী নকল করিয়া বিকাশ বলিল, "হা আমার

কপাল আমি বুঝি বিয়ে কর্তে আপত্তি করেছি।”

বৌদি বলিলেন, “না করনি আবার। তুমি আপত্তি না কর্লে কবে বিয়ে হয়ে যেত।”

বিকাশ বলিল, “আরে ধ্যেৎ—আমি বিয়ে কর্তে চেয়েছি বহুবার কিন্তু মেয়ের বাপের পছন্দ হল না।”

বৌদি কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়াও বলিলেন, “কেন?”

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিকাশ বলিল, “মেয়ের বাপ বল্লেন নাক কাটা জামাই নেব না।”

বৌদি তাহার সুন্দর মুখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “আহা, ভারী ত নাকে একটা কাটা দাগ, বলে কানা খোঁড়ার বিয়ে হচ্ছে আর তোমার নাকের দাগের জন্য—যত সব বাজে কথা।”

বিকাশ বলিল, “বিশ্বাস না হয়, আপনার আট আনার অংশীদারকে জিজ্ঞাসা কর্বেন। একবার এক মেয়ের বাপের পছন্দ হল; আমরা গেলাম মেয়ে দেখতে, মেয়ে আমায় দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মেয়ের মা ছুটে এলেন। মেয়ের জ্ঞান হলে মায়ের কানে কানে কি বল্ল, মেয়ের মা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্ল, ‘মেয়ে নাক দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে।’ বলতে ও পার্লামনা যে আমিই পাত্র। স্রেফ্ নাকে রুমাল গুঁজে দৌড়। সেই থেকে বিয়ের প্রস্তাব বন্ধ।”

বৌদি বলিলেন, “তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। আচ্ছা ঠাকুরপো তুমি এমন বাজে কথা বলতে শিখলে কি করে বলত?”

বিকাশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, “আমার ঠাকুরদার বাবা মর্বার সময় বিদ্যাটি আমায় কানে কানে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।”

বৌদি হাসিতে হাসিতে বিষম খাইয়া বলিলেন, “তোমার সঙ্গে কথায় পার্বার যো নেই যত সব আবোল তাবোল বকতে পারো খুব।”

আমায় বলিলেন, "তুমি এমন চুপটি করে বসে রইলে কেন ভাই ?"

বলিলাম, "আমি কি বলব তাই ভাবছি। বিকাশ যখন কথা বলে তখন কিছুইত বাকী থাকে না।"

বিকাশ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "না থাকে না, কথা বলতে জান ?"

বলিলাম, "তোমার মত কথা বলতে যে জানি না সেটা স্বীকার করি।"

বিকাশ বলিল, "প্রথম প্রথম সকলেই ও রকম ভিজে বেড়াল থাকে। গায়ের জল শুকোলেই তখন আসল চেহারা বেরিয়ে যায়।"

বৌদি বললেন, "সবাই তোমার মত ভিজে বেড়াল নয়।"

বিকাশ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মিঃ ঘোষের গলা শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই মিঃ ঘোষ পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাদের দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আরে কতক্ষণ এসেছ ?"

বৌদি বলিলেন, "এই কিছুক্ষণ হল।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "চা টা খেয়েছ ত বিকাশ।"

বিকাশ অম্লানমুখে বলিল, "আজ্ঞে না।"

বৌদি চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "খাওনি চা, মিথ্যাবাদী কোথাকার ?"

বিকাশ বলিল, "মিথ্যাবাদী আমি চিরকালই—কিন্তু চা-টা কখন দিয়েছিলেন বলুন ত ?"

বৌদি বলিলেন, "যখন এসেছিলে তখনই দিয়েছি—"

বাধা দিয়া বিকাশ বলিল, "সেত সকাল বেলা ভাতও খেয়েছি—"

বৌদি ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া বলিলেন, "রাক্ষস কোথাকার। কতবার চা খাবে ?" বলিয়া রান্নাঘরে চায়ের জোগাড় করিতে গেলেন।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আমিও একটু পাব নাকি ?"

মানুষের জীবনের বিস্তৃত পথে বিস্ময় যে কখন কোথায় কোন মূর্তিতে,

অপেক্ষা করিয়া থাকে তাহা মানুষ জানিতেও পারে না। এবং এমনিআশ্চর্য যে এমনিতর বিস্ময়ের মুহূর্ত্ত প্রতি মানুষের জীবনেই আসে। কিন্তু অন-ভাবিত বিস্ময়ের বিদ্যুৎদীপ্তি তাহাদের দৃষ্টিশক্তিকে এমন করিয়া ধাঁধিয়া দেয় যে বিস্ময়ের রহস্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কখনও বা তাহার অহঙ্কার মত্ত অন্তর সে রহস্যের ইঙ্গিতটুকু ধরিতে পারে না। বিকাশের সঙ্গে আমার পরিচয় বাস্তব জীবনের কর্ম্মকোলাহল-মত্ত এক অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। সে জীবনের মধ্যে বিস্মিত হইবার উপাদান যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও বিস্মিত হইবার সুযোগের অভাব ছিল একান্ত। কিন্তু সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মন নিয়া সেই আকস্মিক জীবনের দ্বারপথে যখন বিকাশের সঙ্গে পরিচয় হইল তখন হইতে যে বিস্ময়ের সুরু হইল শেষদিন পর্যন্ত সে বিস্ময়ের শেষ হয় নাই। এমন কি আজও সেই অন্তহীন বিস্ময়ের লীলারহস্য চির অগম্যই রহিয়া গেছে। তবুও আজ বিস্মৃতির দ্বার ঠেলিয়া সে মানুষটাকে যখনই মনে পড়ে তখনই মনে হয় কিছুটা যেন তাহার বুঝিয়াছিলাম। হয়ত তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। না হোক্। কোন মানুষকেই সম্পূর্ণ বুঝা যায় না! সে চেষ্টা করাও নির্বুদ্ধিতা। তবুও বিকাশের রহস্যময় জীবনের সহিত পরিচয় যে আমাকে আমার সামান্য জীবনের সীমার বাহিরে আনিয়া দিয়াছিল একথা মনে হইলে মানুষটার প্রতি যেমন একটা শ্রদ্ধা জাগে, তেমনি শ্রদ্ধা জাগে নিজের জীবনের উপরে। কারখানা জীবনের সর্বত্র তাহার অবাধগতি ছিল। কোথাও তাহার এই গতি ব্যাহত হইতে দেখি নাই। যতই তাহাকে দেখিয়াছি ততই বিস্মিত হইয়াছি, কিন্তু তাহার সর্বভয়মুক্ত বন্ধন হীন জীবনের সেই স্বচ্ছ গতির কারণটুকু নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। কেন এই কথা বলিলাম তাহাই বিশেষভাবে বর্ণনা করিবার জন্যই কাহিনীর অবতারণা। অতএব বাজে কথা না বলিয়া কাহিনীর পুনরারম্ভ করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

কারখানায় ঢুকিবার মাসদুয়েক পরের কথা। তখন বোধহয় আষাঢ় মাস। বর্ষার আসন্ন ইঙ্গিতে আকাশের বুকে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। অকারণে মেঘের ঘনঘটা পড়িয়া যায়, হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠে মেঘে আর বাতাসে একটা আন্দোলন জাগে; বর্ষা তখনও সুরু হয় নাই। সন্ধ্যার সময় কর্মহীন অবকাশ মুহূর্ত্তগুলি জনশূন্য দামোদরের বালুকা-বেলায় বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। আমাদের মেস্ হইতে দামোদরের দূরত্ব খুব বেশী না হইলেও, বৈকালিক পদচারনার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই মনে হইত। মেসের লোকদের সহিত সহজভাবে মিশিতে না পারার দৈন্য কিছুতেই ভুলিতে না পারিয়া সকলের কৌতুহলী দৃষ্টি এড়াইয়া একফাঁকে দামোদরের তীরে একটি নির্জন জায়গায় আসিয়া বসিয়া থাকিতাম। ইহার কারণ যে শুধুমাত্র সহকর্ম্মীদের অসংযত কলরব এড়াইবার জন্য অথবা তাহাদের সহিত মিশিবার অক্ষমতা তাহাই নহে। আসলে আশৈশব আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত একাকীত্ব অনুভব করিতাম, যাহার জন্য ছাত্রাবস্থায় জীবনের সমস্ত উত্তেজনা হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার কঠিন প্রচেষ্টায় পাঠ্যপুস্তকের বোঝার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া মনের মধ্যে কিছুটা শান্তি পাইতাম। মানুষের সঙ্গ যেন অসহ্য বলিয়া বোধ হইত। মানুষকে যে ঘৃণা করিতাম তাহা নয়, বরং মানুষকে নিবিড় ভাবে ভালবাসিতাম কিন্তু তাহাদের সাহচর্য মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিত, যাহার জন্য কাহারও সহিত কখনও সহজ ভাবে মিশিতে পারি নাই। এমন কি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সহিতও নয়। সংসারে একমাত্র মাকেই চিনিতাম এবং জানিতাম।

বাবা ছিলেন উকিল। তিনি ব্যস্ত থাকিতেন তাঁহার মোকদ্দমার নথীপত্র এবং মক্কেলদের লইয়া। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার হইতে শিক্ষা-ব্যবস্থা সব কিছুই ছিল মায়ের উপর। আমার পরে একটি বোন ও দুটি ভাইও ছিল, কিন্তু বড়ছেলে বলিয়াই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক্ মায়ের স্নেহটা আমি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় পাইয়াছিলাম এবং সেইজন্য মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক বাঙ্গালী ঘরের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হয় নাই। সমবয়স্ক বন্ধুর প্রতি মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ থাকে মায়ের প্রতি আমারও ছিল ঠিক সেই রকম একটা আকর্ষণ। আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা প্রীতি এবং বিশ্বাস এই তিনটা বস্তু কিভাবে যে এক হইয়া গিয়াছিল জানি না। কিন্তু ছাত্র জীবনের বৈচিত্র্যবিহীন দিনগুলিতে মায়ের সাহচর্যটুকুর মূল্য ভাল বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এবং কর্ম্মজীবনে যে মায়ের কাছ হইতে কোন কারণে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে এ চিন্তা কখনও মনে স্থান দিই নাই। ছাত্র হিসাবে সুনামের জন্য চাকরী জীবনের গৌরবময় স্বপ্ন কখনও নষ্ট হয় নাই। বেশ বুঝিতাম কোন একটা ভাল চাকরী লইয়া কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইব। হয়ত থাকিতামও তাহাই। কিন্তু বাবার আকস্মিক মৃত্যু সংসারের সহজ গতিপথে এমনি একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিল, যে সেই কঠিন বাধার উপর আছাড় খাইয়া আমার জীবনের সব স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া গেল! এবং যখন দেখা গেল আজীবন উপার্জ্জন করিয়া আমার বাবা সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে অপচয়ের যে তালিকাটা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নিতান্ত সামান্য নয়. তখন অপরিসীম বেদনায় সংসারের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার করিয়া কারখানা জীবনটাকে অসঙ্কোচে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। এবং মনের যে একাকীত্ব বিগত জীবনে সময়ে সময়ে অসহ্য হইয়া উঠিত, আজ কারখানার জনবহুল পরিবেশের মধ্যে তাহা যেন

নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। যদিও সহরেই আমার জন্ম এবং সহরেই আমি মানুষ হইয়াছিলাম তবুও মানুষের অট্টহাস্য কোলাহল এবং অন্যান্য যান্ত্রিক আওয়াজ আমার সহ্য হইত না। তাই দামোদরের এই নির্জন জায়গাটি আমার মনটাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিত যে, যে কোন উপায়েই হোক্ না কেন সন্ধ্যেবেলায় এই জায়গাটায় আসিয়া না বসিলে কেবল যেন মনে হইত একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ বাকী রহিয়া গেল। সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় পরিচিত জায়গাটিতে গিয়া বসিলাম।

সমস্ত আকাশ জুড়িয়া অন্তহীন কালো মেঘের দল আসন্ন বর্ষণের উদ্যোগে বুঝি শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে কালো মেঘের দল। শীর্ণ দামোদরের বুকেও তাহার গভীর কালো রঙের ছায়া পড়িয়া দামোদরের জলকে কালো করিয়া দিয়াছে। দামোদরের জলে একটুখানি উচ্ছাস জাগিয়াছে মাত্র কিন্তু তাহা এমন কিছু নহে। চকিত বিদ্যুৎশিখার তীব্র আলো ক্ষণে ক্ষণে সে অন্ধকারের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চিরিয়া দিতেছিল, কিন্তু তাহা এতই ক্ষণিক যে পরক্ষণেই অন্ধকার গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল। আকাশে মেঘের অবস্থা দেখিয়া একবার ভাবিলাম উঠিয়া যাই। কিন্তু পারিলাম না। আকাশ জোড়া স্তব্ধ অন্ধকার যেন তাহার অদৃশ্য চক্ষুর ইঙ্গিতে আমায় নিষেধ করিল। বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে ঝড় উঠিল। এবং সেই ঝড়ের দুরন্ত আবেগে আকাশে বর্ষণোন্মুখ মেঘের দলে যেন ভাঙ্গন লাগিয়া গেল। দামোদরের বুকের উপর বাতাসের উন্মাদ কোলাহল এবং তাহার সহিত ছন্দ মিলাইয়া দামোদরের জলের ক্রমবর্দ্ধমান গতিবেগের শব্দ যেন আমার মনকে সম্পূর্ণ অবশ করিয়া দিল।

প্রকৃতির নাট্যলীলার মধ্যে যে একটা সৌন্দর্য্য আছে তাহা শুধু বড় বড় কবিদের রচনা হইতে জানিয়াছিলাম। স্বচক্ষে কখনও

দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কারণ একেত' সহরের ইঁট-কাঠের মধ্যে বাতাসের অশান্ত আবেগ শুনিবার জন্ম জানালা দরজা খুলিয়া রাখিয়া আত্মীয় স্বজনের কাছে পাগল প্রতিপন্ন হইতে পারি নাই। তাহার উপর যন্ত্রযুগের অন্যতম সুন্দরী কলিকাতা সহরের অপ্রাকৃত শব্দকোলাহলের মাঝে ঝড়ের রুদ্ধ গর্জন এবং বর্ষণের সকরুণ সুর শুনিবার মত সুবিধাও বিশেষ পাই নাই। তাই আজ সহর হইতে দূরে জনশূন্য দামোদরের তীরে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা যখন সে সুযোগ আপনি আসিয়া হাজির হইল তখন আর তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিলাম না। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে আমার ক্ষীণ দৃষ্টি মেলিয়া প্রকৃতির আসন্ন তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে কোন এক অপরিচিত ভয়ঙ্করের আবির্ভাব দেখিবার জন্য একান্ত স্তব্ধচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঝড় বলিতে সকলে যাহা জানে আমিও তাহাই জানিতাম তাই বাতাসের বেগে যখন শুষ্ক বালুকারাশি আবর্ত্ত রচনা করিয়া আমায় ঘিরিয়া মহাউল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল তখন মনে হইল বুঝি বা সেই আসিয়াছে। কিন্তু সে যে আমার কতবড় ভুল কিছুক্ষণ পরেই তাহা বুঝিতে পারিলাম।

হঠাৎ যেন মনে হইল এতক্ষণ যে শিশুর দল আমায় ঘিরিয়া খেলা করিতেছিল তাহারা যেন চকিতে কোথায় লুকাইয়া পড়িল। এবং কিছুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। তারপর যেমন সহসা সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল ঠিক তেমনি সহসা কি যেন একটা শব্দ শুনিলাম, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। মনে হইল যেন এক অদৃশ্য অশরীরী জন্তু অন্ধকারের মধ্যে ভয়াবহ নৃশংসতায় ক্রুদ্ধ গর্জন করিতেছে। এবং সে গর্জনের মধ্যে কিছুমাত্র কোমলতা নাই, পেলবতা নাই। কঠোর প্রতিহিংসাপরায়ণ এক অশরীরী আত্মা যেন বহু সহস্র যুগের অধীনতার

নাগপাশ ছিন্ন করিয়া উন্মত্ত আবেগে সমস্ত প্রকৃতির বুকে আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছে। কবিগুরু হয়ত ইহাকে "ঝঞ্ঝার মঞ্জীর" বাঁধা উন্মত্ত নৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। আমারও নৃত্য বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু সে যেন শুধুই ঝঞ্ঝার মঞ্জীর শিঞ্জিত কালবৈশাখীর ক্ষুব্ধ নৃত্য নয়। মনে হইল প্রকৃতির সংঘাত-ক্ষুব্ধ অব্যক্ত বেদনার অস্ফুট আবেগ যেন নিঃসীম অন্ধকারের ধ্যানমগ্ন আবেশকে কঠিন আঘাতে দীর্ণ করিয়া মানুষকে শঙ্কিত কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। সেই দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে কি যে দেখিলাম জানিনা, কেবল মনে হইতে লাগিল এমন আর দেখি নাই, হয়ত বা আর কখনও দেখিব না। তাই নিতান্ত শিশুর মতন দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের বেদনাতুর মনটাকে সাংসারিক জটিলতাজালের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া সংঘাতবিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার উন্মত্ততার মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। এবং পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তগুলিতে কি যে ভাবিয়াছিলাম জানি না; হঠাৎ বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোর চকিত দীপ্তির মধ্যে কিছুদূরে একটি দীর্ঘদেহ মানুষকে দেখিয়া যেন চমকিত হইয়া উঠিলাম। ভয়ে নয়। কারণ হারাইবার মত দুর্মূল্য বস্তু কিছুই আমার সঙ্গে ছিল না। চমকিত হইলাম এই ভাবিয়া যে এধারে কারখানার লোকজন ছাড়া সাধারণতঃ কেহ যাতায়াত করে না এবং যদি কোন পরিচিত মানুষ আমায় এইসময়ে এইখানে দেখিতে পায় তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় চিন্তার আর শেষ থাকিবে না। তাই মানুষটি কে তাহা সঠিক বুঝিবার আগেই পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান শুনিলাম, "কে মাষ্টার নাকি?" বুঝিলাম বিকাশ আসিয়াছে। বিদ্যুতের সামান্য আলোয় তাহাকে চিনিতে পারি নাই, না পারার জন্য আশ্চর্য হই নাই, কিন্তু সে যে ঐ স্বল্প আলোতে আমায় চিনিতে পারিয়াছে এই কথাটা মনে হইতেই বিস্ময় জাগিল: সাড়া দিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ।"

কাছে আসিয়া অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কি ব্যাপার হে? এমনি সময় এখানে চুপচাপ বসে যে?"

বলিলাম, "এমনি। এসেছিলাম অনেকক্ষণ। ঝড় উঠল বলে আর যেতে পারিনি, চুপচাপ বসে আছি।"

জবাবটা বোধহয় তাহার মনঃপূত হয় নাই! না হওয়াই স্বাভাবিক বলিল, "এত জায়গা থাকতে এইখানেই বা এমনি এসে বসতে গেলে কেন?"

তাহার কৌতুহল লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "তুমিই বা এই দুর্যোগের মধ্যে এখানে এসে হাজির হলে কেন?"

স্মিতমুখে জবাব দিল, "মেসে তোমায় না পেয়েই বুঝলাম তুমি বেরিয়েছ। ভাবলাম কোথায় যেতে পার? প্রথম ভেবেছিলাম হয়ত মিঃ ঘোষের বাড়ীতে গিয়েছ। তারপর কেন জানিনা হঠাৎ মনে হল না—তুমি নিশ্চয়ই নদীর ধারে এসে হাজির হয়েছ।"

মেসে আমার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া এত জায়গা থাকিতে এইখানেই যে সে আমার খোঁজ করিতে আসিবে তাহার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ না পাইয়া ভাবিলাম সে বুঝি মিথ্যা কথাই বলিতেছে। তাই তাহাকে প্রতিপ্রশ্ন করিয়া বলিলাম, "কি করে জানলে যে আমি এখানে আছি? অন্য কোথাও তো যেতে পার্তাম?"

ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা পার্তে, কিন্তু কেমন যেন মনে হল যে তুমি নদীর ধার ছাড়া অন্য কোথাও যাওনি?"

বলিলাম, "এটা কি তোমার Reserve stock থেকে ছাড়লে না সত্যি?"

প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিল, "তোমায় বোকা বানাবার জন্য কি

আর Reserve stock এ হাত দিতে হয়? তা নয়। হঠাৎ মনে হল, কেন জানিনা।"

মনে হইল কথাটা তাহার সম্পূর্ণ সত্য। তাই সে কথা লইয়া আর কথা কাটাকাটি না করিয়া বলিলাম, "তা হঠাৎ আমার খোঁজ কর্তে গেলে কেন বলত?"

সে আমার সামনেই বসিয়াছিল। আমার কথার জবাব দিবার আগে হঠাৎ আমার হাতটা নিজের বলিষ্ঠ কর্কশ হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "সত্যি কথা বললে বিশ্বাস কর্বে?"

তাহার স্পর্শের মধ্যে কি ছিল জানিনা। মনে হইল যেন তাহার অন্তরের সত্যকথাটি বলিবার অব্যক্ত আকুলতাটুকু সহসা মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া তাহার বলিষ্ঠ হাতখানার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এবং সেই মূর্ত্ত সত্যের নিবিড় স্পর্শে অভিভূত হইয়া বলিলাম, "কেন বিশ্বাস কর্ব না?"

আমার হাতটা সে তেমনি ভাবেই ধরিয়া রাখিয়া বলিল, "আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি?"

বলিলাম, "কি কথা?"

বলিল, "তুমি আশ্চর্য ঘটনায় বিশ্বাস কর?"

প্রশ্নটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "কি রকম আশ্চর্য ঘটনা, ভুতুড়ে নাকি?"

বাধা দিয়া বলিল, "না-না, ওসব নয়। এই যেমন ধর একটা মানুষকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় এ যেন আমার কতদিনের পরিচিত। শুধু তাই নয় মানুষটাকে এক মুহূর্ত্তের পরিচয়ে এত ভাল লেগে যায় যে তাকে কিছুতেই ছাড়া যায় না। এ রকম যে হয় একথা বিশ্বাস কর।"

এতক্ষণে তার প্রশ্নটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলাম, "অর্থাৎ আমায়

দেখেই তোমার ভাল লেগেছে। এই ত ?”

আমায় হাসিতে দেখিয়া সে যেন আহত হইল। অথচ আমার হাসির মূলে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বলিল, “তুমি হাসলে মাষ্টার ?”

তাহার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনার আভাস পাইয়া বিচলিত হইলাম। কারণ বিকাশকে এমন ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে কেহ কখনও বোধ হয় শোনে নাই. আমিত নয়ই। তাই নিজের ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বলিলাম, “আরে না ! ওজন্য হাসিনি। আমি হাসলাম এমনিই।”

বলিল, “তাই ভাল। আমি ভাবলাম আমার কথায় তোমার হাসি পেল বুঝি ? সে যাক্। যা বলছিলাম বলি। তোমায় যে শুধু আমার ভাল লেগেছে তাই নয়, তোমায় বোধ হয় ভালোবেসেছি মাষ্টার, কেন জানি না।”

এ কথার উত্তরে আর কি বলা যায়। আমার ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও একটা মানুষ যদি সোজা বলিয়া বসে আমায় সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলে বিস্ময় বোধ করাটা অন্যায় নয়। কিন্তু তাহার অকপট স্বীকারোক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলেও তাহা প্রকাশ করিলাম না অথবা আমার যোগ্যতাহীনতার কথাও উল্লেখ করিলাম না পাছে সে বেচারী দুঃখ পায়। এবং যে কথা সে অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল তাহার উত্তরে হয় ত বিনয়ভাষণের দ্বারা অনেক কিছুই বলা যাইত, কিন্তু এতবড় সত্য কথাটা যে মানুষ এমন অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারে তাহার সহিত নীতিগত ভদ্রতারক্ষার চেষ্টা করিতেও ভয় হইল। বিশেষতঃ মানুষটাকে যখন ভালভাবেই চিনি ' তাই চুপ করিয়াই রহিলাম। যদিও বয়স আমার ২২ পার হইয়া তেইশে পড়িয়াছে তবুও আজ পর্যন্ত ২২টা মানুষের সাথেও হয়ত ভাল করিয়া কথা বলি নাই, ঘনিষ্ঠতা করা দূরে থাক্। বিগত জীবনে পাঠ্যপুস্তকের

গুরুভার বহন করিয়া চলিতে চলিতে নিজের জীবনের পরিধিকে যে অতি সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়াছিলাম সে কথা আজ যেমন করিয়া মনে হয় সেদিন তেমন করিয়া মনে হয় নাই। তখন প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার অবসর মুহূর্তে পার্কের হাওয়া খাইয়া বা নির্জন গঙ্গাতীরে বসিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখিয়া কাটিয়াছে, কিন্তু কোন মুখর মানুষের উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় নাই। তাই বন্ধুত্ব যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারি নাই। এবং যদিও বিকাশকে সহসা অন্তরের সমস্ত জড়তা কাটাইয়া অসঙ্কোচে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না, তবু বেশ বুঝিতে পারিলাম কি এক দুঃসহ আকর্ষণে মানুষটা আমায় তাহার জীবনের কক্ষপথে টানিতেছে। সে আকর্ষণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ছাত্র-জীবনে যাহার সহিত পরিচয় হইলে সভ্যতার নিয়মানুযায়ী যাহাকে "দাদা কাকা" ইত্যাদি সম্ভাষণে ডাকিতে হইত, সভ্যতার ভারমুক্ত কর্ম-জীবনের অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে সেই মানুষটি যেন অতি সহজে নিজের নামটিকে মাত্র সম্বল করিয়া আমার সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারের প্রবল ভিত্তিটাকে এক মুহূর্তে দুর্বল করিয়া দিল। কিন্তু তবুও তাহার কথার পরে কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

সে তেমনি করিয়াই বলিতে লাগিল, "তুমি হয়ত খুব আশ্চর্য্য হচ্ছ মাষ্টার। কিন্তু যা বল্লাম তার একটুও মিথ্যা নয়। তোমায় সত্যিই ভালবেসে ফেলেছি। অথচ কি করে যে এমন হয় কে জানে।' বলিয়া একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে চুপ করিল। তাহার কথার সত্যাসত্য যাচাই করার মত হাস্যকর ইচ্ছা আমার ছিলনা।

তবুও রহস্য করিবার লোভ সামলাইতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলাম, "তোমার কথা অবিশ্বাস করিনে, কিন্তু আমার মধ্যে কি তুমি পেলে

যার জন্যে এর মধ্যেই আমায় ভালবেসে ফেল্লে ?”

উত্তর দিল, “বল্লামত ঠিক জানিনা কেন ? তবে মনে হয় তোমার মধ্যে এমন একটা দুর্বলতা আছে যার জন্যে তোমায় ভাল না বেসে পার্লাম না।”

হয়ত মনের কথা গুছাইয়া বলিবার মত শক্তি সত্যিই তাহার ছিল না। এবং যে কথা সে বলিল হয়ত সেটা তাহার চিন্তাশীল মনের অভিব্যক্তিও নয়। তবুও তাহার কথার ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন সত্যের ইঙ্গিতে চকিত হইয়া উঠিলাম। অবশ্য মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা আছে, কাহারও বেশী, কাহারও বা কম। কেহই নিজেকে দৌর্বল্যহীন বলিয়া অভিহিত করিতে পারে না। তাই নিজেকে দুর্বল বলিয়া স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। কারণ নিঃসংশয়ে জানিতাম যে আমার মধ্যে যথেষ্ট দৌর্বল্য আছে। কিন্তু বিস্মিত হইলাম এই ভাবিয়া যে অল্পবিস্তর দুর্বলতা মানুষ মাত্রেরই থাকে বটে কিন্তু তাহা সকলের চোখে পড়ে না। এবং কারখানার চাকুরী করিতে আসিয়া এই অল্প কয়দিনে এমন কোন দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলি নাই যাহার জন্য সে আমার সম্বন্ধে অতবড় গভীর সত্য কথাটি অত সহজে বলিয়া দিতে পারে। পরে বুঝিয়াছিলাম যে, এমনি করিয়াই জগতের বৃহত্তম সত্যও একটি মানুষের মুখ দিয়া অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এবং কি করিয়া ইহা সম্ভব হয় তাহা ভাবিয়া দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি যে একজনের সম্বন্ধে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, তাহাকে ভালবাসা যায় এবং তাহার দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট কাজকর্ম কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে সঠিক মতামত ব্যক্ত করা অসম্ভব নয়। আমি অবশ্য এখানে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাজালের মধ্যে নিজেকে জড়াইতে চাহি না। কারণ আমি

যেমন করিয়া কথাটা বুঝিয়াছিলাম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিচার করিলে তাহার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি পাওয়া যাইবে। অতএব সে সব দুর্ভেদ্য তর্কের অবতারণা না করিয়া এই কথাটি নির্ভয়ে বলা যায় যে একটি মানুষকে ভালবাসিয়া যদি বিনা বিচারে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে নিজের মনে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এবং পরে কথা প্রসঙ্গে একদিন প্রমাণ পাইয়াছিলাম যে প্রথম দৃষ্টিতে সে আমায় ভালবাসিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আমার দৌর্বল্যের উৎসমূলের সন্ধান সে এত সহজে পাইয়াছিল। কিন্তু যাক্ সেসব কথা, তাহার মুখে আমার দুর্বলতার কথা শুনিয়া ভাবিলাম কি সে দৌর্বল্য তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজে মিলাইয়া দেখি—কিন্তু সাহস হইল না। মনে হইল যে মানুষ আমার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার দুর্বল চিত্তের সন্ধান পাইয়াছে তাহার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই।

আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, তুমি বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস কর্লে না মাষ্টার, না ?"

তাহার কথার প্রতিক্রিয়া আমার আবিষ্টচিত্তে স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল, তাহার কণ্ঠস্বরে সে জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

বলিলাম, "না, অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু আরও কয়েকটা প্রশ্ন জাগছে যার উত্তর জেনে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু—"

বাধা দিয়া বলিল, "সে সব কথা যাক্—এখন চল মেসে ফিরি।"

ফিরিবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। তাই অন্যমনস্কের মতই বলিলাম, "মেসে গিয়ে কি হবে ?"

হাসিয়া বলিল, "না এমন কিছু লাভ নেই, কিন্তু না গিয়েই বা লাভ কি হবে ?"

তাহার কথাগুলির মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন রহস্যের আভাস ছিলনা বটে,

কিন্তু কেমন যেন মনে হইল যে আমার সম্বন্ধে তাহার মনে একটা কৌতুহল জাগিযাছে যে কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যই প্রশ্নটা সে এত সহজভাবে করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার কৌতুহলের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "এখানে বসে থাকতে বেশ লাগছে।"

বলিল, "তা লাগতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি আসছে। ফোঁটা কয়েক পড়েওছে। মিছিমিছি ভিজে ত কোন লাভ নেই। তাছাড়া কাজের শরীর নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কাব্য করার কোন অর্থ হয়না।"

তাহার শেষ কথাটা আমার অন্তরে একটা তীব্র আঘাত করিল। মনে হইল লোকটা যেন আমার গোপন দৌর্বল্যের সন্ধান পাইয়াই এমন করিরা সেই দুর্বলতায় আঘাত করিল।

একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠেই বলিলাম, "বৃষ্টিতে ভেজায় যদি এত আপত্তি থাকে তবে তুমি যেতে পার।"

প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার শরীরে বোধ হয় রোদ বৃষ্টি কিছুই লাগে না। কিন্তু আমি নিজের জন্য বলিনি, তোমার জন্যই বলছিলাম। বিদেশে এসে অসুখে পড়লে আবার আমাকেই ত ভুগতে হবে।"

এ কথাগুলো কিন্তু আঘাত বা বিদ্রূপাত্মক বলিয়া মনে হইল না। এমন কি তাহার স্বাভাবিক তরলকণ্ঠের সুরও ধ্বনিত হইল না। তবু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় ছিল না। তাই বলিলাম, "আমার জন্য তোমায় ভুগতে হবে এমন কথা কি তোমার বিধাতা পুরুষ তোমার কানে কানে বলে গেছেন?"

মাথা নাড়িয়া বলিল, "গেছেনইত!"

বলিলাম, "তা যদি মনে করে থাক তাহলে আমিও বলি আমার

অসুখে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, বরং কারখানার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও, কিছুটা আরাম পাব।"

হাসিয়া বলিল, "কথাটা শুনে রাখলাম, মনেও রাখব। কিন্তু তোমায় যে জন্য মেসে ফিতে বলেছিলাম সেটা ঠিক বৃষ্টিতে ভিজতে বারণ করার জন্য নয়।"

তাহার কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "তবে কি জন্য বলছিলে?' ওষ্ঠপ্রান্ত অদ্ভুত ভঙ্গিতে সঙ্কুচিত করিয়া বলিল, "সেটা আর বলতে চাই না, কারণ তুমি আমার উপর চটেছ।"

বলিলাম, "কি করে বুঝলে চটেছি?'

কিছুক্ষণ মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "এক যুগের উপর কারখানার কাজ কচ্ছি মাষ্টার তোমার মত ছেলেমানুষের কিসে রাগ হয় সেটা কি আর বুঝিনা ভাবছ?"

কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কানাকে কানা বলিলে যেমন রাগ হয়, ছেলে মানুষকে ছেলে মানুষ বলিলে তেমনই রাগ হয়। তাই তাহার এই 'ছেলে মানুষ' কথাটা শুনিয়া সত্যই বিরক্ত হইলাম। অথচ সে কিছু অন্যায় বলে নাই। জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমি শুধু ছেলেমানুষই নয়, শিশু বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। আর বয়সের কথা না হয় বাদ-ই দিলাম।

আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "তুমি নিশ্চয়ই কাব্য-টাব্য লেখ মাষ্টার, না হলে কথাটা শুনে তুমি চটলে কেন?"

কথাটা শুনিয়া রাগও হইল বিস্মিত হইলাম। সত্য কথা বলিতে কি তাহার ঐ কথাটা শুনিয়াই রাগ হইয়াছিল। অবশ্য সত্যই আমি কাব্য রচনা করিতাম না, করিবার মত আশাও রাখিতাম না, কিন্তু তবুও মনের মধ্যে সাধারণ মানুষের মত কাব্যের প্রতি একটা দৌর্বল্য

ছিল এবং সেদিন ঝড়ের রাত্রে অমনভাবে বসিয়া থাকার আর কোন কারণই ছিল না, শুধু সেই ঝড়ের রুদ্ধ হুংকার এবং দামোদরের জলধারার অশান্ত কলোচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে মনের মধ্যে কি যেন একটা অপরিচিত বেদনাবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল যাহার জন্য সমস্ত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াও প্রকৃতির রুদ্র আনন্দের দৃশ্যজাল হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইতে পারি নাই। এবং চকিত বিদ্যুৎদীপ্তির মত একথাও একবার মনে হইয়াছিল যে যাহারা কবিতা লিখিতে পারে তাহারা বোধ হয় এমনি মুহূর্ত্তগুলিকে ছন্দে ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া তোলে। এবং নীরব কবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যত কঠোর মন্তব্যই করিয়া থাকুন না কেন, আমি নিশ্চিত জানি যে মানুষের অন্তরে তাহার আরেকটি সত্তা বিরাজ করে যে সত্যই কবি। জগতের রূপ রস-গন্ধ আস্বাদ করিয়া অন্তরের নিভৃতলোকে গোপনে তাহার সৃষ্টিকার্য চলে, শুধু দুঃখ এই যে সে মানুষটার যে অংশ বহিঃবিশ্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে তাহার সহিত এই অন্তরস্থ কবি মানুষটার কোন সংযোগ নাই। তাই তাহার অন্তর অনুভব করিলেও তাহার প্রকাশশক্তি তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে তর্কের অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকুই বলি যে তাহা যদি না হইত তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু তাঁহার অথবা তাঁহার মত জনকয়েক মানুষের সামগ্রী হইয়া থাকিত, জনসাধারণের প্রিয় হইতে পারিত না। অতএব আমি কারখানায় এসিষ্ট্যাণ্ট কেমিষ্ট হইয়াও আমার মধ্যে যে কিছুটা কবি জনোচিত সৌকুমার্য থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

কিন্তু সে যখন পরিহাসচ্ছলে বলিল "বৃষ্টিতে ভিজে কাব্য কর্বার কোন অর্থ হয় না" তখন এই কথাটাই সকলের আগে মনে হইল যে

সে বুঝি আমার অক্ষমতাটুকুকে বিদ্রূপ করিয়াই কথাটা বলিল। এমন ভুল সময় বিশেষে মানুষ মাত্রেরই ঘটে আমারও ঘটিয়াছিল।

বিকাশ আমার হাতটা ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "চল মাষ্টার ফেরা যাক।"

একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলাম, "চল"। সারাপথ বিকাশের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। মেসে ফিরিতেই বিকাশকে লইয়া একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, এবং আমিও সেই ফাঁকে উপরে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নীচে খাবারের ডাক পড়িতে অনিচ্ছা-সত্বেও নামিলাম। বিকাশ সাধারণতঃ সকলের শেষে খায়, কিন্তু সেদিন এক সঙ্গেই বসিল, এবং আমার পাশেই। মেসে থাকিতে মেসের লোকদের সহিত ঘনিষ্ঠতা না করিলেও তাহারা যে সুযোগ পাইলে ছাড়িবে না তাহাও জানিতাম না।

হঠাৎ একজন আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "সন্ধ্যাবেলায় গিয়েছিলেন কোথায় বলুন ত ?"

তাহার প্রশ্নের ধরণটা আমার মোটেই ভাল লাগে নাই, তাই অল্প কথায় জবাব দিবার জন্য বলিলাম, "নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

প্রশ্নকারী যেন নিজের ভুল সংশোধন করিবার জন্য বলিল ; "না-না, ঝড়ের সময় কোথায় ছিলেন তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

তেমনি ভাবেই বলিলাম, "নদীর ধারেই ছিলাম।"

বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "ঐ ঝড়ের মধ্যে কর্ছিলেন কি ?"

আমি কিছু জবাব দিবার পূর্বেই কে একজন বলিয়া উঠিল, "কবিতা লিখছিলেন নাকি মশায় ?"

এমনতর লঘু হাস্যপরিহাস সর্বত্রই হয়। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যখন বিকৃত হইয়া পড়ে তখন সাধারণ পরিহাসও বিদ্রূপ বলিয়া মনে হয়। আমারও তাই হইল। অলক্ষিত মন্তব্যকারীর মন্তব্য শুনিয়া প্রচণ্ড

রাগে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলাম, "কেন বলুন ত ?'

একবার মনে হইল বিকাশ তাহাদের কিছু শিখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সে চিন্তাটা যে কতবড় ভুল তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। আমার প্রশ্নে এক কোণ হইতে আর একজন বলিয়া উঠিল, "ঝড়ের দিনে বেশ কবিতা টবিতা বেরোয়! রবীন্দ্রনাথও লিখতেন কিনা ?"

ঘরময় একটা হাসির রোল উঠিল। মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম। এবং কি বলা যায় ভাবিয়া ঠিক করিবার আগেই বিকাশ বলিয়া উঠিল, "রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিস্ ?"

বিদ্রূপকারী বলিয়া উঠিল, "তা পড়েছি বই কি ?'

বিকাশ খাইতে খাইতেই বলিল, "দুটো লাইন মুখস্ত বলত শুনি।"

লোকটা নির্লজের মত বলিয়া উঠিল, "ঐত মাইরী মুস্কিলে ফেললে, সে সব ছাই কি মনে আছে ?"

বিকাশ বলিল, "তবে আর তাঁর নামটা কর্ছিস কেন ?"

যে লোকটা প্রশ্ন করিয়াছিল আমি কবিতা টবিতা লিখি কিনা, সে বলিল, "আমরা ভাবলাম উনিও বুঝি সেই রকম কবিতা টবিতা লিখছিলেন।"

বিকাশ মুখ না তুলিয়াই বলিল, "যদি লিখেই থাকে, কিছু অন্যায় হয়েছে নাকি ?"

সে লোকটা জিভ কাটিয়া বলিল, "না অন্যায় আর কি, তবে আমরা যদি একটু আধটু পড়তে পাই ত—"

বাধা দিয়া বিকাশ বলিল, "কি কর্বি ?"

লোকটা যেন আরও উচ্চাঙ্গের রসিকতা করিবার জন্য বলিল, "বাঃ! কবিতা পড়ব, এটা কত বড় সৌভাগ্য।"

বিকাশ মুখ তুলিয়া বলিল, "সৌভাগ্য ত বুঝলাম, কিন্তু বুঝবি কি ?

লেখাপড়া ত বাঙ্গালা দ্বিতীয় ভাগ আর ইংরেজীর 1st book এর ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত। তুই কবিতার কি বুঝবি?"

ঘরময় আবার একটা হাসির রোল উঠিল। হাসি থামিতেই তেমনি ভাবেই বিকাশ বলিল, "যা বুঝবি না তা নিয়ে ফাজলামি করিস না।"

তাহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া আমিও ভয় পাইলাম। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইল, সে বোকার মত জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি রাগ কর্লে গুরুদেব?"

বিকাশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "রাগ না করে উপায় কি, খুশী হবার মত ত কিছু বলিস নি।"

লোকটা যেন একটু দমিয়া গিয়া বলিল, "না মানে—আমরা একটু ঠাট্টা করছিলাম।"

বিকাশ কিছুমাত্র নরম না হইয়া বলিল, "ঠাট্টারও একটা পাত্রভেদ আছে। ভুলে যাস্ না সত্যেন Mscতে 1st হয়েছে আর তুই Matricএ ফেল করে পালিয়ে এসেছিস্ ফ্যাক্টরীতে।"

লোকটা আর কোন কথা বলিল না। এমন সোজা ভাবে যে বিকাশ অপমান করিতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই, আমিত নয়ই। এবং এতক্ষণ আমার মনে যে একটা নীচ সন্দেহ জাগিয়াছিল—তাহা ভাবিয়া নিজেই লজ্জিত হইলাম। এবং এমনি করিয়াই একটা মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অপর একজনের প্রতি কত নিদারুণ অবিচার করি সেই কথাটাই যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। এবং অজ্ঞাতসারে বিকাশের প্রতি যে ঘৃণিত সন্দেহ জাগিয়াছিল তাহার জন্য মনে মনে তাহার নিকট বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এবং খাওয়া শেষ করিয়া সে উপরে তাহার ঘরে আসিতেই আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিলাম। উদ্দেশ্য ছিল নিজ মুখে নিজ অপরাধ

স্বীকার করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করিব। আমার ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই প্রশান্ত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল। বলিল, "কি রাগ করেছ মাষ্টার?"

তাহার কণ্ঠস্বরে কোন অভিযোগ নাই, কোন জ্বালা নাই, যেন সে আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

বলিলাম, "দেখ বিকাশ, তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি; তুমি যে আমায়—মানে, বিকালের কথাটার পর—" কোন কথাই শেষ করিতে পারিলাম না। তাহার সহৃদয় কণ্ঠস্বরে সমস্ত কথা যেন জড়াইয়া গেল। মনের মধ্যে একই সময় অনেকগুলি কথা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইবার দুরূহ প্রচেষ্টায় আমার কথা বলার শক্তিটুকু ও যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। সেও যেন আমার মানসিক বিশৃঙ্খলতার আভাস পাইয়া আগাইয়া আসিয়া আমার দুইটা কাঁধ ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল, "Don't be sentimental"

কথাটা যদি সন্ধ্যাবেলায় বলিত তাহা হইলে হয়ত তাহার সহিত সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। কিন্তু ঘরে ঢুকিবা মাত্র তাহার সহজ কণ্ঠের কথা কয়টি আমার মনে একটা আলোড়ন জাগাইয়া তুলিল। উপায় থাকিলে হয়ত কাঁদিয়াই ফেলিতাম। হয়ত তাহাতে দুর্বলতা প্রকাশ করা হইত এবং হয়ত বা একটা পুরুষের সম্মুখে অপর একটি পুরুষের চোখের জল ফেলা নিতান্ত লজ্জাকর, কিন্তু ইহা সত্য যে একটা অকারণ ক্রন্দনের আবেগ সেদিন আমার সমস্ত চিত্ত মথিত করিয়া প্রকাশিত হইবার দুরন্ত আগ্রহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং অন্তর্নিহিত সেই আবেগটুকু বোধকরি সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মানুষটির চক্ষু এড়ায় নাই। বুঝিতে পারিলাম যে এই রহস্যময় মানুষটির তুলনায় সত্যই আমি কত ছেলে মানুষ।

বলিলাম, "তুমি জান না বিকাশ আমি তোমায় কতটা ভুল বুঝেছিলাম।"

সিগারেটের প্যাকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া একটা আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইতে ধরাইতে বলিল, "আমার জানবার প্রয়োজন নেই।"

ছোটখাট কয়েকটা ঘটনা হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে সে কৃত্রিম সৌজন্য রক্ষার জন্য কোন প্রয়োজন বোধ করে না। আমার কথার উত্তরে তাহার বক্তব্য শুনিয়া বিস্মিত হই নাই। জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম "আচ্ছা লোকত তুমি। কি ভুলটা করেছিলাম তা বলতে দেবে না?"

ঘরের দরজাটা প্রায় বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিয়া বলিল, "না, ভুল সকলেই করে, অতএব তা নিয়ে কাব্য করার—"কথাটা বলিয়াই জিভ কাটিয়া নিজের কান মলিয়া বলিল, "ঐযাঃ, দেখেছ আবার সেইকথা, মাইরী ইচ্ছে করে বলিনি কিন্তু।"

ধীরে ধীরে আমার নিজের মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছিল। তাই রহস্য করিয়া বলিলাম, "ভুল সকলেরই ঘটে—"

নিজের কথাটার পুনরুক্তি শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "Thats right. We are friends again." বলিয়া তাহার বলিষ্ঠ হাতখানি আমার পানে বাড়াইয়া দিল করমর্দনের জন্য। আমি শুধু নীরব হাস্যে তাহা গ্রহণ করিলাম। সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "দেখ সত্যেন বিকালবেলা তোমায় বলেছিলাম যে তোমায় দেখেই আমায় ভাল লেগেছে মনে আছে?"

বলিলাম, "মনে আছে বৈকি ? কিন্তু কেন লেগেছিল তা বলনি।"

বলিল, "তা এখনও বলতে পার্ব বলে মনে হয় না—কারণ আমি নিজেও এর কারণ জানিনা। কিন্তু ভারী আশ্চর্য লাগছে এই কথাটা ভেবে যে কি করে এমন হল ? তুমি জাননা আজ পর্যন্ত এরকম কখনও হয়নি। আজ ১২ বছরের উপর হয়ে গেল ফ্যাক্টরীতে কাজ কর্ছি সব লোকের সাথেই আমার যথেষ্ট মেলামেশা আছে—কিন্তু এমন ভাবে কারুর কথা ভাবিনি।" বলিয়াই হাসিয়া বলিল, "মাইরী তোমায় নিয়ে কাব্য করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

তাহার ছেলেমানুষীতে অল্পবিস্তর অভ্যস্ত ছিলাম। বলিলাম, "ধেৎ তুমি একদণ্ডও serious হতে জান না ?"

কোন কথা না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিলাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব বিকাশ, সত্যি কথা বলবে ?"

হাতের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বলিল, "কি কথা ?"

বলিলাম, সেদিন রাত্রে ছাদে যখন violin বাজাচ্ছিলে—"

এইটুকু শুনিয়াই চকিতে তাহার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল ; দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই কথাটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু থাকেত বল, মাষ্টার, কিন্তু ঐটা নয়।"

তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীটা কিছুটা রহস্যময়, কিছুটা অতি নাটকীয় হইল বটে, কিন্তু তাহার চোখে এমন একটা অসহায় দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও বুঝিতে পারিলাম যে কি একটা কথা যেন সে অতি সংগোপনে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়, যাহার প্রতি সামান্য ইঙ্গিত-টুকুও তাহার সহ্য হয় না। তাই কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া গেলাম। সে রাত্রে তাহার ঘর হইতে চলিয়া আসিবার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া

ভাবিয়াছি যে কি এমন তাহার গোপন কথা থাকিতে পারে যাহা কোন মতেই প্রকাশ করা চলে না। তাহার মদ খাওয়ার কারণটাও যে সেই গোপন কথাটির সহিত সংশ্লিষ্ট ইহাও কেমন করিয়া জানি না বুঝিতে পারিলাম। এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে তাহার জীবনের সহিত কোন একটি নারী জড়িত আছে যাহার জন্যই তাহার এই সতর্কতা। কিন্তু যে কথাটি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, তাহা হইল নারীর হৃদয়-ঘটিত দৌর্বল্য অনেকের জীবনেই চিরদিনের মত একটা ছাপ রাখিয়া যায়, কিন্তু তাহার জন্য কাহাকেও এতখানি বিচলিত হইতে দেখি নাই। সুতরাং তাহার জীবনের স্বাভাবিক গতির সহিত সামঞ্জস্যহীন তাহার অন্তর্জীবনের চিন্তাধারার বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

(২)

কয়েকদিন পরে একদিন বিকালে অভ্যাস মত বেড়াইতে বাহির হইয়া অন্যমনস্কের মত পথ চলিয়াছি হঠাৎ মিঃ ঘোষের ছোট্ট ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মামাবাবু মা আপনাকে ডাকছে।"

হঠাৎ 'মামাবাবু' উপাধি পাইয়া বিস্মিত হই নাই, কিন্তু মা ডাকছেন শুনিয়া বিব্রত বোধ করিলাম।

বলিলাম, "তোমার মা কোথায় ?"

ছেলেটা আঙ্গুল দিয়া যে দিকে দেখাইল সেই দিকে চাহিতেই দেখি মিঃ ঘোষের বাড়ীর দরজার গোড়ায় তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন। আমায় চাহিতে দেখিয়া হাত নাড়িয়া ডাকিলেন। বিব্রত বোধ করার কারণও ছিল। আজ বিকাশ নাই। সে সঙ্গে থাকিলে বোধহয় দুনিয়ার কোথাও যাইতে আমার আপত্তি ছিলনা। কারণ শুধু ত সঙ্গী হিসাবে নয়, তাহার উপস্থিতিরও এমন একটা অদ্ভুত গুণ আছে যে, যে কোনও পরিবেশেই সে মানাইয়া যায়। তাই তাহার অভাবে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি জাগিল। কিন্তু উপায় নাই, যাইতেই হইল। গেট খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই বৌদি বলিলেন, "বাবারে কি অন্যমনস্ক মানুষ তুমি। এই রাস্তা দিয়ে চলে গেলে তা একবার বাড়ীটার দিকে ফিরেও তাকালে না ?"

ইহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই ; যদি সত্য কথাটা বলি অর্থাৎ যদি বলি যে এই রাস্তায় যে তাঁহাদের বাড়ী সে কথাটাও আমার মনে

ছিলনা, তাহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য শুনাইবে। অথচ তাহা ছাড়া পরিচিত বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় অতখানি অন্যমনস্কতার জন্য অন্য কোন সঙ্গত কারণ নাই। বৌদি বলিলেন, "তোমরা অবশ্য বড় লোক, গরীব বৌদিকে আর মনে রাখবে কেন ?"

হাসিয়া বলিলাম, "লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেবেন না বৌদি ? ভুল হয়ে গেছে সত্যিই কিন্তু তা বলে আর বড়লোক বলে গালাগালি দেবেন না।"

বৌদি তাহার ডান হাতের তর্জ্জনী গালে দিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "ওমা বড়লোকটা আবার গালাগাল নাকি ?"

বলিলাম, "সকলের পক্ষে নয়, তবে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই। কারণ আমার অবস্থা সত্যই গরীব।"

বৌদি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা হবে হয়ত।"

তাহার অবিশ্বাসটুকু লক্ষ্য করিয়া একটু হাসি পাইল। বৌদি বলিলেন, "তোমার বন্ধুটি কোথায় ?"

বুঝিলাম বিকাশের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিলাম, "কি জানি বিকাশের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।"

হাসিয়া বলিলেন, "তাই বুঝি একা বেরিয়েছ ?"

কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "হ্যাঁ,।"

বৌদি বলিলেন, "বোস, চা করে আনি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চা ও খাবার আনিয়া হাজির করিয়া বলিলেন, "তোমায় আবার জিজ্ঞেস কর্ত্তে হয় চা খাবে কিনা, বিকাশ হলে দেখতে এতক্ষণ।"

কথাটা তাঁহার সম্পূর্ণ সত্য। চাহিয়া খাওয়ার অভ্যাস আমার নাই। কারণ চাহিয়া খাওয়ার জন্য যতখানি ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন ততখানি ঘনিষ্ঠতা করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। ইহা হয়ত তেমন একটা মারাত্মক

ত্রুটি নয়, কিন্তু ঘরের বাহিরের জগতে অসঙ্কোচে চলাফেরা করিবার সময় নিজের এই অক্ষমতা প্রতি পদে পদে প্রকট হইয়া পড়ে। কারণ ঘরেব বাহিরের বাঙালীদের আচার ব্যবহারের মধ্যে একটা মাধুর্য আছে যাহা সহজভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে কোন আনন্দ লাভ করা যায় না। সেখানেও যদি ভাল ছেলের মত সহজ সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলার আগ্রহে আড়ষ্ট হইয়া থাকা যায় তাহা হইলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এবং এ জন্য নিজের প্রতি একটা অসন্তোষও ছিল। কিন্তু সে কথা ভুলিয়া বিকাশের সম্বন্ধে বৌদি যাহা বলিলেন, তাহারই জের টানিয়া হাসিয়া বলিলাম, "বিকাশ বুঝি খুব জুলুম করে আপনার উপর।"

বৌদি বলিলেন, "জুলুম? ওর জ্বালায় আমি বিকাল বেলা বেরুতে পারি নে।"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "কেন।"

বলিলেন, "আমি থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আমি না থাকলে হেঁসেলে ঢুকে সর্ব্বস্ব খেয়ে চলে যায়। কতদিন আমায় বিকালে বাজারে লোক পাঠাতে হয়েছে—"

বৌদির কথায় যথেষ্ট কৌতুক বোধ করিলাম।

বলিলাম, "তার মানে? ওকি কাঁচা তরকারীও খেয়ে যায় নাকি?"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, "প্রায় সেই রকম। কিছু না পেলে আলুভাজা চা খেয়ে দিব্যি চলে যায়। আমার ছেলেমেয়ে দুটোও তেমনি; আমি না থাকলে ওদের দৌরাত্ম্য যেন বেড়ে যায়। কাকু এলেই তাকে কোথায় কি আছে না আছে সব খবর দিয়ে তার সঙ্গে লেগে যায় আমার সর্বনাশ কর্তে। একদিন স্রেফ এক সের আলু পটল ভেজে আর এক কেটলী চা খেয়ে দুধের বাটিটি ধুয়ে মুছে পরিস্কার

করে রেখে দিয়ে গেছে। বাচ্চা দুটোকেও খাইয়েছে, ফিরে এসে দেখি তরকারীর ঝুড়ি খালি। লীলা বল্ল, 'কাকু সব খেয়ে গেছে।' সেই থেকে বিকেলে আর কোথাও বেরুই না। রাক্ষস কখন এসে সব খেয়ে যাবে ঠিক নেই।"

কৃত্রিম অভিযোগের সুরে অনির্বচনীয় স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া বৌদি কথাগুলো বলিলেন। বেশ বুঝিলাম যে সেই ৩২ বছর বয়স্ক মানুষটির বালসুলভ দৌরাত্ম্যগুলি তাঁহার কাছে শুধু যে আনন্দদায়ক তাহাই নহে, বোধহয় অপরিহার্য ও বটে। এবং এই অপরিচিত মানুষটি তাঁহার উপর যে সমস্ত স্নেহের উপদ্রব করে তাহা যেন মায়ের উপর অল্পবয়স্ক বালকের উপদ্রবের মত। বাহির হইতে এইসব ঘটনাগুলির কত যে বিকৃত অর্থ হইতে পারে তাহা তখন ভাবিয়া দেখি নাই; কারণ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তখন তত বেশী হয় নাই। তখন জানিতাম না যে একদল অন্তঃকরণহীন নির্বোধের অসঙ্গত বিদ্রূপে এমনিতর কত সহজ সুন্দর সম্বন্ধ একমুহূর্ত্তে মলিন হইয়া যায়। মুষ্টিমেয় হৃদয়হীনের বিষদৃষ্টি কত মধুর সম্পর্ককে পঙ্কিল করিয়া তোলে তাহা সেদিন বুঝিতে পারি নাই। সেদিন আমার অনভিজ্ঞ মনের মত চক্ষের দৃষ্টিও ছিল সহজ, সরল। সামাজিক বিধি নিষেধের হাস্যকর দম্ভোক্তিগুলি তখনও মনের মধ্যে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গাঁথিয়া যায় নাই। তাই একটি পরিণত বয়স্ক মানুষ আরেকটি পরিণত বয়স্কা নারীর হৃদয়ে শিশুর স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে সেই পরিপূর্ণ মাতৃত্বের মহিমাময় মূর্ত্তির চরণে মনে মনে প্রণাম জানাইলাম। মনে হইল এমনি করিয়াই একটি নারী অপর একটি পুরুষকে আপন স্নেহ শাসনের সীমার মধ্যে অবলীলাক্রমে টানিয়া লয়। এবং সেই সঙ্গে

সেই অদ্ভুত মানুষটার কথাও মনে পড়িল যে তাহার বয়সের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া এত সহজে শিশুর রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনাত্মীয় নারীর হৃদয়ে স্নেহের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। উত্তর জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়াছি। এবং সময় বিশেষ একটি নারী ও পুরুষের মধ্যে অনাত্মীয়তার সতর্ক শাসন লজ্মিত হইতে দেখিলে বহু মানুষের ঘৃণা-বিজড়িত রক্ত চক্ষু দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এবং সকলে যখন একযোগে চিরাচরিত নীতির চাবুক হাতে করিয়া কোন সমাজ-বিদ্রোহীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছে তখনই আমার জীবনের নব প্রভাতের শুভ মুহূর্তে এই দুইটি মানুষের কথা মনে করিয়া স্বতঃই মনে মনে সংকোচ অনুভব করিয়াছি এই ভাবিয়া যে মানুষের যতখানি দেখা যায় হয়ত সেইটাই সব নয়; সেইটাই চরম সত্য নহে। এবং পরিদৃশ্যমান পটভূমিকার অন্তরালে মানব মনের বিচিত্র ভাবধারার প্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কোন মানুষের সম্বন্ধে কোন চকিত সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইয়া তাহার এবং নিজের অসম্মান করি নাই। কিন্তু সে সব কথা যাক্। যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। বৌদির মুখে বিকাশের কার্যকলাপের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়া মানুষটার সম্বন্ধে কৌতুহল যেন বাড়িয়া গেল।

বলিলাম, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কি করে?"

বৌদি বলিলেন, "সে এক মজার ব্যাপার। তোমার ঘোষমশাই (অর্থাৎ মিঃ ঘোষ) যখন প্রথম এখানে এলেন তখন ফ্যাক্টরীর লোক-জনদেরও চিনতাম না। তার উপর মেয়ে মানুষ, মানুষের চেহারা দেখেই তার সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক করে নেওয়াই আমাদের স্বভাব। একদিন বিকাশ এল ওঁকে ডাকতে। উনি তখন ছিলেন

না—বিকাশের চেহারাটাত কার্ত্তিক বল্লেই হয়—এসে যখন ডাকলো ভাবলাম বুঝি ফ্যাক্টরীতে কোন জরুরী কাজ-টাজ পড়েছে তাই ডাকতে এসেছে।

বল্লাম, 'তুমি একটু বস, বাবু আসবেন হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই।' বলে আমি রান্না ঘরে গেছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি লোকটা বাইরের ঘরে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে সিগারেট ধরিয়েছে। ওর চেহারা দেখে কুলী মজুর ভাবাটা কিছু অন্যায় হয় কি ভাই তুমিই বল; তাই চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে সিগারেট খাচ্ছে দেখে ধমক দিয়ে বল্লাম, 'তুমি কি রকম লোক হে? লাট সাহেবের মত টেবিলে পা তুলে সিগারেট ধরিয়ে বসে আছ?' তাই বল যে আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করি—তা'নয় এতবড় শয়তান মুখটা কাঁচুমাচু করে বল্লে, 'আজ্ঞে মা ঠাকরুণ অন্যায় হয়ে গেছে।' বলে দিব্যি চেয়ার থেকে নেমে মাটির উপর উবু হয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও উনি এলেন না দেখে বল্লে, 'বাবু বোধ হয় এখন আসবেন না, আমি চলি'। বলে দেবেন বিকাশ এসেছিল।' বলে ওত চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন উনি এলেন তখন আগাগোড়া সব খুলে বল্লাম, কিন্তু নামটা ভুলে গিয়ে বল্লাম, একটা কুলি ডাকতে এসেছিল।' উনি ত শুনে কিছুতেই বুঝতে পারেন না। অনেক রকম করে বলার পর বল্লেন, "ও, বুঝেছি।" আমি তখন তার সিগারেট খাওয়া পা তুলে বসা সবত বেশ গুছিয়ে বল্লাম—। উনিও লোকটি খুব সুবিধার নন। কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে। বল্লেন 'দেখত এই লোকটি কিনা।' আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ, ওইত বটে।' যেই না বলা দুজনের কি হাসি যেন নেশা করেছে। যত বলি কি ব্যাপার

হয়েছে বল, ততই দুজনে হাসে। শেষে যখন সব শুনলাম তখন লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পেলাম না। কিন্তু বিকাশটিকেত চেন? একদিন সোজা এসে বল্ল, 'দেখুন ভুল যা করেছেন, তাত করেছেনই, সেত আর ফির্বে না। তাছাড়া আপনারই বা দোষ কি? আমার চেহারাটাই খারাপ, সেত আর আপনার অপরাধ নয়। ওসব কথা যাক্ তবে যদি মনে করে থাকেন যে আপনার দোষ হয়েছে, তাহলে আমায় খাইয়ে সে দোষ শুধরে নিন।' বলেই ওঁর নাম করে বল্ল, 'আমি ওঁকে দাদা বলি, সেই সম্পর্কে আপনি আমার বৌদি হন। সে সুবাদেও আমায় আপনার খাওয়ান উচিত।' তোমায় কি বলব ভাই এমন লজ্জা কর্ছিল তখন যে আধহাত ঘোমটা টেনে সেই যে মুখ নীচু করে তাকিয়ে রইলাম আর মুখ তুলতে পারলাম না। যাবার সময় বল্ল, 'আচ্ছা আজ ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইলেন, একদিন এর শোধ দেব'। বলে চলে গেল। তার কথা যে এমনি করে সত্যি হবে তা কে জানত ভাই? কদিন পরে উনি কোম্পানীর কি কাজে গেলেন বম্বে—নণ্টু তখন এক মাসের। যাবার সময় বল্লেন, 'কোন দরকার হলে বিকাশকে খবর দিও'—উনি চলে যাবার দিন দুয়েক পরেই পড়লাম জ্বরে। প্রথম কদিন গা করিনি, তারপর যখন দেখলাম জ্বর ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে বিকাশকে খবর দিলাম। বিকাশ ডাক্তার ডেকে আনল। ডাক্তার বল্লেন, "টাইফয়েড বলে মনে হচ্ছে, সাবধানে রাখবেন, আর বাচ্চাটিকে আলাদা করে রাখতে হবে। তারপর যা হল ভগবান জানেন।" বলিতে বলিতে বিগত দিনের সেই ভয়াবহ অসুস্থতার কথা স্মরণ করিয়া বৌদি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমরা জানি মেয়েরাই সেবা কর্তে জানে—কিন্তু বিকাশের সে সেবা করা যে না দেখেছে সে বুঝবে না।

হাজার হোক আমি একটা অনাত্মীয় মেয়েছেলে বইত নয়, কিন্তু কিছুই সে বুঝতে দেয়নি। মনে হল আমার মায়ের পেটের ভাইও বোধ হয় এমন করে সেবা কর্তে পার্বে না। কখন যে খাওয়া দাওয়া করত কে জানে। অসুখের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখিছি শুধু মাটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ভগবান যে ওকে কি দিয়ে গড়েছিলেন জানি না, অসুখ বিসুখ ত নেই-ই শ্রান্তি ক্লান্তি ও নেই। তাছাড়া ওর মুখ দেখে বোঝাব উপায় নেই ওর মধ্যে অত দয়া মায়া আছে।" বলিয়া কি একটা কথা যেন মনে পড়িয়া যাইতেই মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অসুখের মধ্যে একদিন একটু লজ্জা পেয়েছিলাম। তখনও জানতাম না যে ওর কাছে লজ্জা পাওয়াও যা চেয়ার টেবিলের সামনে লজ্জা করাও তাই। বল্ল, 'আপনি আমায় আপনার ছেলের মতই মনে কর্বেন।" সেই থেকে ওর সামনে আমার লজ্জা ঘুচে গেছে, বাইরের লোক বোঝে না। আগে অনেক রকম কথাও বলেছে। কিন্তু আমিই একা জানি সে কি ধরণের মানুষ। তাইত প্রায়ই তার কথা ভাবি আর মনে হয় সেদিন ত আরো অনেক লোকজন ছিল কিন্তু কেউত আসেনি। কিন্তু তার ত কোন বাধা দেখিনি —অথচ তাব নিজের বলতে শুনেছি কেউ নেই সংসারে। মাঝে মাঝে ভয় হয় এই বিদেশ বিভূঁয়ে এসে তার যদি কোন কিছু হয়! ভগবান করুন যেন না হয়—"বলিয়া দুইহাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বোধ হয় সেই প্রার্থনাই জানাইলেন।

বলিলেন, "ওকে ত জানি, মরে গেলেও মুখ ফুটে বলবে না। তাই—"কথাটি অসমাপ্ত রাখিয়া বৌদি চুপ করিয়া গেলেন।

বেশ বুঝিলাম আত্মীয়-স্বজনহীন প্রবাসে সেই নিরাশ্রয় মানুষটির অমঙ্গল আশঙ্কায় এই নারীর স্নেহকোমল অন্তরের গভীরতম তলদেশে

সুতীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এবং তাহারই দুঃসহ আবেগে তাঁহার আয়ত চোখ দুইটি জলভারে ছল ছল করিয়া উঠিল। এবং আরেকবার বোধ হয় সেই রহস্যময় মানুষটির সমস্ত চিন্তা সর্বমঙ্গলময়ের চরণে সমর্পণ করিয়া নিজের অন্তরের দুঃসহ বেদনার ভার লাঘব করিবার জন্য অস্ফুটে উচ্চারণ করিলেন, "নারায়ণ।" বৌদি থামিলেন। এবং তাঁহার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে এমন একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল যে মনের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যতক্ষণ তিনি কথা বলিতেছিলেন ততক্ষণ যেন মনেব বীণাযন্ত্রে অপরিচিত রহস্যের সুর ধ্বনিত হইতেছিল। এবং তাঁহার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীণার তারে আঘাত লাগা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনাটুকু যেন সেই নিস্তরঙ্গ নীরবতার মধ্যে অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মনে হইল জগতে কত অসম্ভব ঘটনাই না ঘটে। লোকচক্ষের অন্তরালে মানব মনের কত বিচিত্র রহস্য প্রতিনিয়ত আপন পরিচয় প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, কেই বা তাহার খবর রাখে? অদ্ভুত সেই মানুষটি যে তাহার যৌবনের সমস্ত প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া এক অজ্ঞাত কর্ত্তব্যের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা একটি নারীর অন্তরে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। ভাগ্যবান মানুষ সে, যাহার জন্য এই আত্মীয়স্বজনহীন পৃথিবীতে একটি অপরিচিতা নারীর স্নেহাভিষিক্ত হৃদয় ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু বিস্তার করিয়া উৎকণ্ঠিত আবেগে জাগিয়া আছে।

বৌদির মুখে বিকাশের এই পরিচয় লাভ করিয়া সহসা যেন আমার মনের একটি রুদ্ধ জানালা খুলিয়া গেল। তাহারই ভিতর দিয়া আমার অনভিজ্ঞ জীবনের স্বল্পালোকিত রাজপথের উপর চাহিয়া

দেখিতে কেমন যেন একটা বিস্ময় অনুভব করিলাম। এবং যে মানুষটাকে আমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হিসাবে কল্পনা করিয়া মনে মনে তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলাম, সেই মানুষটির জীবনের অজ্ঞাত রহস্যলোকের পানে অস্পষ্ট দৃষ্টিতে চাহিতেই অন্তরের মধ্যে শিহরিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, না জানি আরও কি গভীর রহস্য লুকান আছে এই মানুষটির মধ্যে। আমার অজ্ঞানতাপ্রসূত নির্বুদ্ধিতার দরুণ যে তাহাকে নিকটে পাইবার কল্পনা করিতেছিলাম, তাহার জন্য ভিতর হইতে কে যেন পরিহাস করিয়া উঠিল। অনেকে হয়ত বলিবেন, ইহা এমন কি একটা ঘটনা যাহার জন্য মাত্রাহীন উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যুত্তরে কিছুই বলিবার নাই। কারণ বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বাস্তবিকই ইহা নিছক সেবার কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি এমনই উচ্ছ্বাসপ্রবণ যে এই সামান্য কাহিনী টুকুকে কেন্দ্র করিয়া এত অপ্রয়োজনীয় কথা সৃষ্টি করিলাম। কিন্তু তাহা যে আদৌ সত্য নহে সে প্রমাণ যথাস্থানে দিব। উপস্থিত পূর্বকথার সূত্র ধরিয়া যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। সে রাত্রে বহুক্ষণ নিদ্রাবিহীন শয্যায় শুইয়া একটা অসহ্য কৌতুহল বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল, "কে এই অদ্ভুত মানুষটি যে অসঙ্কোচে পরিণতা বয়স্কা অনাত্মীয়া নারীর রোগ শয্যায় অকুণ্ঠ সেবার মধ্যে নিজের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া বলিতে পারে 'আমায় আপনি ছেলের মতই দেখবেন।' ইহা তাহার অহঙ্কারী চিত্তের দাম্ভিক উক্তিও নয়, অথবা অক্ষম হৃদয়ের সহজ-সৌজন্য রক্ষাও নয়। ইহা তাহার কাছে কঠিন সত্য। একটি অপরিচিত নারীর সেবার

ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পূর্বে নিজের পুরুষত্বের দাবীকে যে মানুষ অস্বীকার করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়া আমার উচিত নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

ইহার কয়েকদিন পরে শরীরটা একটু অসুস্থ বোধ করায় মিঃ ঘোষের নির্দেশমত সেদিন আর আফিসে যাই নাই। যথা সময়ে সমস্ত মেস বাড়ীটা খালি করিয়া যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। জ্বরভাব মত হওয়ায় চুপচাপ কিছুক্ষণ শুইয়াছিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ শুইয়া থাকাও যেন ভাল লাগিল না। বারান্দায় একটু পায়চারী করিলে মন্দ হয় না এই ভাবিয়া বারান্দায় আসিতেই চোখ পড়িল বিকাশের ঘরের দরজায় তালা ঝোলান বটে, কিন্তু চাবিটা ঠিকমত বোধ হয় লাগে নাই, তালাটা খোলাই রহিয়াছে। কৌতুহল বলিয়া মানুষের একটা বস্তু আছে যাহার প্রেরণায় যে কোন কাজই সম্ভব হয়। এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ যখন কৌতুহল জাগিয়া উঠে তখন কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন এমন হইল। এবং যে মানুষটাকে প্রতিদিন দেখিতেছি আজ সেই মানুষটার অনুপস্থিতিতে ঘর খোলা পাইয়া ভিতরে ঢুকিবার একটা অদম্য কৌতুহল সহসা জাগিয়া উঠিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। মনে হইল সেই রুদ্ধদ্বার ঘরখানি যেন কি এক অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধান দিবার জন্য

অদৃশ্য ইঙ্গিতে আমায় আহ্বান জানাইল। এবং বেশ মনে আছে যে চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া অতি সন্তর্পণে ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বিকাশের ঘরে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। এমনকি তাহার অনুপস্থিতিতে ও এমনি ভাবে দরজা খোলা পাইলে কেহ তাহার ঘরে হয়ত ঢুকিত না। কারণ সকলেই তাহাকে এমন একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখিত যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবার মত সাহস মেসের কাহারও ছিল না। কিন্তু আমি যে কি দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া ভিতরে ঢুকিলাম কে জানে। ইহার আগে একদিন মাত্র তাহার ঘরে ঢুকিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন ঘরটাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই নাই। ঘরে ঢুকিবা মাত্র যেন কি একটা অভাবনীয়ের চকিত স্পর্শে সমস্ত দেহে শিহরণ খেলিয়া গেল। ঘরের একপাশে খাটের উপর তাহার বিছানা পাতা—জীর্ণ মলিন বিছানার হতশ্রী দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় যে মানুষটার রুচির কোন বালাই নাই। আরেক পাশে ছোট-ছোট দুইটি তারের আলমারী, নানা রকম বইপত্রে দুটি ভর্ত্তি। একটা টেবিলের উপর রাশীকৃত বই, অধিকাংশই ইংরাজী। লিখিবার সরঞ্জাম, একটা চেয়ারও আছে। খাটের মাথার কাছে ভায়োলিনটা রাখা, বালিশের পাশে একটা বাঁশিও আছে। এবং পায়ের কাছে একটা ছোট আলমারীতে নানা রঙের নানা আকারের বোতল এবং কয়েকটা গ্লাস। বোতলের পানীয়গুলি সকলের কাছে সুপেয় নয়। খাটের তলায় একটা সুটকেশ আছে, সেটাতে চাবি দিবার জায়গার অভাবে খোলাই রহিয়াছে। দেওয়ালে একটা ভাল ক্যালেণ্ডারের প্রথম মাসের কাগজটা ছিঁড়িবার পর বোধহয় উৎসাহের অভাবে বাকিগুলা ছেঁড়া হয় নাই। অন্য কোন ছবি নাই। ঘরের কোণে

স্তূপীকৃত ময়লা কাপড় বোধ করি ধোপার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে। জুতার সংখ্যা এক গাদা এবং সেগুলো ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত। এবং এই অপরূপ ঘর খানির মধ্যে প্রচণ্ড নীরবতা লইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর টেবিলের উপর গিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কের মত এটা সেটা নাড়িবার পর একটি অতি পুরাতন বইয়ের এককোণে একটি মেয়ের নাম দেখিয়া প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মেয়ের নাম দেখিয়া যে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম তাহা নহে। যে কথা কয়টি লেখা ছিল তাহাই চোখে পড়িতে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। দেখি লেখা রহিয়াছে, "Presented to Bikash Roy"—এবং উপহার দাত্রী নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন 'সুনীতি'। এবং যে তারিখটা দেওয়া রহিয়াছে তাহা প্রায় ১১।১২ বছর আগের। প্রথমটা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনেকে হয়ত এই পর্যন্ত পড়িয়াই বলিবেন, 'তুমি কি ঘাস খাও বাপু? একটা পুরুষের কাছে একটি মেয়ে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া একটি বই উপহার দেওয়ার অর্থ করাটা কি এতই কঠিন?' কঠিন যে নয় তাহা আমি জানি। কিন্তু যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর এই সমস্ত গুহ্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া আসে সে পরিমাণে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তাই একটা ফ্যাকাসে অক্ষর যেন হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আমার বিস্ময় বিমুগ্ধ নীরব দৃষ্টির সম্মুখে নড়াচড়া সুরু করিয়া দিল। আগ্রহের বশে আরও কয়েকটা বই নাড়াচাড়া করিলাম কিন্তু আর কোথাও ঐ অক্ষরগুলির মত আর কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। এবং মানুষের কৌতূহল একবার জাগ্রত হইলে সে যে সব কিছুই করিতে দ্বিধা করে না সেইদিন যেন তাহার প্রমাণ পাইলাম। সেদিন যাহা করিয়াছিলাম তাহা আগে কখনও করি নাই এবং সেই দিনটির

পরেও আর কখনও করি নাই। একটা অবিশ্বাস্য শক্তির ইঙ্গিতে যেন যন্ত্র চালিতের মত বিকাশের খোলা স্যুটকেসটি খুলিতেই স্যুটকেশের ডালার মধ্যে একখানি ছোট্ট ছবি আবিষ্কার করিলাম। ছবিটি বহু পুরাতন এবং মানুষটিকেও সহজে চিনিবার উপায় নাই। দীর্ঘদিনের জল হাওয়া লাগিয়া ছবিটা বিবর্ণ ম্লান হইয়া গিয়াছে। এবং ছবির মানুষটিকে ভবিষ্যতে দেখিলে যে চিনিতে পারিব না সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রহিল না। যতটুকু বুঝিলাম ছবিটি একটি অল্পবয়সী মেয়ের। এবং তাহার তলায়ও ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে "I am sorry" লেখকের নাম না থাকিলেও মনে হইল বিকাশেরই লেখা। অন্ততঃ পুরুষের ত নিশ্চয়ই। এবং কেন জানি না মনে হইল ছবির মেয়েটি ও বইয়ের সুনীতি একই ব্যক্তি। একটা অজ্ঞাত আশায় বিস্ময়ে সমস্ত শরীরটা ঘামিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে ছবিটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্যুটকেসটা বন্ধ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেই সঙ্গে রাজ্যের অবিশ্বাস্য চিন্তাগুলা যেন ঘর হইতে নিজের মনের মধ্যে করিয়া নিয়া আসিলাম। নিজের ঘরে ঢুকিয়া ক্লান্ত দেহে যতবার ঘুমাইবার চেষ্টা করি ততবারই সেই বইয়ে লেখা নামটি এবং ছবির অস্পষ্ট ছায়াটি মনের মধ্যে বারবার জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমার মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলি বারবার আনাগোনা করিতে লাগিল তাহা হইল, 'এই সুনীতি মেয়েটি কে? বিকাশের সঙ্গে তাহার সম্পর্কই বা কি? এবং ফটোর মেয়েটি কি একই ব্যক্তি?' অনেকে হয়ত বলিবেন, "এতকথা জানিয়া তোমার প্রয়োজন কি?" প্রয়োজন যে কি তাহা সঠিক নিজেও বুঝি নাই। শুধু মনের মধ্যে বারবার কে যেন অস্ফুটে বলিয়া উঠিতে লাগিল "পেয়েছি পেয়েছি, ঠিক মানুষটিকেই পেয়েছি।" কিন্তু তবুও কে যে

ঠিক আর কে যে বেঠিক তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এবং শত সহস্র সংশয়ের ভিড় ঠেলিয়া কিছুতেই প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া অবশেষে নিরস্ত হইলাম। বিকাশকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার উপায় নাই। কথাটা মনে হইতেই ভয় হইল। এই কয়দিনে একটা কথা বুঝিয়াছিলাম যে তাহার বাহিরের হাস্য-মুখর চপল স্বভাব মানুষটির অন্তরে আরেকটি মানুষ আছে যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং সেই অন্তর্লোকবাসীর অটল গাম্ভীর্য ক্ষুন্ন করিবার মত দুঃসাহস কাহারও নাই, অন্ততঃ আমার ত নয়ই—

কখন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। কাহার স্পর্শে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া যাইতেই চোখ মেলিয়া দেখি কপালে হাত রাখিয়া বিকাশ আমার জ্বর আছে কিনা তাহাই দেখিতেছিল। চোখ মেলিতেই স্মিত কণ্ঠে বলিল, "ঘুম ভেঙ্গে গেল?"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

বলিল, "জ্বর ত একটু রয়েছে দেখছি এখনও?"

বলিলাম, "একটু দুর্বল করে দিয়েছে। গায়ে হাত পায়ে একটু ব্যাথাও আছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হুঁঃ। দাঁড়াও আসছি" বলিয়া চলিয়া গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে দুটো ঔষধের বড়ি লইয়া আসিয়া বলিল, "এই দুটো খেয়ে ফেলো ত।"

বলিলাম, "ওদুটো কি?"

বলিল, "ইনফ্লুয়েঞ্জা টেবলেট—খেয়ে নাও, কাল সকালেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।"

বলিয়া আরেক দফা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া রাত্রের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার

পানে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সেবা করিবার সহজ অনাড়ম্বর ভঙ্গী ও ঐকান্তিকতার স্পর্শে মনটা যেন অনেকখানি শান্তি পাইল বলিয়া মনে হইল। এবং সে চলিয়া যাইবার পর তাহার সম্বন্ধে এই কথাটা লইয়াই চিন্তা করিতে গিয়া বৌদি অর্থাৎ মিঃ ঘোষের স্ত্রীর অসুখে তাহার সেবা করিবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। অসুখ আমার এমন কিছু কঠিন নয়। অতএব ইহার মধ্যে সেবা যত্নের প্রয়োজনও খুব বেশী নয়। কিন্তু তবুও সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন, স্নেহনিবিড় স্পর্শের মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের যে পরিচয়টি আমার কাছে রাখিয়া গেল তাহা সামান্য নয়। কি একটা দরকারে সে বোধহয় তাহার ঘরে গিয়াছিল, আমার দরজার সামনে দিয়া যাইবার সময় ডাকিয়া বলিলাম, "তুমি বেরুচ্ছ নাকি ?"

বলিল,, হ্যাঁ, কেন বলত ?"

ইচ্ছা হইল তাহাকে থাকিতে বলি, কিন্তু কি একটা দুরন্ত সঙ্কোচ যেন আমার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। বলিলাম, "না যাও। কখন ফিরবে ?"

ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। এবার ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "তোমার কিছু দরকার আছে ?"

সমস্ত সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া বলিলাম, "না, মানে একা একা শুয়ে থাকব—তাই বলছিলাম।"

হাসিয়া বলিল, "ওঃ—তাই বল।" এবং কিছুক্ষণ পরে জামা কাপড় ছাড়িয়া আমার মাথার কাছে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "তুমি এত লাজুক কেন বলত মাষ্টার ?"

হাসিয়া বলিলাম, "লজ্জা কোথায় দেখলে আমার ?"

তাহার কথার ধরণে যদিও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে সে আমার

মনের কথাটি টের পাইয়াছে তবুও কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য বলিলাম। আমার কথার উত্তরে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার গালটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল "আমায় কি অতই বোকা পেয়েছ? সোজা বল্লেই ত পার্তে যে যেও না, থেকে যাও—সেটা বলতে বুঝি লজ্জা কর্‌?"

লজ্জিত মুখেই কথাটা স্বীকার করিয়া নিলাম। এবং বলিয়া ফেলিলাম যে মাথার বড় যন্ত্রণা হইতেছিল বলিয়াই তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কথাটা শুনিয়াই বলিল, "মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে? আচ্ছা দিচ্ছি ঠিক করে।"

বলিয়া মেসের চাকরটাকে ডাকিয়া মিঃ ঘোষের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল ওডিকোলন চাহিয়া আনিবার জন্য। এবং নিজে বসিল আমার মাথা টিপিতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন মেসের চাকরের সঙ্গে ওডিকোলনের শিশি হাতে করিয়া বৌদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সত্যই বিব্রত বোধ করিলাম। এবং বৌদির পরনের কাপড়-চোপড় দেখিয়াই বুঝিলাম যে তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, খবর পাইয়া সেই অবস্থাতেই চলিয়া আসিয়াছেন। উঠিয়া বসিতে যাইতেই বলিলেন, "থাক্ থাক্ উঠতে হবে না।"

বলিয়া সোজা কাছে আসিয়া বুকে মাথায় হাত রাখিয়া গায়ের তাপ অনুভব করিয়া বলিলেন, "জ্বর করে নাসে আড় একটা খবরও কি দিতে নেই?"

ইহার উত্তরে কিছু না বলিব, বলিবারও কিছু নাই। কারণ অসুখ সামান্যই। এবং গুরুতর হইলেও যে তাঁহাদের খবর দিবার মত কোন প্রয়োজন ঘটিতে পারে এমন কথা মনে হয় নাই। আর মনে হইবার কথাও নয়। কারণ একে ত তাঁহার সহিত

পরিচয় আমার অল্প দিনের—এমন কিছু ঘনিষ্ঠতাও তাঁহার সহিত করি নাই। তাছাড়া সামান্য কারণে তাঁহাকে খবর দেওয়ারও কোন অর্থ হয় না। তাই সবিনয়ে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই বলিলেন, "হয়েছে, হয়েছে বুঝেছি।"

বলিয়া বিকাশকে বলিলেন, "ওকে নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও ত ভাই—আমি আবার রান্না চাপিয়ে এসেছি।"

বৌদির কথা শুনিয়া বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এবং বোকার মত বলিয়া ফেলিলাম, "কোথায় নিয়ে যাবেন আমায় ?"

বিকাশ বৌদির হুকুম তামিল করিবার জন্য চলিয়া যাইতেছিল, আমার প্রশ্ন শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া ফেলিল।

বৌদি বলিলেন, "কোথায় আবার, আমার বাড়ীতে। ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "না না তার দরকার নেই। আমি—"

বাধা দিয়া বৌদি বলিলেন, "না-না-কেন ? আপত্তিটা কি তোমার ?"

আপত্তিটা যে কি তাহা নিজেও ঠিক বুঝি নাই। তবুও বিদেশে আসিয়া নিজের অসুস্থতা লইয়া অপরের সংসারে গিয়া পড়িবার মত অবস্থা কখনও হয় নাই, সে অভিজ্ঞতাও ছিল না। এবং যদি সত্যই অসুখটা বাঁকিয়া দাঁড়ায় তখন কি অবস্থা হইবে না হইবে এইসব চিন্তা করিয়াই যে কথাটা বলিয়াছিলাম তাহা নহে। মনে হয় অনাত্মীয় নরনারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার শিক্ষা কোনদিন পাই নাই বলিয়া সহজ সৌজন্য এবং ভদ্রতাবোধ-জনিত নানাবিধ সংস্কারের বশেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাই বৌদির কথার উত্তরে বলিলাম, "না আপত্তি কি আছে ? মানে কেন মিছিমিছি ঝঞ্ঝাট—"

আমায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবেনা। ঝঞ্ঝাট আমাদের পোয়াতে হয়, আমার ঘরেও ছেলেমেয়ে আছে।" বলিয়া স্মিতমুখে বিকাশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শোন কথা উনি আমার ঝঞ্ঝাট ভেবে মাথা খারাপ কচ্ছে'ন। তুমি যাও দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

বিকাশ চলিয়া যায় দেখিয়া অধিকতর ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "দাঁড়াও বিকাশ। না, না, বৌদি আপনি ব্যস্ত হবেন না। সামান্য জ্বর নিয়ে এত উতলা হচ্ছেন কেন। ও কালকেই সেরে যাবে।"

বৌদি বলিলেন, "আমি কি বলছি জ্বর কালকে সারবে না? কাল যদি সারে ত কালই চলে এস। আজত চল।"

হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "দু'একটা দিনের জন্য আবার মিছিমিছি হায়রাণ হয়ে লাভ কি?"

তখনও বুঝি নাই, যে নারীর অন্তরে প্রকৃত স্নেহ আছে তাহাকে অত সহজে নিরস্ত করা সহজ নয়। বলিলেন, "আচ্ছা আজ তোমার মা যদি এখানে থাকতেন কি কর্ত্তে'ন বলত?"

একথা বলার পর আর কোন কথাই বলা চলে না। অন্ততঃ বলিলেও সেটা নিতান্ত নির্ব্বোধের মতই শোনায়। বিশেষতঃ মায়ের স্নেহের সহিত একটি অপরিচিতা নারীর স্নেহের তুলনা করিয়া এই স্বল্প পরিচিতা নারীর মাতৃগর্ব্বে আঘাত করিবার মত স্পর্দ্ধা হইল না। বরং কেমন যেন মনে হইল যে মায়ের স্নেহের অপেক্ষা এই স্নেহের মূল্য কোন অংশে কমত নয়ই, বরং কিছু বেশীও হইতে পারে। এবং তাঁহার স্নেহব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে লজ্জিতমুখে চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তবুও যাইবার ইচ্ছাটা কিছুতেই জাগিল না।

বিকাশ এতক্ষণ নীরবে সব শুনিতেছিল। এইবার বলিল, "কি হে যাবে ?"

কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলাম; হ্যাঁ, না কিছুই বলিলাম না। সে বোধ করি আমার মনের ভাবটা টের পাইয়া বৌদিকে বলিল, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে যারা সে সব লোকের দুঃখ পাওয়াই উচিত। আপনি মিছেই বকে মর্ছেন বৌদি। ও এমনি লক্ষ্মীছাড়া যে লজ্জা করেই মর্ল। যাক্ গে আপনি ভাববেন না বৌদি, ও মর্বেনা, ঠিক সেরে উঠবে।"

কথাটা বিকাশ নিতান্ত পরিহাসচ্ছলেই বলিয়াছিল কিন্তু মরিবার কথায় বৌদি চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বালাই ষাট, মর্বে কেন! আমি তা বলিনি, আমি বলছিলাম এখানে থাকলে হয়ত ওর অসুবিধা হবে, যদি অসুখ বাড়ে টাড়ে কে দেখবে না দেখবে—তা যখন ওর অতই অনিচ্ছা, তখন না হয় থাক।" বলিয়া বৌদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিকাশকে বলিলেন, "রামটহলকে বল আমায় একটু পৌছে দিয়ে আসুক।"

বলিয়া আমার পানে ফিরিয়া ম্লানকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন থাক না থাক খবর দিও, আর যদি বোঝ ত আমার ওখানে চলে যেও—লজ্জা করো না। কেমন ?" বলিয়া ধীরপদে বাহির হইয়া গেলেন।

বেশ বুঝিলাম আমার যাইতে রাজী না হওয়ার জন্য তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াই চলিয়া গেলেন। শেষের দিকে তাঁহার কণ্ঠস্বরটাও যেন হঠাৎ ভারী হইয়া গেল। তিনি চলিয়া যাইতেই একটা অব্যক্ত বেদনার দুঃসহ আবেগে বুকের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। এবং নিজের এই অযৌক্তিক কঠোরতার জন্য নিজেকে শতকণ্ঠে ধিক্কার দিয়া উঠিলাম। এমন অপূর্ব স্নেহের আবেগ আমার তুচ্ছ সংস্কারের পাষাণ

প্রাচীরের গায়ে ব্যর্থ আঘাত হানিয়া ফিরিয়া গেল ইহা ভাবিতেই একটা নিদারুণ লজ্জায় আমার অন্তর যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই। পরদিন যখন সত্যই অসুখটা বাড়িয়া গেল এবং বৌদির পুনরাগমন ও পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও যখন যাইতে অস্বীকার করিলাম তখন বিকাশও বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এবং নিজেও নিজের এই অহেতুক জিদের কোন অর্থ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কেবলই মনে হইতে লাগিল অসুখের মধ্যে তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে গিয়া পড়িয়া যে অনর্থটা ঘটাইব তাহা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। ইহার জন্য দায়ী যে আমার সংস্কার জনিত নিরর্থক সঙ্কোচ সে কথাটা বুঝিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না। এবং দিন সাতেক ভুগিবার পর রোগমুক্ত হইয়া নিয়মিত কাজে যোগদান করিলাম।

অসুখের মধ্যে মিঃ ঘোষ বার কয়েক দেখা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমায় লইয়া যাইবার জন্য কোন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। শুধু কাজে যোগদান করিবার কয়েকদিন পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মিঃ ঘোষ বলিলেন, "অসুখের সময় আমার স্ত্রী অত করে বল্ল আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে গেলেন না কেন?"

একেই ত রোগশয্যায় বৌদির স্নেহকাতর অনুরোধ অস্বীকার করিবার জন্য নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইয়াছিলাম তাহার উপর মিঃ ঘোষের প্রশ্ন শুনিয়া আরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। এবং স্থানকাল-পাত্রভেদে বিনয় প্রকাশেরও একটা ধারা আছে। তাই তাঁহার প্রশ্নের জবাবে সহসা কিছু বলিতে না পারিয়া নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। অদ্ভুত মানুষ মিঃ ঘোষ। দ্বিতীয় দিন আর সে প্রশ্ন করেন নাই। শুধু বিকাশ একদিন এই

প্রসঙ্গে কঠিনকণ্ঠে বলিয়াছিল, "কেবল ধোপ-দুরস্ত ভদ্রতাই শিখেছ আর কিছুই শিখলে না।"

প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলাম, "ভদ্রতা শেখাটা কি খারাপ বলে মনে কর?"

অম্লানবদনে বলিল, "করি বই কি, যখন দেখি যে, ভদ্রতার নীতি রক্ষা করে চলেছ সে ভদ্রতার অর্থ নিজেই জান না।"

তাহার কথার ধরণে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলাম, "না যাওয়ার জন্য রাগ করেছ নাকি তুমি?"

মাথা নাড়িয়া বলিল, "পাগল হয়েছ? আমি রাগ কর্তে যাব কোন দুঃখে? শুধু বৌদি মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন তোমার ব্যবহারে।"

বলিলাম, "তোমায় কি কিছু বলছিলেন?"

বলিল, "না। কিন্তু এসব কথা কি বলতে হয় মুখ ফুটে। বোঝা যায়।"

আর কিছু বলি নাই। কারণ বৌদি যে যথার্থই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন তাহা আমি নিজেও বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি যে আমার উপায় ছিল না।

তখন শ্রাবণ মাস শেষ হইতে চলিয়াছে। সমস্ত বর্ষাকালটা যে আমার কি করিয়া কাটিয়াছে তাহা শুধু আমিই জানি। নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও যে একটু বেড়াইতে বাহির হইব তাহার উপায় ছিল না। অথচ মেসে থাকিতেও যেন দম বন্ধ হইয়া আসিত। বিকাশ ঐ ঝড়জলের মধ্যে প্রায়ই কোথায় যাইত দেখিতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাও?"

হাসিয়া বলিল, "কেন বলত?"

বলিলাম, "না এমনি জিজ্ঞাসা কচ্ছি—এই বৃষ্টির মধ্যে গামবুট আর রেনকোট চড়িয়ে যাও কোথায়? প্রেমে টেমে পড়েছ নাকি?"

তেমনি হাসিয়া বলিল, "যদি পড়েই থাকি ভাগ বসাতে চাও নাকি ?"

প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিলাম, "না তোমার জিনিষে হাত দেওয়ার মত সাহস আমার নেই। বিশেষতঃ—।"

বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু আমার জিনিষে ত হাত দিয়েছ ?"

অপরাধ সচেতন মন আমার মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল। জোর করিয়া হাসি টানিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, "তার মানে ?"

উচ্চহাস্যে কাঁধটা চাপড়াইয়া বলিল, "মানে পরে বলব, "বলিয়া হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া তুলিল, মনে হইল হয়ত সে কোন উপায়ে টের পাইয়াছে যে আমি তাহার অবর্তমানে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিয়াছি। এবং কথাটা মনে হইতেই লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া গেলাম। মনে হইল যেন আমার একটা জঘন্য অপরাধ অত্যন্ত কুৎসিতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। একবার ভাবিলাম তাহার কাছে সব খুলিয়া বলি এবং কৃতকার্যের জন্য তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা লই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল হয়ত সে রহস্য করিয়া কথাটা বলিয়াছে, আসল সত্য জানেই না। অতএব কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

সেও যেন কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "কি বলছিলে বল্লে না ত ?"

বলিলাম, "কখন কি বলছিলাম।"

বলিল, "ঐযে গো 'আমার জিনিষে হাত দেবার অধিকার নেই বলে কি বলছিলে—যে বিশেষতঃ ?"

বলিলাম, "না বলছিলাম, তোমায় যদি কোন মেয়ে ভালবাসে সে কোন দুঃখে তোমায় ছেড়ে আমায় ভালবাসতে যাবে ?"

কথাটা বলিয়াছিলাম নিছক পরিহাসের প্রত্যুত্তরে। এবং সেও যে কথাটা বুঝিতে পারে নাই এমন নহে। কিন্তু পরক্ষণেই যে কথাটা সে

বলিল তাহা যেন কেবল পরিহাস বলিয়াই মনে হইল না।

বলিল, "এমন ত হতে পারে যে সে আমাদের দু'জনকেই ভালবাসবে? She will love us both.—"

হাসিয়া বলিলাম, "তা হলেই হয়েছে।"

বিকাশ বলিল, "কেন এমন কি হতে পারে না?"

তাহার অদ্ভুতকথা শুনিয়া বলিলাম, "হতে পারে কিনা জানি না, তবে হয় না। ভালবাসাটা ত আর পেস্তা বাদাম নয়, যে দুটো দুটো করে ভাগ দেব পাঁচজনের মধ্যে। Either a girl must love only one man or she loves none."

মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি প্রেমের ছাই জান?"

সস্মিতমুখে কথাটা মানিয়া লইয়া বলিলাম, "তা সত্যি। কিন্তু তোমার কি মনে হয় যে একটা মেয়ে দুটো মানুষকে ভালবাসতে পারে?"

বলিল, "আমার মনে হয় পারে।"

বলিলাম, "কিছু প্রমাণ পেয়েছ?"

হাসিয়া বলিল, "প্রেমে না পড়লে কি করে প্রমাণ পাব?"

একবার ভাবিলাম সুনীতির কথাটা পাড়িয়া দেখি। পরক্ষণেই ভয় হইল তাহার চরিত্রের অন্য দিকটার কথা স্মরণ করিয়া।

মানুষের জীবনটাকে একটা বেগবান নদীর সহিত তুলনা করিলে নেহাৎ অন্যায় হয়না। চলমান নদীর স্রোতের মত মানুষের জীবনটাও প্রতিমুহূর্ত্তে বাঁকিয়া ঘুরিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নানাভাবে নানাপথে চলিতেছে, এবং সেই স্রোতের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িলে যেন উপলব্ধির ক্ষমতাটুকুও লুপ্ত হইয়া যায়। কখন কি হইতেছে না হইতেছে, জীবনটা কোন পথে চলিতেছে, তাহা ভাল কি মন্দ, এ সমস্ত

কথা চিন্তা করিবার যেন সময়ই থাকে না, শক্তিও থাকে না। এবং মানুষটি যেন অচেতন অবস্থায় সেই স্রোতাবেগের মুখে বৃন্তচ্যুত পত্রের মত ভাসিতে ভাসিতে চলে। চেতনা ফিরিয়া পায় তখনই, যখন কোন এক অনির্দেশ্য কারণে জীবনের গতিবেগের প্রাবল্য হইতে মনটা মুক্ত হয়। এবং তখনই যেন জীবনের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় পাওয়া যায়। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবা চলে জীবনটা কোথা হইতে সুরু করিয়াছিলাম, কোন কোন পথে কেমন করিয়া কি কারণে বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জীবনটা আসিলই বা কোথায়? এসব কথা তখনই স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করা চলে যখন জীবনের আভ্যন্তরীণ জটিলতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তুলিতে পারি। এবং এই অবকাশ সময়ের মধ্যে যে বস্তুটা চোখে পড়ে তাহা হইল কয়েকটি ঘটনার অন্তবর্ত্তী একটা দৃঢ় ঐক্য। আপাতদৃষ্টিতে যে ঘটনা সমূহ পারস্পরিক সংযোগবিহীন, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলিয়া মনে হয়, স্থির মস্তিষ্কে ভাবিবার মত পর্যাপ্ত সুযোগ থাকিলে দেখা যায় যে সে সব ঘটনার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যের সূত্র অবস্থিত। এবং এই সমস্ত ঘটনা সমূহের একটা বিবরণ চাহিলে লজ্জিতমুখে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এবং স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা আমার জীবনের স্বাভাবিক গতি বৃদ্ধি বা শ্লথ করিবার প্রচেষ্টায় আগ্রহশীল, তাহাদের মধ্যে যে কয়েকটি স্মরণের গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া মর্মজগতে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে সে সব ঘটনার গুরুত্ব স্থান কাল পাত্রভেদে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। এবং সহসা দেখিলে মানুষের জীবনটাকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি বলিয়াই মনে হয়। যেন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এবং সেই সব ঘটনা-গুলির সহিত জড়িত পাত্র-পাত্রী ও স্থানকালগুলিকে মানুষটি স্পর্শ

করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে যে মানুষটির জীবনে এইসব ঘটনা ঘটিয়াছে সে নিজেও হয়ত ইহাদের পারম্পর্য নির্ণয় করিতে পারে না। বাহির হইতে এইসব ঘটনাগুলির মধ্য হইতেই মানুষটিকে চিনিয়া লইতে হয়। এইভাবে সব সময়ে যে মানুষটিকে সম্পূর্ণ জানা যায় তাহা নহে, তবে অল্পবিস্তর বুঝা যায়। বিশেষতঃ যদি কোন মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কোন কাহিনী রচিত হয়, তখন আলোচ্য মানুষটির জীবনের কয়েকটি ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়া সমগ্র মানুষটিকে প্রকাশ করিয়া তুলিবার একটা চেষ্টাই প্রকট হইয়া পড়ে। ইহাই হইয়া আসিতেছে। কখনও কাহাকেও আপত্তি করিতে শুনি নাই। অতএব আমার বেলায় ও যে আপত্তি উঠিবে এমন সংশয় মনেও স্থান দিই না।

একদিন বিকাল বেলা অন্যমনস্কের মত পথ চলিতে চলিতে সহজে চলিবার রাস্তাটা ধরিয়া অনেক খানি চলিয়া আসিবার পর যেন খেয়াল হইল এতটা দূর একা চলিয়া আসিয়া ভুল করিয়াছি। কারণ এতটা পথ আবার একাই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন ও সন্ধ্যা হয় নাই। গোধূলির ম্লান সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মিজাল পথের ধূলি-কণাকে রাঙাইয়া দিয়াছে। কুলায়গামী পাখীদের কলকণ্ঠে আসন্ন শরতের মেঘমুক্ত নীলাকাশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীটা জুড়িয়া একটা নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা যেন আপন অদৃশ্য পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। কেমন যেন একটা অপরিচিত মোহাবেশে অন্তর আবিষ্ট হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্বিৎ হারাইয়া পথের মাঝে দাঁড়াইয়া গেলাম। হঠাৎ মোহজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল দূরে একজনকে আসিতে দেখিয়া। সে আমায় দেখিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে বিকাশ।

এবং একটা অদ্ভুত খেয়ালের বশে পথ হইতে নামিয়া পথের ধারে অবস্থিত বড় বড় গাছগুলার একটার আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইলাম। কেন যে দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব না। নিজের কাছেই নিজের এই আচরণ অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে পারিলাম না। লক্ষ্য করিলাম মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিকাশ পথ চলিতেছে। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোয় তাহাকে যেন অপরূপ বলিয়া মনে হইল। কর্মক্লান্ত কঠিন মুখের উপর চিন্তার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। এবং সেই চিন্তাক্লিষ্ট তাম্রাভ মুখের উপর গোধূলির শেষ সূর্যালোক পড়িয়া তাহাকে যেন অপরিচিত জগতের অধিবাসী বলিয়া মনে হইল। একবার ভাবিলাম তাহাকে ডাকি। কিন্তু পরক্ষণেই অসময়ে তাহাকে এই রাস্তায় এতখানি চিন্তাভারাবনত ক্লান্ত মনে আসিতে দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিলাম এমনি করিয়া প্রায়ই সে কোথায় যায় তাহা দেখিবার সুযোগ যখন আজ আমার হইয়াছে তখন সে সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। তাহাকে আগাইয়া যাইতে দিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলাম। প্রথমেই বলিয়াছি এই রাস্তাটাই সহরে যাইবার রাস্তা। এবং সহর আমাদের কারখানা হইতে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে। কিন্তু কারখানা হইতে মাইল ৫ দূরে একটা বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে ; সেখানকার বহির্জীবনের ধারাটা নাগরিক কিন্তু অন্তর্জীবনটা গ্রাম্য। অর্থাৎ বড় বড় কয়েকটা দোকান আছে, কয়েক ঘর বড়লোকের বাড়ী ও আছে। দোকান পাটও নেহাৎ মন্দ নয়। এবং সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ সেখানকার জনকয়েক গণিকা। জায়গাটির নাম রাণীচক। রাণীচককে গ্রাম বলিলেও যতখানি অন্যায় হয় সহর বলিলেও তাহা অপেক্ষা কম অন্যায় হয় না। গ্রামের

সংক্ষিপ্ততা এবং সহরের আড়ম্বর দুইটার কোনটাই কম নয়। অর্থাৎ রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত বড় বড় হ্যাজাক বাতি জ্বালাইয়া ও, লোকজনের আনাগোনার মধ্য দিয়া নাগরিক আভিজাত্য যতখানি প্রকাশ পায়, বাতি নিভিবার অব্যবহিত পরেই শিয়ালের ডাকের দ্বারা গ্রাম্যতা দোষও ততখানি প্রকাশিত হয়। এটি যেন পরবর্ত্তী সহরের ক্ষুদ্র অংশ, সূচনা মাত্র। ছুটির দিনের কারখানার লোকদের আনাগোনা প্রায় চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। এবং সেই উপলক্ষে দোকানদার হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁবু খাটান সিনেমাওয়ালারা যথেষ্ট পয়সা করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী পয়সা উপার্জ্জন করে ঐ কয়েক ঘর গণিকারা। তাহাদের পসরা খরিদ করিবার মত ক্রেতার আর অভাব থাকে না। শুধু ছুটির দিন বলিয়া নয়, এমনি দিনেও অনেক উৎসাহী মানুষ নৈসর্গিক সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া রাণীচকে আসিয়া তাহাদের সপ্তাহের উপার্জ্জনের একটা মোটা অংশ পছন্দ মত গণিকার হাতে তুলিয়া দিয়া আকণ্ঠ দেশী মদ খাইয়া যখন ফিরিয়া আসে তখন তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিতে ও ভয় হয়।

রাণীচকের কথা অল্পবিস্তর শুনিয়াছিলাম, কিন্তু জায়গাটা স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। এবং আজ যখন অভাবনীয় যোগা-যোগে রাণীচকে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন মনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক সন্দেহ মনটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিতে লাগিল। বিকাশের সম্বন্ধে আর যে ধারনাই থাক না কেন সে যে কারখানা জীবনের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য রাণীচকে আসিয়া কারখানার অন্যান্য পাচজন সাধারণ শ্রমিকের মত সস্তা দরের মদের নেশায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গণিকার ঘরে রাত্রি যাপন করিবে এমন কথা কখনও ভাবি নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন সে এমন কি মহাপুরুষ।

কারখানা-জীবনের পৈশাচিক পরিবেশের মধ্যে অবিবাহিত মানুষের হাতে টাকা থাকিলে অকুণ্ঠিত পদক্ষেপে গণিকার ঘরে ঢুকিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি বাস করা যে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে, একথাও আমায় বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। সে কথা যে আমি বুঝি না তাহা নহে। এবং সময় বিশেষে যে সে কথা লইয়া চিন্তা করি নাই তাহা নহে। কিন্তু সুনিশ্চিত প্রমাণাভাবে সে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এবং শুধু তাহাই নহে, কেন জানি না মনে হইত সে এ কাজ করিতে পারে না। মদ খাইতে তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া অন্যান্য মানুষের মত আনুষঙ্গিকটার প্রতি বিকাশের দৌর্বল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারি নাই।

মদ খাওয়া যে অত্যন্ত জঘন্য কাজ বা পাপের পথে মদের বোতলের অগণিত ছড়াছড়ি; একটা বোতল হাতে করিলেই ঊর্ধ্ব নিশ্বাসে ছুটিয়া একেবারে অধঃপাতের চরম সীমায় পৌঁছান যে আদৌ কঠিন নয়, এ সমস্ত তথ্য কোনদিন বিশ্বাস করি নাই। তাই স্বচক্ষে বিকাশকে মদ খাইতে দেখিয়াও নারীর প্রতি তাহার দেহজাত লালসার জঘন্য প্রবৃত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হই নাই। কিন্তু আজ যখন তাহাকে অসঙ্কোচে একটা গণিকার বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিলাম তখন একটা অপরিচিত ঘৃণার স্পর্শে সমস্ত মনটা যেন অসাড় হইয়া গেল। ভাবিলাম সে যে এত নীচ তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। যে মানুষটা সর্ব বিষয়ে এতখানি সচেতন সেই মানুষটা যে কি করিয়া এমন দৃঢ় পদক্ষেপে একটা গণিকার ঘরে গিয়া উঠিতে পারে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। সে সময়ে চরিত্র সম্বন্ধে একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল এবং যে কোন সামান্য কারণেই যে সেই মহামূল্য সামগ্রীটিতে কলঙ্কের কালি লাগিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চিরদিনের জন্য তাহার পূর্ব গৌরব

লুপ্ত হইতে পারে এমন হাস্যকর ধারণাই ছিল সে সময়ের পক্ষে স্বাভাবিক। উত্তর জীবনে অবশ্য এ ভ্রান্ত ধারণাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এবং চরিত্র বস্তুটাকে অত ক্ষণভঙ্গুর, অত সামান্য বলিয়াও মনে করিতাম না। বেশ বুঝিয়াছিলাম যে সামান্য উত্তেজনার মুহূর্তে দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আকস্মিক আকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার যৌন লালসা চরিতার্থতার সঙ্গে চরিত্রের সংযোগ অতি সামান্যই—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যৌন ক্ষুধা চরিতার্থতার এই বিকৃত পন্থা অস্বাভাবিক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অন্যায় বলি কি করিয়া? কিন্তু যে সময়কার কথা লিখিতেছি সে সময়ে সবেমাত্র পারিবারিক জীবনের ভালমন্দ সংক্রান্ত সুকঠোর নিয়মকানুনগুলি নিজের অজ্ঞাতসারেই সংস্কারের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক মানেই যে অন্যায় একথাটাও যেন কেমন করিয়া আমার মনের মধ্যে চিরস্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছিল। অস্বাভাবিক মাত্রেই যে অন্যায় এই হাস্যকর কথাটাই তখন মনের মধ্যে কারণে অকারণে আলোড়িত হইত। তাই দুঃশ্চরিত্র বলিতে বুঝিতাম যে মানুষটা মদ ও তাহার আনুষঙ্গিকের মধ্যে অকারণ আত্মবিসর্জ্জন দেয়। এবং একটি দেহ-বিক্রয়কারিণীর ঘরে বিকাশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার চারিত্রিক নীচতার জন্য তাহার প্রতি একটা প্রগাঢ় ঘৃণার উদ্রেক হইল। তাহার চরিত্রের যে আরও একটা রূপ থাকিতে পারে একথাটা ভুলিয়া গেলাম। এবং তাহার সহিত এতদিন যে মিশিয়াছি সেই কথাটা স্মরণ করিয়া অপরিসীম লজ্জায় মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না যে কি করিয়া ভবিষ্যতে মানুষটার সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিব। কারণ বাজারের গণিকার সহিত যাহার ঘনিষ্ঠতা আছে তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখাও নিজের কাছে অত্যন্ত হীন অপরাধ বলিয়া মনে হইল। এবং বেশ

কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘৃণা বিজড়িত তীব্র ক্রোধের জ্বালা লইয়া চলিয়া আসিলাম। বিকাশের সঙ্গে যে আমার কোন পরিচয় আছে অধীর উত্তেজনায় তাহা ভুলিয়া গেলাম। মনে মনে যে তাহারই কথা চিন্তা করিতেছিলাম সে কথাটাও বারবার অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহার বিগত জীবনের অনেকখানিই আমার অজ্ঞাত। শুধু তাহার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক আমার বা অন্য সকলের চোখে পড়িয়াছিল তাহা তাহার রহস্যপ্রিয়তা এবং পরিহাস রসিকতা, এবং সকল মানুষের সঙ্গে তাহার অকুণ্ঠিত আচার ব্যবহার। বৌদির মুখে তাহার সেবাপরায়ণতা ও ঔদার্যের পরিচয় কিছুটা পাইয়াছিলাম, নিজের অসুস্থতার মধ্যে তাহার প্রমাণও যে অল্পবিস্তর পাই নাই তাহা নহে। আবার তাহার সুটকেশের মধ্যে সেই অপরিচিতা নারীর ছবিও আমার কল্পনাকে প্রবলভাবেই আলোড়িত করিয়াছিল। এবং প্রথম দিকের এই পরিচয়ের সঙ্গে তাহার পরবর্ত্তী জীবনের সামঞ্জস্যহীনতার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে সত্যই একটা বেদনা জাগিল। এবং একবার এমন কথাও মনে হইল যে মানুষটাকে অধঃপাতের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এবং একদিকে তাহার জন্য অন্তহীন সহানুভূতি ও বেদনাবোধ এবং অপরদিকে গভীর ঘৃণা বিজড়িত অশ্রদ্ধা এই উভয়ে মিলিয়া আমার মনটাকে এমনই বিচলিত করিয়া তুলিল যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিলাম না।

গভীর রাত্রে বিকাশের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইলাম। মেসের দরজা খুলিয়া দিবার জন্য মেসের চাকরকে ডাকিতেছে। কি মনে হইল তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিলাম। বিকাশ ভিতরে ঢুকিয়াই যেন চমকিত হইয়া উঠিল। বলিল, "কি মাষ্টার ঘুমাওনি এখনও?"

শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "না।" এবং কথা বলিবার জন্য অকারণে তাহার কাছে সরিয়া আসিলাম। কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা নয়; অর্থাৎ সে মদ খায় নাই।

বিকাশ দরজাটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে আছ যে? অন্য দিন ত থাক না।"

চাপা ক্রোধ সংযত করিয়া বলিলাম, "তোমার জন্যই জেগে আছি।"

কথাটা পরিহাস মনে করিয়া স্বভাবসুলভ হাসি হাসিয়া বলিল, আমার অশেষ সৌভাগ্য। তুমি যদি মেয়ে হতে মাইরী।"

ভাবিলাম বলি, "সে আশাও ত মিটিয়াছে আর কেন?" কিন্তু বলিতে পারিলাম না। আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি যে তাহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ লইয়া তাহার কাছে গিয়াও কিছু বলিতে পারি নাই। তাহার হাস্য মুখর সহজ রূপটির অন্তরালে এমন একটি রহস্য-ময় অটল গাম্ভীর্য ছিল, যাহা সহজে ক্ষুন্ন করা সাধারণের কাজ নয়। তাহার সামনে দাঁড়াইলেই মনের মধ্যে কেমন যেন সব উলট পালট হইয়া যাইত। অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও কিছুই বলিতে পারিতাম না। তাহার চিত্তের অপরিচিত বলিষ্ঠতার ঈষৎ আভাস মনের মধ্যে এমন একটা দৌর্বল্য সঞ্চারিত করিয়া দিত, যে কিছুতেই তাহার জের কাটাইয়া উঠিতে পারিতাম না। হইল ও তাহাই। সন্ধ্যা হইতে যে নিদারুণ ঘৃণা তিলে তিলে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা যে কখন নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল বুঝিতে ও পারিলাম না। এবং দরজা বন্ধ করিয়া সে যখন বলিল, "চল উপরে যাওয়া যাক" তখনও কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া তাহার ঘরে আসিয়া হাজির হইলাম। অন্যান্য দিন তাহার ঘরে

খাবার ঢাকা থাকে। কিন্তু আজ সে ব্যবস্থা না দেখিয়া বলিলাম, "তুমি খাবে না ?"

বলিল, "না, এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল।"

কথাটা শুনিবামাত্র যে ঘৃণা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল সহসা সেই ঘৃণা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তবুও সে ভাব গোপন রাখিয়া বলিলাম, "কোথায় নেমন্তন্ন ছিল ?"

জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "ছিল এক জায়গায়—"

বলিলাম, "শুনিই না কোথায় ? বলতে আপত্তি আছে ?"

জামাটা আলনায় রাখিতে রাখিতে বলিল, "তা একটু আছে বৈকি।"

একবার মনে হইল যে বলি, "লুকানোর চেষ্টা বৃথা আমি সবই জানি।" কিন্তু তাহা আর বলিলাম না।

বিকাশ বলিল, "বল্লাম না বলে রাগ কর্লে নাকি ?"

বলিলাম, "না আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?" কথাটাকে পরিহাস মনে করিয়া বলিল, "তাই নাকি। তা বেশ বেশ। কিন্তু জানলে কি করে আমার কপালে লেখা আছে নাকি ?"

আমার এইসব রসিকতা মোটেই ভাল লাগিল না। বলিলাম, "না, কপালে কিছুই লেখা থাকে না। তুমি রাণীচকে গিয়েছিলে।" ভাবিয়াছিলাম কথাটা শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহার বদলে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হুঁ, তারপর ?"

এইবার আর রাগ চাপিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, "তার পরের কথাও শুনতে চাও তুমি ? ছিঃ ছিঃ, বিকাশ তুমি এত নীচ আমি জানতাম না ?"

এবারও ভাবিয়াছিলাম যে সে আমার কথাটা শুনিয়া হয়ত,

লজ্জিত হইবে, হয়ত আমায় অন্য কিছু বলিবে। কিন্তু সে সব কিছু না বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, "বাঃ বাঃ তুমি যে রীতিমত রেগে গেছ মাষ্টার?" বলিয়া পরক্ষণেই গলার স্বর নীচু করিয়া বলিল, "তুমি এ চাকরী ছেড়ে পুলিশে চাকরী নাও মাষ্টার, উন্নতি কর্বে।"

তাহার পরিহাস অসহ্য বোধ হইল। বলিলাম, "আমার কিসে কি হবে না হবে সে বিষয়ে তোমার পরামর্শ না নিলেও আমার চলবে—কিন্তু—।"

বাধা দিয়া বিকাশ বলিল, "আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এক সঙ্গে এতগুলো কথা বল না, বুঝতে পারব না। কি বলতে চাও আস্তে আস্তে বল।"

সে যে আমার রাগটুকু গ্রাহ্যও করিল না এবং আমার ঘৃণামিশ্রিত কটূক্তিকে আমলও দিল না, এই কথাটা বুঝিতে পারিয়া ঘর হইতে চলিয়া আসিবার জন্য পা বাড়াইতেই সে সহসা আমার হাতখানা ধরিয়া বলিল, "আরে চল্লে যে, বস বস, ব্যাপারটা কি শুনি তোমার কাছ থেকে।"

তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, "ব্যাপার যে কি তাত তুমি নিজেই জান, আর রসিকতা করে লাভ কি?"

বলিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। উত্তেজনার মাথায় খেয়াল ছিল না যে তাহার উপর অতখানি রাগ করিবার অধিকার ও আমার ছিল না। ঘরে আসিয়া সহসা যেন সেই কথাটাই মনে হইয়া গেল। ভাবিলাম একটা পরিণত বয়সের মানুষ যদি স্বেচ্ছায় নিজের উপার্জনের টাকায় যথেচ্ছাচারিতা করিয়া বেড়ায় সেইজন্য তাহাকে নিষেধ করিবার অথবা তাহার

উপর রাগ করিবার কি অধিকার আমার আছে? কিন্তু আসল কথাটা এই যে মনের মধ্যে তাহার প্রতি যে প্রীতির বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই মূলে সে যে আজ নিজের অজ্ঞাতসারে আঘাত করিয়া আমায় বিচলিত করিয়াছে এই কথাটা মনে করিয়াই অতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এবং সেও যে আমায় মনে মনে ভালবাসে একথাটাও কেমন করিয়া জানি না বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার হাতটা সজোরে সরাইয়া চলিয়া আসিবার সময়ে আমার ক্ষুব্ধ চিত্তের অভিমানাহত বেদনাবোধের কথা সে যে জানিতেও পারিল না সেই কথাটাই মনে করিয়া ব্যথিত হইলাম বেশী। কিন্তু ফিরিয়া গিয়া ক্ষমা চাহিবার মত হীনতা স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করিলাম। এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন চিন্তা কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনটা অধিকার করিয়া বসিল তাহা এই যে বিকাশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আত্মীয়-স্বজনবিহীন এই বিদেশে একা থাকিবার মত মনের জোর আমার নাই। বিশেষতঃ কারখানা জীবনের উদ্দাম গতিবেগের মধ্যে তাহার বলিষ্ঠ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইলে যে কি অবস্থা হইবে সে কথা ভাবিয়া একটা অপরিচিত আশঙ্কায় মনটা অবশ হইয়া গেল। এবং অন্যান্য সব চিন্তা ছাড়িয়া এই শেষের চিন্তাটাই বিশেষ করিয়া আমায় দুর্বল করিয়া দিল। শেষ পর্যন্ত ভাবিয়া ঠিক করিলাম যে, কাল কোন উপায়ে তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া নিজের মাত্রাহীন নির্বুদ্ধিতার ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইব।

পরদিন সকালে তাহাকে একা পাইবার মত সুযোগ হইল না। আমার উঠিতে একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল। উঠিয়া দেখি বিকাশ নীচের উঠানে বড় বড় দুইটি মাছ এবং মেসের অন্যান্য লোকদের লইয়া রন্ধন কার্যের জটিল গবেষণায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেসের যাবতীয় ব্যাপারের

তদারকের ভার ছিল তাহার উপর। খাওয়া শেষ করিয়া যে যাহার কাজে চলিয়া যাইবার পর আমি জামা কাপড় ছাড়িয়া কাজে বাহির হইব এমন সময় আমার নামে একটা টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। টেলিগ্রাম পড়িয়া সহসা যেন মাথা ঘুরিয়া গেল। মায়ের আশঙ্কাজনক অসুস্থতার সংবাদ জানাইয়া ছোটভাই আমায় যাইবার জন্য জরুরী অনুরোধ জানাইয়াছে। মায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া যতখানি বিচলিত হইলাম, তাহা অপেক্ষা বিচলিত হইলাম বাড়ী যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের পথে বাধার কথা স্মরণ করিয়া। মাসের ২০ তারিখ হইতে চলিল। মাহিনা যা পাইয়াছিলাম তাহার মোটা অংশটা মনিঅর্ডার করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। যেটুকু হাতে ছিল তাহাতে কোনরকমে মাসের শেষ কটা দিন চলিতে পারে। কিন্তু শূন্যহাতে অসুস্থ মায়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়ানর কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলাম। অবিলম্বে কিছু টাকা না যোগাড় করিলে হয়ত কলিকাতা যাওয়াই হইবে না এবং আমার অবর্ত্তমানে যদি মায়ের মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না। কিন্তু কি করিব কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া মনে মনে অধিকতর অশান্ত হইয়া উঠিলাম। মাসের শেষ সপ্তাহে ফ্যাক্টরীর লোকে যে কেউ টাকা ধার দিবে না তাহা নিঃসংশয়ে জানিতাম। কারণ মাসের শেষে অধিকাংশ চাকুরীজীবির মত ফ্যাক্টরীর লোকদেরও টাকা ধার দেওয়া অপেক্ষা টাকা ধার নেওয়ার প্রতিই আগ্রহ থাকিত বেশী। টাকা চাহিবার মত দুইটি জায়গা আমার আছে। এক বৌদির কাছে চাওয়া যায় অথবা বিকাশের কাছে। কিন্তু অসুস্থতার মধ্যেও সনির্বন্ধ স্নেহের অনুরোধ এড়াইয়া যাঁহার সেবা লইতে অস্বীকার করিয়াছি, অর্থের অভাব জানাইয়া তাঁহার কাছে হাত পাতিতে সত্যই লজ্জা বোধ করিলাম। আর গতক

ঘটনার পর বিকাশের কাছে টাকা চাওয়া যেন কঠিন বলিয়া মনে হইল! হয়ত আমার এই অদ্ভুত আচরণের মূলে কোন যুক্তি নাই। কিন্তু তবুও তাহাদের কাছে টাকা চাহিবার কথা ভাবিয়া যথেষ্ট কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। অথচ পীড়িতা মায়ের মুখখানা মনে পড়িয়া নিদারুণ ক্ষোভে ও বেদনায় মনের মধ্যটায় মোচড় দিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত কারখানায় গিয়া ছুটির ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কাছের একটি মুদির দোকানে আমার ঘড়ি ও আংটি মেসের চাকর মারফৎ গোটা ৭০ টাকায় বিক্রী করিয়া সেইদিনই দুপুরের গাড়ীতে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। টাকা যোগাড় করিলাম বটে কিন্তু যে জিনিষ দুইটি বিক্রি করিলাম সেই দুইটিই আমার অতি প্রিয় সামগ্রী। সৌখীন জিনিষ বলিয়া নয়। স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া। ঘড়িটি আমায় পৈতার সময় বাবা দিয়াছিলেন এবং আংটিটি মায়ের দেওয়া। তাই এই দুইটি জিনিষেব বদলে টাকা যোগাড় করিতে হইল বলিয়া মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ জাগিয়া উঠিল। দারিদ্র্যের সহিত সম্যক পরিচয় কোনদিনই ছিল না, অর্থাভাবের এমন কঠিন রূপ কখনও দেখি নাই। তাই অপরিচিত দারিদ্র্যের আঘাতে যখন প্রিয়জনের স্মৃতিচিহ্নের পরিবর্ত্তে টাকা যোগাড় করিতে হইল তখন দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইল। এমন হীনতাও মানুষকে স্বীকার করিতে হয়? এবং সেই মুহূর্ত্তে সকল কথা ভুলিয়া কি করিয়া এই দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি ৮টা নাগাদ বাড়ীতে পৌছিলাম। পাড়ার ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার মধ্যে বুঝিলাম যে তিনি বিশেষ ভরসা দিতে পারেন না। এবং প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা ঔষধ দেওয়াই যে সহজ সে কথাটা জানাইয়া শেষ পর্যন্ত ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপনা

করিবার সুযুক্তি দিয়া ফি লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া বাসার চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মায়ের অসুখ হইয়াছে আজ চারদিন। এবং এই চারদিনের মধ্যে রান্না খাওয়ার যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। ভাই বোন মিলিয়া আমরা চারজন। ছোট দুটি বোনের একটির বয়স বছর ১৩ অন্যটির ১১। ছোট ভাইটির বয়স সবে ১৪ পার হইয়াছে। তাহারা তিনজনে মিলিয়া এই চারদিনে কি যে রাঁধিয়াছে জানি না। কিন্তু তাহাদের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম যে এই কয়দিনে খাওয়া বা বিশ্রাম কোনটাই ঠিকমত হয় নাই। দুই বোন ইলা ও বেলার মধ্যে ইলা বড়। মায়ের সঙ্গে থাকিয়া অল্পবিস্তর যাহা রাঁধিতে শিখিয়াছিল তাহাই রাঁধিয়াছে। শুনিলাম প্রথম দিনই ভাতের ফ্যান গালিবার সময় ডান হাতটা বেশ একটু পোড়াইয়াছে। কিন্তু তবুও কোন অনুযোগ নাই। এবং তাহার শিশুমুখের সহজ হাসিটুকু যেন আমার সমস্ত অন্তরটাকে মথিত করিয়া দিল। অভাবের সংসারে এই কষ্টটুকু স্বীকার করা যে তাহার উচিত তাহা যেন ঐ ছোট মেয়েটাও কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। তাই নিজের শারীরিক অসুবিধার কথা জানাইতে বোধকরি তাহারও সঙ্কোচ হইল; এবং সেই জন্যই সে ঐ ছদ্ম হাসিটুকু লইয়া আমায় প্রণাম করিয়া পাকা গিন্নির মতই জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শরীর ভাল আছে ত দাদা?" প্রত্যুত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া তাহাদের দুইজনকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ছোটভাই তখন মায়ের মাথার কাছে বসিয়া আছে। প্রবল জ্বরে মা তখন অচৈতন্য। আমার আসার কথা জানিতেও পারিলেন না।

পরদিন সকালবেলা মায়ের জ্ঞান একবার ফিরিয়া আসিল। আমায়

দেখিয়া অপরিসীম স্নেহে কম্পিত হস্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া কি যে বলিলেন জানি না, শুধু তাঁহার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে ক্ষণকালের জন্য একটা আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখ দুইটি হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই আবার জ্ঞান হারাইলেন। দুপুরবেলা ক্লান্ত দেহে ঘরের মেঝেয় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ ইলার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বলিল, "তোমার নামে মনিঅর্ডার এসেছে।"

তন্দ্রাজড়িত চোখে বিস্ময় মিশ্রিত সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "আমার নামে মনিঅর্ডার? কে পাঠাল?"

ইলা বলিল, "তা জানিনে, পিওন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

ডাকবিভাগের এমন ভুল সচরাচর হয় না। আমায় টাকা পাঠাইবার মানুষ সংসারে কোথাও আছে তাহা যেন সহসা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। তাই অনাসক্ত পদে উঠিয়া গিয়া পিওনকে জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে মাণি অর্ডার ফর্মটা বাড়াইয়া দিল। দেখি টেলিগ্রাফ-মাণি-অর্ডারে বিকাশ দুইশত টাকা পাঠাইয়াছে। একটা জরুরী তার ও করিয়াছে। তাহাতে মায়ের সংবাদ জানাইবার অনুরোধ করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে আরও টাকা চাহিতে যেন কুণ্ঠিত না হই এমন ইঙ্গিতও করিয়াছে। একটা অব্যক্ত আনন্দের আবেগে সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে টাকাটা নিয়া ভিতরে আসিলাম। শুনিয়াছি দুঃখের দিনে মানুষের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটার সত্যাসত্য বিচার করিবার মত সুযোগ কখনও হয় নাই। বিকাশ যে টাকা পাঠাইতে পারে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। টাকার প্রয়োজন সে সময় সত্যই খুব বেশী ছিল। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে টাকাটা পাইয়া অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় সমস্ত

মনটা ভরিয়া উঠিল। আসিবার আগের দিন রাত্রে যে মানুষটির প্রতি অকারণ রূঢ় ব্যবহার করিয়া অপমান করিয়াছি, আসিবার দিনেও অর্থহীন অন্ধ অভিমানেব বশে তাহার কাছে টাকা চাহিতে পারি নাই। অথচ খবর পাওয়া মাত্রই সে আমায় টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। এই কথাটা মনে হইতেই নিজের নিদারুণ নির্বুদ্ধিতার জন্য যেমন অশেষ লজ্জিত হইলাম তেমনি সেই প্রবাসী মানুষটির উদার অন্তরের মহত্বের পরিচয় পাইয়া বারবার তাহার চরণোদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া মনে মনে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এবং অকস্মাৎ যেন মনে হইল যে মানুষটার বাহ্য আচরণ যতই দৃষ্টিকটু হউক না কেন অন্তরের মধ্যে তাহার মহিমা সত্যিই বিস্ময়কর। এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার গণিকার ঘরে প্রবেশ করা প্রভৃতি সামান্য ঘটনাগুলি যেন এক মুহূর্ত্তেই মিথ্যায় পর্যবসিত হইল। মনে হইল সে সত্যই এসবের অনেক উপরে এবং বাস্তবিক সে যে কোন ধরণের মানুষ তাহাও যে আদৌ বুঝিতে পারি নাই, সেই কথাটাই সবচেয়ে বেশী মনে হইল তাহার পাঠান টাকাটা পাইয়া। মানুষটাকে যতই দেখিতে লাগিলাম ততই যেন বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। এবং কয়েকটি ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার অনাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ সত্যই আমায় মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। অন্ধ মূঢ়তার অর্থহীন দম্ভে যে মানুষটিকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই, দুঃখের দিনে তাহার আন্তরিক স্নেহস্পর্শটুকু লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। এবং সেই দিন যেন নূতন করিয়া বুঝিলাম যে আমাদের সহজাত সংস্কারাচ্ছন্ন বিচার বুদ্ধির পরিমাপে সব মানুষকে বিচার করিতে যাওয়া কত বড় ভুল। বাঁধাধরা নিয়মকানুনের দ্বারা কোন মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি বা আচার ব্যবহারের ভালমন্দ নির্ণয় করিয়া অনেক সময় তাহার

প্রতি কঠিন অবিচার করিয়া বসি। যে কোন একটি পরিচয়ই যে কাহারও সবখানি নয় এই সহজ সত্যটিভুলিয়া যাই। একটা মানুষের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে বসিয়া সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ইতিহাস হইতে নজির তুলিয়া অন্যের সহিত তাহাকে মিলাইয়া দেখি এবং তাহার দ্বারাই তাহার মহত্ত্ব বা হীনতা নির্ধারণ করিয়া মানুষটাকে বুঝিয়াছি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। ভুলিয়া যাই যে প্রতি মানুষের অন্তরই অনন্ত বিস্ময়ের রাজ্য, প্রতি মানুষের মধ্যেই স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম রহিয়াছে। এবং নিজের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ, যাহার নিকট নিজের বেদনা গোপন রাখিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম আজ তাহার প্রেরিত টাকাগুলি গ্রহণ করিবার সময় মনে মনে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্তর্যামীর উদ্দেশে বলিলাম, "আমার অপরাধের শাস্তি আমাকেই চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছ। এমনটি না হইলে হয়ত আমার অহঙ্কারের সীমা থাকিত না।"

সেইদিন বিকাল বেলা শেষবারের মত মায়ের জ্ঞান ফিরিয়াছিল। এবং জ্বর কিছুটা কমিয়া যাওয়ায় অসীম আশায় বুক বাঁধিয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা এযাত্রা বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়া আসার পর মা আমায় কাছে ডাকিয়া যে কথাগুলি বলিলেন তাহাতে বেশ বুঝিলাম যে তিনি নিজে ত আরোগ্যের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং আমাদেরও করিতে হইবে। ছোট ভাই-বোনগুলিকে দেখাইয়া তাহাদের সংশয়-সংকুল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া আমার উপরই তাহাদের ভার দিয়া বারবার এই আক্ষেপই জানাইলেন যে এই কয়টি অনভিজ্ঞ শিশুদের ভার আরেকটি অনভিজ্ঞ যুবকের উপর ফেলিয়া দিয়া অসময়ে বিদায় গ্রহণ করিতে তাঁহার কোন ইচ্ছাই নাই। এমন কি মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠবাসের চরম আশ্বাসটুকুও যেন তাঁহার নিজের মনোমত

হয় নাই। কিন্তু সংসারে যাহা হইবার নয় সচরাচর তাহাই ঘটিয়া থাকে। এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় পুনরায় জ্ঞান হারাইয়া পরদিন সমস্ত দিনটা অচৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া পরের দিন সকালবেলা মা মারা গেলেন। এবং সেই মুহূর্তে সহসা যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারের প্রকৃত রূপটি দেখিতে পাইলাম। মাথার উপর অভিভাবক থাকিবার সৌভাগ্যটা যে কতখানি সৌভাগ্য তাহা যতদিন কেহ অভিভাবক ছিলেন ততদিন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুর চকিত স্পর্শ একবার যেমন সংসারের যাবতীয় ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিয়াছিল আবার একবার তেমনি করিয়া আমাদের ছোট্ট সংসারটি মৃত্যুর কঠিন আঘাতে কাঁপিয়া উঠিল। এবং আমি ক্রন্দনরত ছোট ভাইবোনদের মধ্যে অক্ষম আক্রোশে উধ্বর্মুখে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। কাঁদিবার মত শক্তিটুকুও যেন আর রহিল না।

ইহার পরের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব না। ছোটভাই অজয় সামনের বারে ম্যাট্রিক দিবে, ইলা ক্লাশ নাইনের ছাত্রী। অতএব দুই জনের দুইটা হোষ্টেলে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেলাকে মেজ মামার কাছে রাখিয়া অভিভাবকের দায়িত্ব সম্পন্ন করিয়া কয়েকদিন পরে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। মায়ের মৃত্যু যে আমায় কোথায় এবং কতখানি আঘাত করিয়াছিল তাহা সহসা বুঝাইয়া বলা কঠিন। শুধু অকস্মাৎ কঠিন আঘাতে মানুষের চিন্তাশক্তি বা কর্মক্ষমতা যেমন কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, মায়ের মৃত্যুও আমায় তেমনি করিয়া নির্বাক হতবাস্তব-চেতন করিয়া দিল। এবং সত্যলব্ধ দায়িত্বভার সযত্নে রক্ষা করিবার মানসে নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভুলিয়া ভাই বোনদের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়িতে লাগিল।

প্রতি মানুষের জীবনে এক একটি দুর্বল মুহূর্ত্ত আসে যখন সে কোন একটা কিছু আশ্রয় করিয়া বাঁচিতে চায়। এই মুহূর্ত্তগুলির স্থায়িত্ব যেমন ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে, তেমনি প্রার্থিত আশ্রয়ের সম্বন্ধে ধারণারও পার্থক্য ঘটে। মায়ের মৃত্যুর পর আমার জীবনেও সেই রকম একটি দুর্বল মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সত্যলব্ধ আঘাতের পরিমাণ চিন্তা করিতে না পারিয়া অসহায় অন্তরের মধ্যে একটি কথা কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া আলোড়িত হইতে লাগিল তাহা এই যে, এই মুহূর্ত্তে কোন একটা মানুষ পাইলে তাহার উপরে নিজের মনের গুরুভার চাপাইয়া দিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে শান্তি পাইতাম। আমার এই মনোবৃত্তিকে কেহ দুর্বল চিত্তের লক্ষণ বলিবেন, কেহ বা বলিবেন দায়িত্ব বহনের অক্ষমতা। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন না কেন আমি নিশ্চিত জানি যে এমন কোন মানুষ আজও জন্মগ্রহণ করেন নাই যাহার জীবনে এমনি একটি সংশয়ক্ষুব্ধ দুর্বল মুহূর্ত্ত না আসিয়াছে। আবার অনেক হয়ত বলিবেন, "মায়ের মৃত্যু সংসারে কিছু নূতন নয়, এমন ঘটনা প্রতিদিনই ঘটিতেছে। ইহাতে এত বিচলিত হইবারই বা আছে কি?" অথবা "তোমার মনে এমন কি দুশ্চিন্তার গুরুভার জমিয়া উঠিয়াছে যাহা বহন করিবার জন্য অন্যের প্রয়োজন হইল?" ইহার উত্তরে হয়ত কিছু বলিবার নাই। কারণ সুস্থ চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সত্যই কোন অসহনীয় গুরুভারের বোঝা আমার ছিল না। এবং শোকের প্রথম আঘাত আমার অনভিজ্ঞ চিত্তকে যতটা আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সে আঘাত বিস্মৃতও হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম মুহূর্ত্তে সেই আঘাত এতই অসহ্য বোধ হইয়াছিল যে ভাবিয়াছিলাম সে আঘাতের বেদনা

বোধ হয় ভুলিতে পারিব না। এবং সেই জন্যই সেই মুহূর্তে একজনের উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মনটা কিছুটা জ্ঞাতসারে কিছুটা অজ্ঞাতসারে বিকাশের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার প্রতি আকর্ষণের কোন বিশেষ কারণও হয়ত দেখাইতে পারিব না। কেবল এইটুকুই বলিতে পারি যে জীবনের পথে এমন এক আধটা মানুষের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয় ঘটে, যাহাকে এক মুহূর্তেই নিজের অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে ভিতরে বাহিরে কোথাও দ্বিধা থাকেনা, এমনিই হয়। এবং সেই অজ্ঞাত কারণের জন্যই বিকাশের সাহচর্য আমার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠিল।

মায়ের মৃত্যুর পর কলিকাতা হইতে যেদিন চলিয়া আসি সেই দিনই বিকাশের সঙ্গে দেখা। নিজের ঘরে বসিয়া কি যেন একটা করিতেছিল। আমায় ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া ব্যগ্র বাহু মেলিয়া আমার দুইহাত ধরিয়া সযত্নে নিজের বিছানার উপর বসাইল। তাহার সেই সময়ের আচরণ যদি অপরিচিত কোন মানুষ দেখিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভাবিত যে দীর্ঘদিন পরে বড় ভাইয়ের কাছে ছোটভাই ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং বড় ভাইটি তাহাকেই হাত বাড়াইয়া সস্নেহে আহ্বান জানাইতেছে। আসিবার সময় সমস্ত পথ এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি যে বিকাশকে গিয়া কি বলিব? যে পরিস্থিতির মধ্যে তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহার কথা এত শীঘ্র কাহারও ভুলিবার কথা নয়। নিজের অর্থহীন রূঢ় আচরণের জন্য অন্তরের মধ্যে গোপনে তাহার নিকট অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি সে কথা সত্য। মায়ের অসুখের সময় তাহার প্রেরিত মানিঅর্ডারই তাহার অন্তরের বিশালতার ইঙ্গিত দিয়াছে। কিন্তু অনুতপ্ত অন্তরের সঙ্কোচ কাটাইয়া তাহার কাছে কি ভাবে কথা আরম্ভ করা

যায় তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। শুধু কতকগুলা অসংলগ্ন চিন্তার জালে নিজেকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া তাহার নীরব অন্তরের মর্মস্পর্শী সমবেদনার গুরুত্ব বুঝিতে দেরী হইল না। আমায় দেখিয়াই সে যেভাবে উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিল, তাহাতে এইটুকু বুঝিলাম যে মানুষের অন্তরের অব্যক্ত বেদনার দুঃসহ আবেগ অনুভব করিতে এই মানুষটির বেশী দেরী লাগে না। অনেকেই হয়ত ভাবিবেন যে প্রচুর শব্দ সৃষ্টি করিয়া সে আমায় সান্ত্বনা দিল। অথবা ঐ জাতীয় কোন অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া মোহমুদ্গার আওড়াইয়া মানুষের জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বহু পুরাতন কথাবার্ত্তার পুনরুক্তি করিয়া আমায় বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে সবের ধার দিয়াও সে গেল না। কেবল আমার শীর্ণ হাতখানাকে তাহার রুক্ষ কর্কশ বলিষ্ঠ হাতখানার মধ্যে লইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। শুধু তাহার চোখে সকরুণ বিষণ্ণতার অস্পষ্ট আভাস দেখিয়া চকিতের জন্য মনে হইল যেন আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতেছি। মানুষের চোখে সম্মোহনী দৃষ্টি আছে কিনা জানি না। অথবা মানুষের মনে সম্মোহনী শক্তি আছে কিনা জানিনা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সহসা যেন আবিষ্কার করিলাম যে তাহার ছোট খাট কয়েকটা প্রশ্নের জবাবে আমি আমার পারিবারিক জীবনের নানা ঘটনার বিবরণ দিয়া চলিয়াছি। এবং বেশ কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে এইভাবে কথা বলিবার পর যখন কথা শেষ করিলাম তখন দেখি সে আমার মুখের পানে নিষ্পলক নেত্রে বিমুগ্ধ ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার মনের সমবেদনশীলতার পরিচয় পাইয়া মনে মনে বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার আবেগে মাথাটা আপনিই নত হইয়া গেল। অথচ সে আমায় বিশেষ কিছুই বলে নাই। ললাটলিপির অদৃশ্য

লিখন পড়িবার মত মনও তাহার ছিল না, অথবা বিধাতার বিচার-বিহীন নিষ্ঠুরতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমার সঞ্চিত বেদনার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াও কিছু বলে নাই। যে প্রশ্নগুলি সে করিল তাহা নিতান্তই সাধারণ। এবং তাহার মধ্য হইতে কোন গুপ্ত কাহিনী বাহির করিবার কোন ইচ্ছাও তাহার হয় নাই। শুধু কথাচ্ছলে জানাইয়া দিল, যে ঘড়ি এবং আংটি বিক্রয় করিয়া বাড়ী যাইবার টাকা যোগাড় করিয়াছিলাম, সেই ঘড়ি এবং আংটি সে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু এছাড়া অন্য কিছু বিশেষ বলে নাই। এমন কি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী একটা সান্ত্বনাবাণীও উচ্চারণ করিল না। এইটাই যেন আমার বেশী ভাল লাগিল। কারণ সে সময় মনের অবস্থা সান্ত্বনাবাণী শুনিবার অনুকূল ছিল না। বরং মানুষের অযাচিত সান্ত্বনা দিবার প্রচেষ্টার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদের সুর ধ্বনিত হইত বলিয়া মনে হইত। ভাবিতাম যে, সান্ত্বনা দিবার প্রচেষ্টার মধ্যে যে মনোভাবটি গোপন রহিয়া গেল তাহা এই যে আমার যাহা হইয়াছে হউক কিন্তু সান্ত্বনাদানকারীর নিজের জীবনে যেন এমনটি না ঘটে। তাই বিকাশ যখন সান্ত্বনা দিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া শুধু মাত্র স্বল্প কথায় ভাইবোনগুলির খবরা খবর লইয়া অন্য কথা পাড়িল তখন মনে হইল বাঁচিয়া গেলাম। অনেকে হয়ত ইতিমধ্যেই আমার কথার মধ্যে স্ববিরোধী ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইয়া আমার অস্থিরতার সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক কথা কি, সত্য বটে যে সেই মুহূর্ত্তে এমন একটি মানুষের সঙ্গ কামনা করিয়াছিলাম যাহার স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া নিজের জীবনের গুরুভারের বোঝা কিছু লাঘব করিয়া লওয়া যায়। এবং বিকাশের কথাই সকলের আগে মনে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া আমার

সে মনোবৃত্তির বিকৃত অর্থ যেন কেহ না করেন। বিকাশের উপস্থিতিই আমার মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ফিরাইয়া আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নিজের কথাগুলি নিজের কাছে আবৃত্তি করিতে পারাই যেন আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাহার কাছেও বিশেষ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় একটা পরিপূর্ণ শান্তির আস্বাদ লাভ করিয়া নিজের মনের মধ্যেই একটা পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম এই ভাবিয়া যে যাক তাহা হইলে এমন একটা মানুষও আছে যাহার কাছে আমার বেদনার অল্পবিস্তর মূল্য আছে।

কয়েকদিন পরে একদিন কাজের অবসরে Mechanioal Foreman বিকাশ রায়ের ওয়ার্কসপে গিয়া বসিয়া আছি এমন সময় মিঃ ঘোষ আসিয়া হাজির। বলিলেন, "কিহে তোমরা যে আমার বাড়ীর দিকে যাওই না। ব্যাপারটা কি? আমার সঙ্গে কি অসহযোগ সুরু কর্লে নাকি?" বিকাশ কয়েকটা যন্ত্রপাতি লইয়া কি যেন করিতেছিল, হাসিয়া বলিল, "সময় করে উঠতে পারিনি কয়েকটা কাজ ছিল। আজ যাব অখন"—বিকাশের উত্তরটা কিন্তু আমার ভাল লাগে নাই। তাহার কথা শুনিয়া হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় তাহার রাণীচক যাওয়ার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। এবং যদিও কয়েকদিন আগে তাহার সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তবুও মিঃ ঘোষের কথার জবাবে বিকাশের স্পষ্ট উত্তরটুকু শুনিয়া চকিতে মনে হইল এমনি করিয়া আমার কাছেও সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। এবং তাহার এই অকপট মিথ্যা কথার জন্যই তাহাকে কেমন যেন একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছিলাম। মিঃ ঘোষের কথার উত্তরে তাহার সেই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি শুনিয়া সদ্যবিস্মৃত ঘৃণাটা যেন একটু

জাগিয়া উঠিল। কি অদ্ভুত মানুষের মন! বিকাশকে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তোমার ব্যাপার কি? তুমি ত বিকাশের মত তত কাজের লোক নও?" বৌদির দেখাদেখি মিঃ ঘোষও আমায় তুমি বলিতে সুরু করিয়াছিলেন। বলিলাম, "না। মানে আমার যদিও কোন কাজ ছিল না, তবুও খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামের জন্যে যাওয়া হয় নি?" মিঃ ঘোষ আমার কথাটা শুনিয়া রহস্য করিয়া বিকাশের পানে আড় চোখে চাহিয়া বলিলেন, "আমারই হয়েছে জ্বালা। বিয়ে কর্লাম যাকে তিনি আমাকে নিয়ে খুসী নন। কোথায় কার সঙ্গে দেওর-বৌদি সম্পর্ক পাতিয়েছেন, সেই দেওরের দেখা না পেলে তাঁর ভাত হজম হয়না। অথচ দেওরটির ফুরসৎও নেই বৌদির খবর নেবার। সে বেঁচে আছে কি—?"

হাতের কাজ ফেলিয়া বিকাশ চকিত হইয়া বলিল, "সেকি—কি হয়েছে বৌদির?"

মিঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "না তোমার আশীর্বাদে তার হয়নি কিছুই—কিন্তু হলে বোধ করি ডেকে পাঠাতে হত। একবার গিয়ে খোঁজ নেওয়াটাও দরকার মনে কর না none of you—তোমরা দুজনেই সমান।"

বৌদির অসুখের কথায় বিকাশের চমকানিটুকু আমাদের কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। মিঃ ঘোষ কিভাবে নিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু আমার চোখে ভারী অদ্ভুত ঠেকিল বিকাশের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ও ব্যাকুলতা।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "By the way—বিকাশ তোমার সেই Petition sanction হয়েছে। স্কুলটা আবার খুলতে পারে।"

এবার বিস্মিত হইবার পালা আমার। মিঃ ঘোষের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নকাতর চোখে নির্বোধের দৃষ্টি লইয়া একবার

মিঃ ঘোষ ও একবার বিকাশের মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, "মানে ? বিকাশের আবার ইস্কুল কি ?"

কথায় কথায় অট্টহাস্য করিয়া ওঠা মিঃ ঘোষের একটি বদঅভ্যাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জান না বুঝি ? বিকাশের ধারণা যে কারখানার আবহাওয়ায় সাধারণ শিশুরা কোন শিক্ষাই পায় না। ফলে দেশের দুর্গতি ক্রমশঃই বাড়ছে। এবং দেশের এই নিদারুণ দুর্দ্দশা মোচন করার জন্য বিকাশ একটা নাইট স্কুল খুলেছিল, যার উদ্দেশ্য হল কারখানার workersদের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলা—মানে মানুষ করা। এবং ওর ধারণা যে ওর এই হাস্যকর প্রচেষ্টার দ্বারাই ও দেশের সব দুঃখ কষ্ট কমিয়ে দেবে—। ছেলে যে কত মানুষ হবে তা আমরাই জানি—শুধু কতকগুলা টাকার অপব্যয় করা।"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "টাকার অপব্যয়টা গায়ে বাজল। অথচ মদের পেছনেই যে আমার কত টাকা খরচ হয় তাত আপনি জানেন।"

মিঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "তাতে ত একটা কাজ হয়। বুঝি যে তুমি নিজে মদটা খাও। কিন্তু এযে শুধু পণ্ডশ্রম।"

তাহার কথার ভঙ্গীতে বেশ বোঝা গেল যে তিনি কথাগুলি যত সহজে বলিতেছেন, নিজের অন্তরের মধ্যে কথাগুলিকে ঠিক ততখানি সত্য বলিয়া মানেন না। বিকাশ ও যে তাহা বোঝে নাই তাহা নহে, কিন্তু তবুও বলিল, "এমন কথা বলবেন না। শুধুমাত্র জন্মের জন্যই—"

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন, "ব্যস ব্যস আর দরকার নেই। ওসব কথা তোমার মুখে শুনে শুনে কানে কড়া পড়ে গেছে। ওসব পারত সত্যেনকে শুনিও—ও হয়ত খুসী হবে।"

কথাটা শুনিয়া বিকাশ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কাজে মন দিল। আমি শুধু নীরবে ভাবিতে লাগিলাম, 'এ কেমন করিয়া হয় ?' অর্থাৎ

এমন ঘটনাও যে ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞান কিছু ছিল না। বিকাশের ছোটখাট আচার ব্যবহারের মধ্যে, পরিচিত অপরিচিত সকলের প্রতি তাহার আন্তরিক প্রীতির আভাস সূচিত হইত, সে কথা কাহারও অজানা ছিল না। কিন্তু সেই মানুষটা যে আবার একটা স্কুল খুলিয়া কারখানার শ্রমিকদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে তাহা ভাবিতে পারি নাই। মিঃ ঘোষের কথায় বুঝিলাম স্কুলটা আগে ছিল কিন্তু কোন কারণবশতঃ সেটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এখন আবার সুরু হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কথাটা এমন কিছু অসম্ভব নয় এবং আশ্চর্য হইবার হয়ত ইহাতে বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু যে কারণে আশ্চর্য হইলাম, তাহা এই ভাবিয়া যে কোনদিন ঘূণাক্ষরেও মানুষটা জানায় নাই যে সে একটা স্কুল খুলিয়াছিল, অথবা অনিবার্য কারণবশতঃ সেটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য সে একটা দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। মিঃ ঘোষের মুখে কথাটা শুনিবার পর আগাগোড়া জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

মিঃ ঘোষ চলিয়া যাইবার পরই বিকাশকে বলিলাম, "ব্যাপার কি হে? স্কুল খুল্লে কবে? সেটা বন্ধই বা হয়ে গেল কেন? তুমি—"

বাধা দিয়া বলিল, "থাম থাম, ওসব কথা এখন আলোচনা করার সময় নয়—নিজের কাজ করগে ত বাপু—"

বলিয়া একরকম জোর করিয়াই আমায় ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। আমিও কোন কথা না বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম। এবং আসিবার সময় বলিলাম, "তাড়িয়ে দিলে বলেই যে চলে যাচ্ছি তা নয়, সব না শুনে ছাড়ছিনে।"

সেইদিন কারখানা হইতে ফিরিয়া বিকাশ কখন যে এক সময় বাহির হইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম হয়ত বা মিঃ ঘোষের বাড়ীতেই

গিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি মিঃ ঘোষের বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলাম। আমায় দেখিয়াই বৌদি বলিলেন, "কি গো, পথ ভুলে নাকি?"

হাসিয়া বলিলাম, "না ঠিক পথ ভুলে নয়। এসেছিলাম বিকাশের খোঁজে। বিকাশ আসেনি এখানে?"

বৌদি বলিলেন, "সে ত এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেল।"

হতাশকণ্ঠে বলিলাম, "কোথায় গেছে জানেন কি?"

বৌদি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বলে গেল রাণীচকে কি দরকার আছে সেইজন্য রাণীচকে যাচ্ছে।"

রাণীচকের উল্লেখ শুনিয়া চকিতে মনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সন্দেহ জাগিল। বলিলাম, "কি দরকার তা কিছু বলেছে?"

বৌদি কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, "কেন তোমায় কিছু বলেনি?"

বলিলাম, "কই না ত?"

বৌদি বলিলেন, "ওমা সে কি? আমায় বল্ল যে সত্যেন জানে যে রাণীচকে গেছি। এলে ওকে বসতে বলবেন।"

রাণীচকের কথাটা শুনিয়াই মনের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল। গত কয়েকদিনের আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া আগেকার ঘটনাগুলি ভুলিতে সুরু করিয়াছিলাম, এবং সেই সঙ্গে তাহাকেও মনে মনে ক্ষমা করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু বৌদির কথা শুনিয়া মনে হইল বিকাশের রাণীচকে যাওয়ার কারণ যে আমি জানি বিকাশ নিজেও সেটা জানে কিন্তু তবুও তাহাতে যে তাহার কিছুই আসে যায় না এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্যই সে বৌদিকে ঐ কথাটা বলিয়া গিয়াছে। তাহার এই নির্লজ্জতা কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

বৌদিকে বলিলাম, "রাণীচকে কেন গেল কিছু বলেছে ?"

বৌদি বলিলেন, "কিছু দরকার আছে নিশ্চয়ই।"

বলিলাম, "কিছু বলে গেছে কি ?"

বৌদি বলিলেন, "না সে রকম কথা কিছু বলেনি।"

"তবে কি করে বুঝলেন যে ওর কোন দরকার আছে ?"

বৌদি বলিলেন, "দরকার ছাড়াত সে কোন কাজ করে না তাই বল্লাম, ওকে ত জানি।"

বিকাশের উপর বৌদির এই অকপট বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'তাই বটে। দরকার যে কি তা আমিই জানি।' এবং বৌদির সরল বিশ্বাসে মনে মনে হাসিয়া ফেলিলাম। ভাবিলাম যদি তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলি, যদি তিনি জানিতে পারেন তাঁহার অশেষ বিশ্বাসের পাত্রটি কোন মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া রাণীচকে গিয়াছে তাহা হইলে হয়ত তিনি আর কখনও বিকাশের মুখও দেখিবেন না। কিন্তু কিছুই বলিলাম না। মনে হইল থাক না একজন যদি অন্ধ বিশ্বাস লইয়া থাকিতে চায় এবং থাকিয়া সুখী হয়, মিছামিছি সে বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া আমার লাভ কি ? অতএব বিকাশের সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। কিন্তু একটা কথা বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের ভিতর আলোড়িত হইতে লাগিল তাহা এই যে বিকাশের সম্বন্ধে সাধারণে যতটা উঁচু ধারণা পোষণ করে সে ততটার যোগ্য নয়।

রাত্রিবেলা খাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কি কারণে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই শুনিলাম বিকাশের ঘর হইতে ভায়োলিনের টুং টাং আওয়াজ আসিতেছে। বুঝিলাম বিকাশ ফিরিয়া আসিয়াছে। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণায় সন্তর্পণে বিছানা

ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম। বিকাশের দরজায় ধাক্কা দিব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় লক্ষ্য পড়িল জানালার একটা ফুটা দিয়া আলো আসিয়া পড়িতেছে। নিঃশব্দে জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া জানালার ফুটাটিতে চোখ রাখিয়া দেখি বিকাশ বিছানার উপর বসিয়া আছে। এবং খাটের পাশে ছোট টিপয়টিতে একটা অর্দ্ধশূন্য মদের বোতল রাখা রহিয়াছে। বিকাশের হাতেও একটা গ্লাস রহিয়াছে। সেটাও মদে ভর্ত্তি। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গেই গেলাসে চুমুক দিতেছে এবং একটা কিসের পানে নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া আছে। কিছুক্ষণ এই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় আঘাত করিতেই স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করিল, "কে মাষ্টার নাকি?" আজ তাহার মুখে মাষ্টার নামটি যেন মোটেই ভাল লাগিল না। তবুও বলিলাম, "হ্যাঁ, দরজাটা খুলবে নাকি?"

"Oh surely surely" বলিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল।

আমি ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। বলিলাম, "কতক্ষণ এলে?"

মদের গ্লাসটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "অনেকক্ষণ।"

আজ যেন প্রথম হইতেই তাহাকে আঘাত হানিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। তাই বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিলাম, "কি রকম কাটালে সন্ধ্যাটা?"

অন্যমনস্কের মত বলিল, "মন্দ নয়।" কথাটা বলিয়াই সে এমন গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া গেল যে সে নীরবতা ভঙ্গ করার মত সাহস হইল না।

কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, "আচ্ছা বিকাশ, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব, সত্যি উত্তর দেবে?"

হাতের নিঃশেষিত গেলাসটা আরেকবার পূর্ণ করিয়া লইয়া ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, "কি কথা ?"

বলিলাম, "বলছি, কিন্তু আগে বল সত্যি কথা বলবে ?"

তেমনি ধীরস্বরে বলিল, "চেষ্টা কর্তে পারি। কিন্তু কথাটা কি ?"

বেশ বুঝিলাম যে আমার প্রশ্ন যে কি তাহা তাহার বুঝিতে বাকী নাই। তবুও যেন প্রশ্নটাকে এড়াইতে পারিলে বাঁচিয়া যায় তেমনি ভাবেই বলিল, "কি জিজ্ঞেস কর্বে বলত ?"

একটা কঠিন উত্তর মুখের আগায় আসিয়া পড়িয়াছিল। তবু তাহা না বলিয়া বলিলাম, "বলছিলাম যে এসব করে লাভ কি ?"

একটু যেন বিস্ময়ের সুরে বলিল, "কিসের কথা বলছ ?"

বলিলাম, "কিসের আবার—রাণীচকের কথাই বলছি। আচ্ছা এতে তোমার কি লাভ বলত ? এরকম না করে তোমার একটা বিয়ে করা উচিত।"

একটু যেন সচকিত হইয়া বলিল, "বিয়ে। Impossible. কেন বলত ?"

বলিলাম, 'না, এমনি। মানে এমনি ভাবে রাণীচকে আর কতদিন যাতায়াত কর্বে ? জানা-জানি হয়ে গেলে শেষকালে একটা কেলেঙ্কারী ঘটবে তাই বলছিলাম—"

কথাটা শুনিয়া একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে আমার মুখের পানে চাহিল। এবং কি একটা কথা বলিতে গিয়াও যেন বলিতে পারিল-না। সে কিছু না বলিলেও আমি বুঝিতে পারিলাম সে কি বলিতে চায়। অর্থাৎ সে যে আমায় অবিবাহিত জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়া আমার অভিযোগের প্রতিবাদ

করিতে চায় সে কথাটা বুঝিতে পারিলাম। তাই বলিলাম, "জানি তুমি অনেক কিছুই বলতে পার—কিন্তু ?"

বাধা দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না আমি কিছুই বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে তুমি যা জেনেছ তার কিছুই সত্যি নয়।"

নিজের অপরাধ লঘু করিবার সপক্ষে তাহার এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া হাসি পাইল। সে যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান তাহা জানিতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং বাকচাতুর্যের দ্বারা সে যে আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না তাহাও জানিতাম। কারণ আমি যে স্বচক্ষে তাহাকে রাণীচকের গণিকার গৃহে ঢুকিতে দেখিয়াছি।

বলিলাম, "আমি যা জেনেছি তা যে মিথ্যা এমন প্রমাণ ও ত নেই।"

মদের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়া বোতল হইতে বাকী মদটা গেলাসে ঢালিয়া বলিল, "সে প্রমাণ ত তুমি চাওনি মাষ্টার ?"

এইবার তাহার কথার সুরে বিস্ময় জাগিল। বলিলাম, "প্রমাণ চাইলেই কি তুমি দিতে ?

বলিল, "সে পরের কথা। কিন্তু তুমিত প্রমাণ চাওনি কখনও ? যা দেখেছ তাই সত্যি বলে বিশ্বাস করে নিয়েছ। কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞেস করি কতটা তুমি দেখেছ বা জেনেছ কি জবাব দেবে ?"

বুঝিলাম আমার বিস্ময়ের সুযোগ লইয়া কথার পাকে আমায় এড়াইতে চায়। তাই সতর্ক হইয়া বলিলাম, "যেটুকু জেনেছি তাই যথেষ্ট। সন্ধ্যার সময় বেশ্যা বাড়ীতে গিয়া নিশ্চয় কেউ ভাগবত পাঠ করে না।"

কথাটা শুনিয়া সে যেন গভীর লজ্জায় মুখ নীচু করিল। তাহার জীবনের গোপন অংশ যে তাহার অসতর্কতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে ইহার জন্যই যে এই লজ্জা তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না।

বলিলাম, "কিহে, চুপ করে রইলে যে ; কথাটা ঠিক কিনা বল ?"

সহসা জোড় হস্তে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "মাষ্টার please stop it." তাহার কণ্ঠস্বরে অসহায় আকুলতার সুস্পষ্ট সুর আমায় নির্বাক করিয়া দিল। এতখানি অসহায় করুণ চাহনী বিকাশের মুখে কেহ কখনও বোধকরি দেখে নাই, আমিত নয়ই। এবং আমার সত্যকথাগুলো যে তাহার প্রতিবাদ করিবার শেষ শক্তিটুকুও লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া একটা পৈশাচিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তাহাকে আঘাত করিবার এতবড় সুযোগ আর কখনও পাই নাই। কিন্তু তাহার আহত হৃদয় মথিত করিয়া যখন তীব্র ব্যথার আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল তখন আর আঘাত করিতে কেমন যেন দ্বিধা বোধ হইল।

বিকাশ বলিল, "দেখ মাষ্টার একথা যে তোমায় বলতে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু সত্যিই কি শুনতে চাও কেন রাণীচক যাই ?"

নিজের অপরাধ গোপন করিবার এই পৌনঃপুনিক চেষ্টা আমার কিছুমাত্র ভাল লাগে নাই। একটু আগেই তাহার প্রতি কিছুটা সহানুভূতির সঞ্চার হইতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনিয়া বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিলাম, "শুনতে আপত্তি নেই যদি সতী বেশ্যার গল্প সুরু না কর।"

আমার কথাটা শুনিয়াই একটা অব্যক্ত বেদনার দুঃসহ আবেগে তাহার সমস্ত মুখটা একমুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইলাম। মনে হইল এমন করিয়া বলা হয়ত ঠিক হয় নাই। কারণ কি জানি যদি সে সহসা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তেমন কিছুই করিল না ধীরে ধীরে নিজের দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। এবং কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি যা জেনেছ সব ভুল মাষ্টার, সব

ভুল। রাণীচকে আমি যেখানে গিয়েছিলাম সেটা সত্যি খারাপ জায়গা কিন্তু যে জন্য গিয়েছিলাম তা তুমি জান না। আমি যার কাছে গিয়েছিলাম সে আমার—"

কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই সহসা আবার তেমনি করিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া গেল : এবং তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটির অনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত আমায় বিহ্বল করিয়া দিল! আবিষ্টের মত জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে তোমার কে?"

দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তেমনি ভাবেই বলিল, "সে আমার ছোট বোন।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অস্ফুটে আবৃত্তি করিলাম, "ছোট বোন? তোমার? কিন্তু ওখানে?"

মুখ তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "সে সব শুনে তোমার কোন লাভ নেই। তুমি হয়ত তা বিশ্বাস কর্বে না।"

কথাটি যে সত্যই কতখানি অবিশ্বাস্য তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাহার মুখ হইতে একটি সত্য ঘটনা শুনিয়া বিশ্বাস করিবার মত মন যে আমার নাই, আমার প্রতি তাহার এই অবিশ্বাস আমাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। অথচ প্রত্যুত্তরে বলিবার মত কিছুই নাই। এতদিন একটা অর্ধসত্য ধারণা লইয়া তাহাকে নানা ভাবে হীন সন্দেহ করিয়া আসিয়াছি। এবং কিছুক্ষণ আগেও সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে নিদারুণ বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তাহার সম্বন্ধে বহু অন্যায় এবং অপ্রিয় মন্তব্যই করিয়াছি। এবং সত্যকথা বলিতে কি তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণাকে হয়ত অর্ধসত্যও বলা চলে না। কারণ একটা গণিকার ঘরে

ঢুকিতে দেখিয়া তাহার অন্যান্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিজের মূঢ় কল্পনার সাহায্যে একটা সহজ-সাধ্য ধারণার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম। ইহাকে অর্ধসত্যই বা বলা যায় কি করিয়া, ইহাত সম্পূর্ণ মিথ্যা। একথা সত্য যে এমন ঘটনা খুবই কম ঘটিয়া থাকে। এবং সচরাচর যে সব মানুষ নানা রকম কৌশল অবলম্বন করিয়া সন্তর্পণে সেই সব যায়গায় যায় তাহাদের মধ্যে কাহারও উদ্দেশ্যই বিশেষ সাধু নয়। অতএব বেশ্যার গৃহে স্বচক্ষে ঢুকিতে দেখিয়াও তাহার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসের কোন সুযোগ্য কারণ ও থাকে না। তবুও তাহার কথাটা শুনিবামাত্রই যে কথাটা সর্বপ্রথম মনে হইল তাহা এই যে এমন করিয়া কোন মানুষের সামান্য আচরণ হইতে মানুষটার আগাগোড়া সবকিছু সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা পোষণ করিবার মত নীচতাত ইহার আগে আমার কখনও হয় নাই—তবে এখনই বা হইল কেন? অনভিজ্ঞ মনের স্বল্পতম সঞ্চয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াও নিছক সংস্কারজনিত সংকীর্ণতাই যে আমায় তাহাকে সন্দেহ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছে এই কথাটা বুঝিতে পারিয়া অপরিসীম লজ্জায় ও ক্ষোভে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং সেই সঙ্গে বারবার মনে পড়িতে লাগিল একদিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় জনশূন্য দামোদরের তীরে বসিয়া বিকাশ বলিয়াছিল, "তোমায় দেখা মাত্রই মনে হয়েছিল তুমি যেন আমার কত দিনের পরিচিত। তোমায় বোধ হয় ভালবেসে ফেলেছি মাষ্টার।" সেদিন যে মানুষটা অমন অনাড়ম্বরভাবে নিজের মনের গভীর সত্যটি স্বল্পপরিচয়ের সমস্ত দূরত্ব অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিল, আজ সেই মানুষটাই অপরিসীম বেদনায় এমনি একটি গভীর সত্যকথা বলিয়া ফেলিল যে, কথা শুনিয়া বিশ্বাস করা হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং সেদিন যেমন তাহার ভালবাসা লাভ করিয়া একটা অব্যক্ত আনন্দে পুলকিত

হইয়া উঠিয়াছিলাম আজ তেমনই আমার প্রতি তাহার অবিশ্বাসের কথা শুনিয়া অপরিমিত বেদনার প্রলেপে আমার সমস্ত অন্তর স্তম্ভিত হইয়া গেল। এবং কিছু বলিবার আগেই অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ধীরস্বরে বিকাশ বলিল, "মাষ্টার আমার একটা অনুরোধ রেখ একথা যেন আর কেউ জানতে না পারে।"

এই ধরণের অনুরোধ কিছু নূতন নহে। এবং সাধারণতঃ অনেক কথার শেষেই এমনিতর অনুরোধ আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহার মুখে এই অনুরোধ শুনিয়া মনে হইল আমার প্রতি তাহার বিশ্বাসের শেষ বন্ধনটুকুও বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই এমনি কুণ্ঠিত হইয়া সে আমায় অনুরোধ করিল যেন যে কথা আমি জানিয়াছি তাহা কাহাকেও না জানাই। এবং আমার প্রতি তাহার এই অবিশ্বাস যে গোপনে গোপনে আমার কতখানি দুর্ব্বল করিয়া আনিতেছিল বুঝিতে পারি নাই।

তাই সে যখন অন্যমনস্কের মত বলিল, "এই কথা আর কেউ জানলে আমার কোন ক্ষতি নেই, শুধু ভয় হয় আমার বোনটা হয়ত লজ্জায় আত্ম-হত্যা কর্ব্বে। তাই আর যাই কর এ নিয়ে কাউকে কিছু বল না" তখন অন্তরের গভীর তলদেশে সঞ্চিত বেদনার ভারে আমার সমস্ত সংযমের বাঁধ সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। এবং আমার দুই চোখ বাহিয়া ধীরে ধীরে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। একে ত নিজের অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহার অত্যন্ত বেদনার স্থানটিকে পদদলিত করিয়া তাহার মনে যে ব্যথা জাগাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার জন্য নিজের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া-ছিল, তাহার উপর তাহার এই সকাতর অনুরোধ আমায় মর্ম্মাহত করিয়া দিল। মনের মধ্য হইতে নিজের নিদারুণ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কে যেন শতকণ্ঠে ধিক্কার দিয়া উঠিল। এবং একজন পুরুষ মানুষের সামনে পুরুষ মানুষ হইয়া চোখের জল ফেলা যে অত্যন্ত লজ্জার কথা সে কথাও যেন ভুলিয়া গেলাম।

সে সময়ে কি যে করিতাম নিজেও ঠিক জানি না।

হঠাৎ আমার চোখের জল বোধ করি সেই অদ্ভুত মানুষটিকেও বিচলিত করিয়া দিল, উঠিয়া আসিয়া আমার হাত দুইটা ধরিয়া বলিল, "একি মাষ্টার তুমি কাঁদছ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে কোন তিরস্কার ছিল না, আমার অন্যায় আচরণের জন্য কোন অভিযোগ ছিল না, এবং তাহাকে যে আমি শত শত কঠিন মন্তব্যের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছি সে সব কথাও বুঝি সে ভুলিয়া গেল। আমার অশ্রুসিক্ত মুখের মধ্য দিয়া বোধ করি সে আমার দুর্বলচিত্তের তলদেশ পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইল। এবং তাহার কথা শুনিয়া তাহার দুইখানি হাতের উপর মুখ রাখিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিলাম। এ কান্না যে আমার কেন তাহা তখন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আজ বুঝিতে পারি সেদিনের কান্নার মধ্যে ছিল কিছুটা নিজের নির্বোধ আচরণের জন্য অনুশোচনা আর কিছুটা আমার প্রতি তাহার অবিশ্বাসের জন্য অভিমান। এমন অবস্থা কাহারও জীবনে কখনও হইয়াছে কিনা জানি না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দুই হাতের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিবার পর সে জোর করিয়া আমার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "অত কাঁদে না। ছিঃ You did not mean anything wrong—"

সে যে আমার সমস্ত অপরাধ স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করিয়া লইয়াছে সেই কথাটা ভাবিয়াই মনে মনে শান্তি পাইলাম। চোখের জলের মধ্য দিয়া আমার মনের অনেকখানি গ্লানি, অনেক হীনতা যেন নিঃশেষে গলিয়া গেল। এবং সে দিনের সেই অবিরল অশ্রুবর্ষণের মধ্যে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই করিলাম যে আর কখনও কোন মানুষকে এমনি করিয়া অকারণ সন্দেহের বশে এমন কঠোর আঘাত দিব না। সেই শপথ উত্তর জীবনে কখনও

ভঙ্গ করি নাই। পরবর্ত্তী জীবনে যখন কোন মানুষের কোন অযৌক্তিক আচরণ আমার মনে সামান্যতম সন্দেহ বা ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছে তখনই এই দিনটির কথা স্মরণ করিয়া গভীর লজ্জার সহিত ইহাই ভাবিয়াছি যে এমনি একটা মারাত্মক ভ্রান্তি নিরসনের জন্য যে মূল্য দিয়াছি তাহা অবিস্মরণীয় এবং এই মূল্য দানের মধ্য দিয়া মানব মনের যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধান করিয়াছি তাহাও সহজে ভুলিবার নয়। সেই সঙ্গে বিকাশের কথা মনে করিয়া ভাবি যে, যে সমস্ত মানুষকে সন্দেহ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহাদের কতটুকুই বা জানি। বহির্জগতের সামান্য দুই চারিটা আচার ব্যবহার বা কার্যকলাপ হইতে কতটুকুই বা জানা যায়? যেটুকু জানা যায় সেইটুকুই ত সব নয়। এবং এই চিন্তাই আমার পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর ভ্রান্তির হাত হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে; ভাগ্যে সেদিন অতখানি চোখের পড়িয়াছিল।

কান্নার আবেগ শান্ত হইলে চোখ মুছিয়া বিকাশের পানে চাহিয়া বলিলাম, "কি ঘটেছিল আমায় বলবে বিকাশ?"
বিকাশ একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, ""Surely এতদিন তোমায় বলে ফেলতাম। কিন্তু"—বলিয়া আমায় সদ্যবর্ষণ ক্ষান্ত চোখের পানে চাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে সুরু করিল।

"ঘটনা এমন কিছু নয়, মানে আমাদের দেশে প্রায়ই ঘটে থাকে। আমাদের বাড়ী পূর্ববঙ্গে জানত।" বলিয়া ময়মনসিংহ জেলার একটা অখ্যাত গ্রামের নাম করিয়া বলিল, "গ্রামটা মুসলমান প্রধান। গ্রামের মধ্যে বড়লোক ছিলাম আমরাই। আজ প্রায় ১০।১২ বছর আগেকার কথা। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এল আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় জানাচ্ছেন শীঘ্রি দেশে যাবার জন্যে। টেলি-

গ্রামটা এখনও আমার কাছে আছে। কি ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে সেই দিনই রওনা হলাম। কিন্তু বাড়ী গিয়ে যা দেখলাম তা না দেখাই আমার উচিত ছিল মাষ্টার।" বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল। বুঝিলাম, একটা সুগভীর বেদনার নিরুদ্ধ আবেগ তাহাকে নির্বাক করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে সুরু করিল, "শুনলাম কি একটা ব্যাপার নিয়ে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা সুরু হয়। এবং মুসলমানেরা দলবেধে আমাদের বাড়ী চড়াও হয়ে বাবাকে পুড়িয়ে মেরেছে মায়ের সামনে।" বলিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া কঠিনকণ্ঠে বলিল, "এবং মায়ের সামনে আমার ১৮ বছরের ভাইকেও পুড়িয়ে মেরেছে, তারপর ছোট দুটো বোনের উপর নৃশংস অত্যাচার করায় যেটা সব চেয়ে ছোট তার বয়স তখন বছর দশেক, সে তখনই মারা যায়, আর তার উপরের বোনটাকে তারা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আমরা চার ভাইবোন ছিলাম এবং ছোট ভাইবোনগুলিকে যে আমি কত ভালবাসতাম মাষ্টার তা বলে বোঝানো যায় না।"

বলিতে বলিতে সেই পাথরের মানুষটির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সে চোখে কেহ কখনও জল দেখে নাই, তাই সে দিনও জল পড়িতে পারিল না। অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে সংযত করিয়া তীব্র বেদনায় ওষ্ঠ প্রান্ত কুঞ্চিত করিয়া বলিল "মাত্র কদিন আগেও এমন করে যে আমি বাপ মা ভাই বোন সকলকে হারাব, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

এই পর্যন্ত বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

বলিলাম, "তারপর?"

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তারপর? তারপর my whole life was spoiled for this incident, thats another

story—এবং আমি তারপর আমার হারাণ বোনটির জন্য অনেক খোঁজ করেছি কিন্তু পাইনি। তুমি এখানে আসার কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন রাণীচক বাজারে দেখি চুনী দাঁড়িয়ে আছে। আমার ছোট বোনের ভাল নাম রেবা, ডাক নাম ছিল চুনী। সে আমায় চিনতে পারেনি। কিন্তু আমি ঠিক চিনেছিলাম। কিন্তু কিছু না বলে চলে আসি। তারপর তার সম্বন্ধে নানাভাবে খোঁজ নিয়ে যখন বুঝলাম যে সে চুনীই বটে, তখন তার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিই। কিন্তু মনে হচ্ছে I should not have done it."

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "কেন ?"

বলিল, "কিছুই ত করার উপায় নেই।"

বলিলাম, "কেন করা যাবে না ? তুমি তাকে নিজের কাছে এনে রাখতে পার।"

অদ্ভুত হাসি হাসিয়া বলিল, "পাগল হয়েছ, That is impossible."

তাহার এই দৃঢ় অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "অসম্ভব কেন ? হাজার হোক সেত তোমার নিজের বোন, আর সে যা করেছে তার জন্যত সে দায়ী নয়—"

বাধা দিয়া বলিল, "আমি সে কথা বলছি না। সে যদি আসতে চাইত আমি মাথায় করে রাখতাম। এখানে না হোক, অন্য কোথাও। সে যে-খানেই বলত সেই খানেই নিয়ে যেতাম। কিন্তু সে নিজেই বারণ করেছে।"

বলিলাম, "কি বলে সে ?

বলিল, "যা বলেছ তা কিছু অন্যায় নয়। বল্লে সবাই আমায় জানে আমার কেউ নেই বলে, এখন যদি হঠাৎ একটা বাজারের মেয়েকে ঘরে এনে বলি এ আমার আপন বোন তাহলে শুধু যে কেউ বিশ্বাস কর্বে না তাই নয়, বরং তাকে আর আমাকে জড়িয়ে

যে সব কুৎসা রটবে ভাইবোন হয়ে সে সব কথা না শোনাই ভাল। তাই ভাবছি কি করা যায়। অথচ চোখের সামনে নিজের বোনকে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া থামিয়া গেল। এবং উঠিয়া গিয়া কাঠের বাক্স হইতে একটা নূতন বোতল বাহির করিয়া ছিপিটা খুলিতে খুলিতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "What a bastards society we liv› in,".

ইহার উত্তরে আমার কিছুই বলিবার ছিল না। কারণ যে সীমাহীন বেদনার বহ্নিশিখা সে অবিরত রাত্রি দিন আপনার অন্তরের মধ্যে সযত্নে গোপন করিয়া চলিয়াছে তাহার উত্তাপ যে কত দুঃসহ তাহা মানুষ হইয়াও যদি বুঝিতে না পারি তাহলে বৃথাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ভালমন্দ সুনীতি দুর্নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আশৈশব যে সব কথা শুনিয়া আসিয়াছি সেই সব সামান্য কথার দ্বারা এই মানুষটাকে কিছু বুঝাইতে যাওয়া বৃথা। অথবা সমাজের সম্বন্ধে অতখানি রূঢ়-মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রচলিত সাধু মতবাদের সাহায্যে তাহার উক্তির প্রতিবাদ করার চেষ্টাও নিতান্ত হাস্যকর। যে সুতীক্ষ্ণ বেদনা তাহার মত মানুষের বলিষ্ঠ চিত্তের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত চিরিয়া দিয়াছে সেই বেদনার উপশমের জন্য কোন সান্ত্বনাবাণীই যে যথেষ্ঠ নয়, সে কথাটা বুঝিতে পারিয়া নীরব থাকাই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হইল। এবং এই প্রতিকারহীন বেদনার অজ্ঞাত পরিণামের কথা ভাবিয়া উপায় বিহীন অক্ষমতায় অধীর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কিই বা করিতে পারি? কতটুকুই বা আমার শক্তি? এবং যে নারীকে লইয়া এত দুশ্চিন্তা সেই নারী নিজ মুখে যে কথা বলিয়াছে যুক্তির দিক দিয়া তাহা যে একান্ত সত্য তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াই নিষ্ফল আক্রোশ যেন বাড়িয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

উত্তর জীবনে বিকাশের কথা গল্পচ্ছলে অনেককে বলিয়াছি তাঁহাদের কেহ কেহ কাহিনীটা ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত মন্তব্য করিয়াই চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়া মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মসূত্রানুসারে বিকাশের নানা কথাবার্ত্তা ও কার্যকলাপের কারণ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে অনেকখানি বিদ্যাবুদ্ধি ব্যয় করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বা আগাগোড়া কাহিনীটা শুনিয়া বিজ্ঞের মত কুঞ্চিত ললাটে প্রশ্ন করিয়াছেন. "সবই ত বুঝিলাম, কিন্তু কি তুমি বলিতে চাও ?" বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলাম শেষোক্ত মানুষদের লইয়া। যাঁহারা কাহিনীর ভালমন্দ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মন্তব্য করিয়া থামিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদের প্রয়োজন বোধ করি নাই। অথবা যাঁহারা মনঃস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি লইয়া বিকাশের মানসিকতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গেও আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কারণ মনঃস্তত্ত্বের জটিল সূত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এতই সামান্য যে তাহা লইয়া বুদ্ধিমান শ্রোতার অংশ গ্রহণ করা চলে কিন্তু তর্ক করা সাজে না। কিন্তু বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাঁহাদের লইয়া যাঁহারা আমার কাহিনী ব্যক্ত করার প্রচেষ্টার তলদেশে কোন গভীর উদ্দেশ্যের সন্ধানে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া

উঠিয়াছিলেন। এ সমস্ত কথা এখানে লিখিবার হয়ত কোন প্রয়োজন নাই। এবং কাহিনী ছাপার আকারে বাহির হইলে হয়ত এই কয়টা কথা লিখিবার জন্য সমালোচকের কাছে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইব। কিন্তু সে আশঙ্কা সত্ত্বেও না লিখিয়া পারিলাম না। অনেকে বলেন কোন কিছু রচনা করার মধ্যে রচয়িতার কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। যদি না থাকে তাহা হইলে রচনার কোন সার্থকতা নাই। এবং আমার আপত্তি এই কথাটার সম্বন্ধেই। বিকাশের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্ত্তে তাহার জীবন কাহিনী রচনা করিবার মত কোন ইচ্ছা আমার ছিলনা। কারণ বরাবর বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম বলিয়াই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হৌক শিল্পকলা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান রসায়ন শাস্ত্রের স্পেশাল পেপারের Fs-ay অথবা ল্যাবরেটরী নোট বুকের প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নানাবিধ শব্দ সংযোগে জীবনের বাণীমূর্ত্তি রচনা করিবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হইবার মত না ছিল শক্তি না ছিল সাহস। যাঁহারা এ কাজে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের জন্ম বা মৃত্যু উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় দল বাঁধিয়া গিয়া দুর্বোধ্য ভাষার কারুকার্য্য শুনিয়া সশব্দে করতালি ধ্বনি করিয়াছি এবং বাড়ী ফিরিয়া রসায়ন শা . র মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। সাহিত্য সভায় হাততালি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছি এমন দুর্ণাম আমার অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারিবে না। কিন্তু যৌবনের ঊষা লগনে, চাকরী উপলক্ষ্যে সহর হইতে দূরে একটি অখ্যাত স্থানে কারখানা জীবনের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে থাকিবার সময়, সহসা যখন একটি মানুষের রহস্যময় জীবনের সহিত নিজের জীবনটা জড়াইয়া গেল, তখন হইতে সেই মানুষটার সম্পর্কে যে সশ্রদ্ধ কৌতুহল জাগিয়া উঠিয়াছিল, দীর্ঘকাল পরেও সে

কৌতুহল নিবৃত্ত হয় নাই। শুধু ত তাহাই নহে, সেই অদ্ভুত মানুষটির কার্য্যকলাপ কথাবার্ত্তা আমার সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবনটার উপর এমনই অবিশ্বাস্য প্রভুত্ব বিস্তার করিল, যে আজিও তাহার হাত হইতে মুক্তি পাই নাই। সেই সঙ্গে এই কথাও মনে হয় আমার সংস্কারবদ্ধ সাধারণ জীবনটাকে সে আপন শক্তিতে অসাধারণত্বের দীপ্তিতে দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়া তাহার অন্তর্নিহিত অনির্বাণ বেদনার আগুনের উত্তাপ আমার হৃদয়েও এমনিভাবে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেল, যে পরবর্ত্তী জীবনে চলিষ্ণু পৃথিবীর পরিবর্ত্তমান পটভূমিকার মধ্যে যখনই কোন অস্বাভাবিকত্বের সন্ধান পাইয়াছি তখনই এই মানুষটির জীবনের কথা স্মরণ করিয়া সেই সমস্ত অস্বাভাবিকতাই সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছি।

যখনই কোন দুঃসহ আঘাতে আত্মবিস্মৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে তখনই এই পাথরের মানুষটির সহনশীলতার কথা স্মরণ করিয়া আঘাতের বেদনাটুকু হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছি। আমার নব-জীবনের পথ প্রদর্শক সে, তাই তাহার কথা ভুলিতে পারি নাই। এবং শুধু মাত্র সেই কারণেই আজ অশক্ত হস্তে লেখনী গ্রহণ করিয়া সেই দুর্জ্জেয় মানুষটির বিচিত্র জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকিবার কঠিন প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছি। ইহার মধ্যে আমার কোন উদ্দেশ্য নাই। কোন বিশেষ তথ্য বা সত্য অথবা তত্ত্বের সন্ধান দিবার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই। শুধু একটা কথা বলিতে পারি এমনটিও মানুষের জীবনে ঘটে, এবং এমন মানুষও দেখা যায় যে নিজের জীবনের অন্তহীন বেদনার ভার শতসহস্র মানুষের কৌতুহলী দৃষ্টির অন্তরালে, নীরবে একাকী বহন করিয়া চলে। এবং তথ্য হিসাবে এই কথাটিই বলিতে চাই যে, এমন ধরণের মানুষের সংস্পর্শে আসা অসীম সৌভাগ্যের লক্ষণ। বিকাশের সম্বন্ধে প্রথম প্রথম আমিও কয়েকটা ভুল করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে যথাসময়ে সে ভুল

নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহাতেই বৃহত্তম ভ্রান্তির হাত এড়াইতে পারিয়াছিলাম। অতএব এই ধরণের মানুষের সংস্পর্শে যদি আমার মত কোন অনভিজ্ঞ মানুষ কখনও আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে হয়ত তাহার জীবনেও এই ধরণের ভুল ঘটিতে পারে। এবং যাহাতে তাহা না ঘটে সেইজন্যই এই কাহিনীটি লিখিলাম এবং রচনার উদ্দেশ্য হিসাবে নিতান্ত অযৌক্তিক হয়ত ইহা নয়। কিন্তু তা'ছাড়া তাহার কথা-বার্ত্তার মধ্যে যুক্তি ছিল কিনা, অথবা থাকিলেও তাহার গুরুত্ব কতখানি, কিংবা তাহার কার্যকলাপ সঙ্গত কি অসঙ্গত, এ সমস্ত কথা লইয়া আলোচনা করিবার কোন ইচ্ছাই নাই। কারণ তাহার কথার মধ্যে এমন অনেক যুক্তি ছিল যাহা বোধ করি একমাত্র তাহার কাছেই বোধগম্য ছিল। আমি নিজেও অনেক সময় তাহার অনেক কথা বুঝিতে পারি নাই। আমি শুধু তাহাকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছিলাম। এবং সেই ভালবাসার দাবীতে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহার অসীম নিঃসঙ্গ বেদনার সামান্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং সেই কথাটাই মানুষকে জানাইবার জন্য তাহার জীবন কাহিনী বিবৃত করিতে বসিয়াছি। ইহার মূলে সৎ বা অসৎ কোন উদ্দেশ্যই নাই।

৺দুর্গাপূজার তখনও মাসখানেক দেরী আছে। ৺পূজা উপলক্ষে কারখানা দিন সাতেক বন্ধ থাকে। এবং সেই সাতদিন বিকাশ আমায় সঙ্গে করিয়া কাছাকাছি দুই একটা জায়গা ঘুরিয়া আসিবার সঙ্কল্প জানাইয়া আমার মতামত জানিতে চাহিলে সানন্দে মত দিলাম। এবং বিকাশের সাহচর্য একাকী উপভোগের আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া কটা দিন বেশ ভালভাবেই কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু বিধাতা যখন বিরূপ হন তখন কোন উপায় থাকে না। একদিন কারখানায় বসিয়া মিঃ ঘোষ এবং আমি একটা নূতন কেমিকেল লইয়া পরীক্ষা করিতেছি

হঠাৎ তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া কারখানার বৈদ্যুতিক সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। আমি আসা পর্যন্ত কখনও সাইরেন শুনি নাই। তাই সাইরেণ শুনিয়া একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। মিঃ ঘোষের মুখের পানে চাহিতেই দেখি তাঁহার মুখও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিপদের আশঙ্কায় সাইরেণ বাজান পদ্ধতি বটে কিন্তু বিভিন্ন ধরণের বিপদ সঙ্কেত জানাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সাইরেন বাজান হইত। আমি অত কিছু জানিতাম না। মিঃ ঘোষ সাইরেণ শুনিয়া বলিলেন, "একি! এযে Danger signal. দিচ্ছে ফ্যাক্টরীতে কোথায় আগুন লেগেছে হে চলত দেখি।" এবং যাইবার পূর্বে সংক্ষেপে যাহা বলিলেন তাহা এই যে এই সঙ্কেতের অর্থ হইতেছে যে অবিলম্বে কারখানা হইতে বাহির হইয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবার আদেশ। এবং সর্বাপেক্ষা বিপদের সঙ্কেতধ্বনি এটা। দুজনে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দেখি অক্সিজেন প্ল্যাণ্টের দিক হইতে লোকজনেরা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই যে অক্সিজেন গ্যাস শোধন করিবার যন্ত্রটা মেন-সেডের কিছুটা দূরে অবস্থিত। এবং মেন সেড হইতে অক্সিজেন গ্যাস একটা পাইপের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। সেই পাইপটার নীচে কোন খুঁটি ছিল না। গুদামের গায়ে কতকগুলি গন্ধকের বস্তা পরের পর সাজাইয়া রাখা আছে এবং তাহারই উপর দিয়া পাইপটা গিয়াছে। এবং মুস্কিল এই যে গন্ধকের বস্তাগুলি এমন ভাবে রাখা আছে যে সেগুলি সহসা ধ্বসিয়া পড়িলে পাইপ সমেত সমস্ত অক্সিজেন প্ল্যাণ্টটা ধ্বসিয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। একে ত অক্সিজেন পাইপে আগুন লাগিলে যথেষ্ট বিপদ, সেই সঙ্গে যুদ্ধের দরুণ কয়েকটি বস্তু গুদামে ছিল, বিস্ফোরক হিসাবে যাহা মারাত্মক

এবং যাহাতে আগুন লাগিলে সমস্ত কারখানা ঘর সমেত আশে পাশের অনেকখানি স্থানেরই গুরুতর ক্ষতি হইবে। আসন্ন দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অধিকাংশ মানুষই ঊর্ধ্বশ্বাসে কারখানা হইতে বাহির হইয়া নিরাপদ স্থানে জমা হইয়াছে। শুধু কয়েকটা অসমসাহসী পাঠান এবং পাঞ্জাবী মিলিয়া আগুন নিভাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় Fire King গুলা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু অসুবিধা এই যে হাওয়াটা আসিতেছে উল্টা দিক হইতে। ফলে হাওয়া চালিত পোড়া গন্ধকের ধোঁয়ায় দেখিতে দেখিতে সমস্ত অক্সিজেন প্ল্যান্টের ঘরটা অন্ধকার হইয়া গেল এবং কোথায় যে কি হইতেছে কিছুই বোঝা গেল না।

মিঃ ঘোষ আমার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, "সত্যেন এইবেলা পালিয়ে চল, সর্বনাশ হতে বেশী দেরী নেই—।"

সেই ভয়াবহ চীৎকার এবং সাইরেণের তীক্ষ্ণ আওয়াজের মধ্যে আবিষ্টের মত দাঁড়াইয়াছিলাম; মিঃ ঘোষের কথায় সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া চমকিত হইয়া বলিলাম, "তাই চলুন।" বলিয়া পা বাড়াইতে গিয়াই মনে পড়িল বিকাশের কথা। সে কোথায়? সে যে ঐ গন্ধকের জমাট ধোঁয়ার মধ্যে যায় নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। ওদিকে অক্সিজেন প্ল্যান্টের মধ্যে যে কয়জন পাঠান কাজ করিতেছিল তাহারা সকলে বাহির হইতে পারে নাই। অনেকগুলি লোক তখনও প্ল্যান্টের মধ্যে। হাওয়াটা সেই দিক হইতে আসিতেছিল বলিয়া গন্ধকের ধোঁয়া শীঘ্র তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু অল্প অল্প বোধ কবি যাইতে সুরু করিয়াছে। আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় কয়েকজনকে ছুটিয়া বাহির হইয়া

গন্ধকের ধোঁয়ার মধ্যে পড়িয়া জ্ঞান হারাইতে দেখিয়া এবং বাকী মানুষগুলার বুকফাটা তীব্র চীৎকার শুনিয়া মনের মধ্যে একটা নিষ্ফল আক্রোশ গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। অথচ কিছুই করিবার নাই। আমার এমন সাহস বা শক্তি নাই, যে, কোন উপায়ে তাহাদের রক্ষা করি।

মিঃ ঘোষ আমায় আরও একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "কি হল হে, চল শিগগীর এরপর হয়ত বেরুন যাবে না।"

বলিলাম, "যাচ্ছি। কিন্তু বিকাশ কোথায় ?"

কথাটা শুনিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন, "সে বোধ হয় বেরিয়ে গেছে।"

যদিও তাহা অসম্ভব নয় তবুও কেমন যেন কথাটা বিশ্বাস হইল না। এবং কি একটা বলিবার জন্য মিঃ ঘোষকে সম্বোধন করিবার পূর্বেই সহসা এক প্রচণ্ড ধাক্কায় চমকিয়া উঠিলাম। দেখি বিকাশ আসিয়া দাড়াইয়াছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "শীগগীর বেরিয়ে যাও মাষ্টার, দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? মিঃ ঘোষ শীগগীর যান, বোধ হয় ফ্যাক্টরীটা বাঁচান গেল না।"

বলিলাম, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

বলিল, "আমি গিয়েছিলাম অক্সিজেন সাপ্লায়ের মেন বন্ধ কর্তে। গন্ধকের বস্তাগুলো টেনে বার করে ফেলতে না পার্লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওপাশে অনেকগুলা লোক রয়েছে। আমি চল্লাম।"

বলিয়া আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দিয়া সে সেই ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ততক্ষণে গন্ধকের ধোঁয়া একটু একটু আমাদের নাকেও আসিয়া লাগিতেছিল। মিঃ ঘোষ কাশিতে কাশিতে বাহিরে গেলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই চলিয়া আসিতে পারিলাম না। কিসের

অজ্ঞাত আকর্ষণ যেন আমায় জোর করিয়া টানিয়া রাখিল। সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে বার দুই বিকাশকে মুক্ত বাতাসের মধ্যে বাহির হইয়া আসিতে দেখিলাম। বুঝিলাম দম লইবার জন্য সে অমনি করিয়া বাহিরে আসিয়া বুক ভরিয়া মুক্ত বাতাস গ্রহণ করিয়া আবার ভিতরে যাইতেছে। এবং ঐটুকু সময়ের মধ্যে যে দুই তিন জন বিরাট দেহ পাঠান ধোঁয়ার মধ্যে অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহাদের টানিয়া বাহির করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আরেকবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। এবং কি করিল জানি না। হঠাৎ গন্ধকের স্তূপটি সশব্দে ধ্বসিয়া পড়িল। এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ডলীকৃত সাদা ধোঁয়ার কঠিন আবরণ একটু পাতলা হইয়া গিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে দেখিলাম মাটি হইতে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে অবস্থিত অক্সিজেন যাইবার পাইপটি যে বস্তাগুলার উপর ছিল সেগুলি সশব্দে ধ্বসিয়া পড়িল। এবং বিকাশও সেই তপ্ত তরল গন্ধকের উপর পড়িয়া গেল তাহা দেখিতে পাইয়া মনের মধ্যে কি যে ঘটিল জানি না। সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তীরবেগে ছুটিয়া যাইবার পূর্বেই ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী শিখ শ্রমিক সর্দার হরনাম সিংয়ের তীব্র চীৎকার শুনিতে পাইলাম, "হুসিয়ার বাবুজী," এবং পিছন হইতে কাহার সুদৃঢ় আকর্ষণ অনুভব করিয়া ফিরিয়া দেখি এক বিরাট আকৃতি পাঠান আমায় ধরিয়া আছে এবং সর্দার হরনাম সিং ততক্ষণে অবলীলাক্রমে বিকাশের অচৈতন্য দেহটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির করিয়া আনিয়া কিছুদূর আসিয়া নিজেও পড়িয়া গেল। তাহাদের ধরাধরি করিয়া বাহিরের খোলা জায়গাটায় রাখা হইল। এবং শুধুমাত্র বিকাশের অদ্ভুত সাহস এবং অমানুষিক চেষ্টার জন্য কেবল যে আগুন নিভিয়া গেল তাই নয়, উপরন্তু অক্সিজেন

প্ল্যাণ্টটির মধ্যে যে কয়জন লোক ছিল তাহারও অক্ষত দেহে রক্ষা পাইল, এবং সমস্ত কারখানা মায় কারখানা সংলগ্ন সমস্ত স্থানটি রক্ষা পাইয়া গেল। ঘটনাটা লিখিতে আমার যত সময় লাগিল ঘটিতে বোধহয় তাহার অর্দ্ধেক সময় ও লাগে নাই। আগাগোড়া ঘটনাটা যেন একটা অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মত আমায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কেমন করিয়া কি যে হইল ঠিক বুঝিতে পারি নাই। এবং সচরাচর যেমন হইয়া থাকে তেমনি অসতর্ক মুহূর্ত্তে বিপদের সম্ভাবনা আমায় এমনি স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল যে সেই মুহূর্ত্তে বিকাশের সমস্ত কাজকর্ম কথাবার্ত্তার অর্থ সঠিক বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। এবং আজও যখন সময়ে সময়ে সেদিনের সেই অভাবনীয় বিপদের ছবি বিস্মৃতির অন্তরাল্ হইতে আত্মপ্রকাশ করে তখন যেন নূতন করিয়া বুঝিতে পারি যে সেদিন বিকাশ কি অমানুষিক শক্তি এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। যখন সমস্ত কারখানাটি নিশ্চিহ্ন হইবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সমস্ত মানুষ আপন আপন প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পালাইয়াছিল, তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা বিস্মৃত হইয়া, কয়েকজন মানুষকে বাঁচাইবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় যে মানুষটি সেই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অকম্পিত হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, সেই মানুষটার কথা মনে পড়িলে আজও মনে মনে তাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাই। যে দুঃসাহস নিছক নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর, সেই দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া সে যাহা করিল তাহা শুধু অবিস্মরণীয়ই নয় অবিশ্বাস্য ও বটে। উত্তর জীবনে যখন ধর্ম্মোন্মত্ত মানুষের নৃশংস আচরণ দেখিয়া গোপনে অনেক চোখের জল ফেলিয়াছি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ-জর্জর মানুষের পশু-শক্তির আস্ফালন মনের

উপর তীব্র আঘাত করিয়াছে। বিচার বুদ্ধি হীন মুষ্টিমেয় মানুষের উলঙ্গ স্বার্থকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য অগনিত মানুষের রক্তসিক্ত বীভৎস আকৃতি দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়াছি, তখন ভাবিয়াছি মানুষ এমন কেন হয়? কি করিয়াই বা হয়? অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ধ্বংসোম্মুখ কারখানা ঘরে যে মানুষ আপনার জীবন রক্ষার চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া কয়েকটি আর্ত্ত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য নির্ভীক হৃদয়ে ছুটিয়াছিল সেও ত আমাদের মতই মানুষ। কই তাহার মনে ত এ প্রশ্ন একবারও জাগে নাই যে নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গন হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে মানুষগুলি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতেছিল, তাহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক অথবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। এবং মনের দিক হইতে এই পার্থক্যের কথা স্মরণ করিলে বিস্ময় জাগে এই ভাবিয়া যে, এই পৃথিবীর বিষাক্ত মাটিতে অন্তরের মধ্যে এতখানি অমৃত সে কোথা হইতে পাইল? এবং ইহার উত্তরে এই কথাটাই মনে জাগে, যে, সমস্ত মানুষের প্রতিই তাহার ভালবাসা ছিল আন্তরিক। তাঁহার অন্তরস্থিত প্রীতি-সুধার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধারার অকৃপণ প্রসাদ হইতে কোন মানুষই বঞ্চিত হয় নাই। সমগ্র মানুষই ছিল তাহার পরমাত্মীয়। তাই তাহাদের বিপদের দিনে সে আত্মীয়-বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করিয়া অমন অবিচলিত হৃদয়ে মৃত্যুর ভ্রূকুটি ভঙ্গীকে উপহাস করিয়া মানুষগুলিকে অনিবার্য্য পরিণামের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে খবরটা দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। এবং হাসপাতালে বিকাশের অচৈতন্য দেহটাকে ঘিরিয়া শত শত অবাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এবং কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া যে কথাটি বারবার

শুনিলাম তাহা হইল, "এ্যায়সা কভি নেহি দেখা।" এবং বিকাশ যে পাঠানগুলিকে বাঁচাইয়াছিল তাহারা যে কতখানি কৃতজ্ঞ তাহা জানাইবার জন্য সকলেই যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও বিকাশের জ্ঞান ফিরে নাই। আঘাত তাহার খুবই গুরুতর। সৌভাগ্য-ক্রমে পড়িবার সময় পিঠটা মাটির উপরে পড়িয়াছিল তাই চোখ দুইটা বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু গলিত গন্ধকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার সমস্ত পিঠটা এবং শরীরের অন্যান্য অংশ এমনই পুড়িয়া গিয়াছে যে ডাক্তারেরা তাহার জীবনের সম্বন্ধে কোন ভরসাই দিতে পারিলেন না। কারখানার ইংরেজ ম্যানেজার ও মালিক দুইজনেই আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহারাও সব ঘটনাটা শুনিয়াছিলেন। মালিক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনকে বারবার এই কথাই বলিতে লাগিলেন, যেন চিকিৎসার যে কোন ক্রটী না হয়। যে কোন উপায়েই হউক বিকাশকে বাঁচাইতেই হইবে। এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিবেন। এবং প্রয়োজন হইলে বিকাশকে বিমানযোগে কলিকাতা পাঠান সম্ভব কিনা সে বিষয়েও সব ব্যবস্থা ঠিক করিতে গেলেন। খবর পাইয়া বৌদি মিঃ ঘোষকে লইয়া দেখিতে আসিলেন। বৌদির সে মূর্ত্তি বোধ হয় কখনও ভুলিতে পারিব না। পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে বিকাশের শয্যার পাশে আসিয়া আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বিকাশের অচৈতন্য দেহটাকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইা দাঁড়াইয়া গেলেন। এবং দুই চোখ বাহিয়া অবিরল ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। করুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বিকাশের পানে কয়েক মূহুর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড ক্রন্দনের আবেগ কোন রকমে দমন করিয়া মিঃ ঘোষের হাত ধরিয়া সকরুণ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল।"

বুঝিলাম এই দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এবং যে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সেখানে ছিলেন সেই সময়টুকু অন্য কোনদিকে চোখ তুলিয়াও তাকান নাই। সেদিন তাঁহাকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল আমার অসুখের সংবাদ পাইয়া যেদিন এমনি করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন সেই দিনটির কথা। তবুও মনে হইল সেদিনের সঙ্গে আজকের দিনটার অনেক তফাৎ আছে। তাঁহার আজকার মূর্ত্তি যেন কল্যাণময়ী কোমল চিত্ত, চিরন্তন নারীত্বের অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি। আজ যেন তাঁহাকে শুধু কর্ত্তব্যের আহ্বানই টানিয়া আনে নাই, সেই সঙ্গে হৃদয়ের ও একটা গোপন যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এ যোগাযোগ আমি কোন অন্যায় আকর্ষণ বলিয়া মনে করি নাই। অকপট বিশ্বাসের সহিত অকৃত্রিম স্নেহ মিশাইয়া একজন আরেকজনকে ভালবাসিলে উভয়ের হৃদয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় প্রীতির সংযোগ স্থাপিত হয়, ইহাও সেই স্নেহের সংযোগ। এবং এই স্নেহমিশ্রিত বিশ্বাসের জোরেই একদিন বৌদির রোগশয্যার পার্শ্বে বিকাশ গিয়া দাঁড়াইয়াছিল অবিচলিত চিত্তে। অন্তরের মধ্যে এই দুইজনের প্রীতির সম্বন্ধের স্বরূপটুকু অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলাম যতখানি তাহা অপেক্ষা মুগ্ধ হইলাম বেশী। এবং মনে হইল ইহা বোধ হয় একমাত্র বিকাশের জীবনেই সম্ভব।

হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া মিঃ ঘোষের বাড়ীতে আসিয়া দেখি খাটের উপর বিষণ্ণ ম্লান মুখে বৌদি বসিয়া আছেন এবং পাশে বসিয়া মিঃ ঘোষ তাঁহাকে যেন কি বোঝাইতেছেন। আমায় আসিতে দেখিয়া বৌদি বলিলেন, "বিকাশের জ্ঞান ফিরেছে?"

বলিলাম, "না।" বৌদি তেমনি বিষাদক্লিষ্ট মুখে বসিয়া রহিলেন। বেশ বুঝিলাম উত্তর শুনিয়া বৌদির উৎকণ্ঠিত অন্তর আরও বিমর্ষ হইয়া গেল।

অথচ সান্ত্বনা দিবার কোন চেষ্টাই করিলাম না। কারণ একেত এসব অভ্যাস নাই তাহার উপর বিকাশের অবস্থা এতই আশঙ্কাজনক যে সহসা তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পাইলাম না। বিশেষতঃ আসিবার সময় ডাক্তারের কথা শুনিয়া মনে মনে অধিকতর আশঙ্কা জাগিয়াছিল। ডাক্তার সোজাসুজি বলিয়া দিলেন যে, বিকাশ যদি এযাত্রা বাঁচিয়া যায় ত সে শুধু তাহার নিজের ভাগ্যের জোরে। না হইলে ডাক্তারী শাস্ত্রের সাধ্য নাই তাহাকে বাঁচাইয়া তোলে। কিন্তু সে কথাটাও বৌদিকে বলিতে পারিলাম না। তাই বৌদি যখন সহসা প্রশ্ন করিলেন, "কি রকম মনে হল সত্যেন? সেরে যাবে তো?" তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্ট আকুলতার সুর আমায় যেন সজাগ করিয়া দিল। এবং সেই মানুষটির বাঁচা মরা যে এই নারীর জীবনে কতখানি তাহা বুঝিয়া ধীর কণ্ঠে বলিলাম, সেরে যাবে নিশ্চয়ই। তবে—"বলিয়া মনের নিরুদ্ধ আশঙ্কাটা প্রকাশ করিতে অক্ষম হওয়ায় কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই থামিয়া গেলাম।

কিন্তু বৌদি বলিলেন, "তবে মানে? তার কি কোন গুরুতর ক্ষতি হবে বলে মনে হয়?"

তাঁহার উৎকণ্ঠা লাঘব করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "না, না, তা নয়। আমি বলছিলাম সারবে নিশ্চয়ই, তবে কিছু দিন ভুগবে।"

বৌদি অন্যমনস্কের মত বলিলেন, "সারবে বইকি, নিশ্চয়ই সেরে যাবে। ভগবান কখনও এতবড় অন্যায় কর্বেন না।"

ভাবিলাম বলি, "ইহা অপেক্ষা অন্যায় ভগবান করিয়াছেন।" কিন্তু বৌদির বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া এতবড় কঠিন কথাটি বলিতে পারিলাম না।

ইহার পরের দিনগুলার বিশদ বিবরণ দিয়া কোন লাভ নাই। শুধু সংক্ষেপে এই কথাটি বলিয়া দিই যে দুইদিন অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া তিনদিনের দিন বৃদ্ধ হরনাম সিংহ্ মারা গেল। কিন্তু বিকাশ ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতে লাগিল। এবং একমাস হাঁস-পাতালে থাকিবার পর ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাকে হাঁস-পাতাল হইতে যখন ছাড়িয়া দিল, তখনও তাহার পিঠের ঘা সম্পূর্ণ শুকায় নাই বটে, কিন্তু ডাক্তার বাবু বলিলেন আর ভয়ের কোন কারণ নাই। হাঁসপাতাল হইতে ছাড়া পাইয়া প্রথমটা সে যে কোথায় যাইবে বুঝিতে পারি নাই, কারণ সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে তাহার আরও মাস দুই লাগিবে। কিন্তু খবর পাইবামাত্র মিঃ ঘোষ এবং বৌদি আসিয়া বিকাশকে লইয়া গেলেন। বৌদির হাতের যে সেবা গ্রহণে একদিন নিদারুণ সঙ্কোচ বশতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, আজ সেই সেবার স্বরূপ দেখিয়া মনে হইল কতবড় নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই না সেদিন দিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা লইয়া আক্ষেপ করিয়া কোন লাভ নাই। বিকাশ মিঃ ঘোষের বাড়ীতে উঠিবার পর অবসর পাইলে আমিও সেখানে যাইতাম। এবং সেই সময়ে সেবা-পরায়ণা বৌদির যে রূপটি দেখিয়াছিলাম, তাহা চির-দিনের জন্য আমার অন্তরের মধ্যে এমনই একটা ছাপ রাখিয়া গেল যে পরবর্ত্তী জীবনের বহু ঝড় জলেও সে ছাপ মুছিয়া যায় নাই। শুধু তাহাই নয়, সেদিন এই দুইটি মানুষের অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়া পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে নূতন সম্পর্কের আভাস পাইলাম তাহা আমার বিগত জীবনের সমস্ত চিন্তাধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। নারীদের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তবুও

সংস্কারজনিত মূঢ়তার জন্য নরনারীর মধ্যে কোন সহজ সম্পর্ক স্থাপনের কথা কখনও ভাবি নাই। এবং তাহা যে কখনও সম্ভব হইতে পারে তাহাও ধারণা করিতে পারি নাই। কিন্তু একটি ৩২ বছরের অনাত্মীয় পুরুষের ভার একটি ২৮ বছরের নারীকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে দেখিয়া এবং সেই নারীর অকুণ্ঠিত সেবা, অসঙ্কুচিত আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া একটা অপরিচিত বিস্ময়ে ও আনন্দে মনটা ভরিয়া গিয়াছিল। এবং কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে নিগূঢ় স্নেহ এবং প্রীতির সম্পর্কটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে বুদ্ধি দিয়া বিচার করা বা বিশ্লেষণ করা চলে না। সমাজ ব্যবস্থা তাহাকে সমর্থন নাও করিতে পারে। হয়ত বা বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া অস্বীকারও করিতে পারে ; কিন্তু মানুষ হইয়া জন্মিয়া সেই সহজ সুন্দর সম্পর্কটিকে যুক্তি দিয়া বা বুদ্ধি দিয়া অস্বীকার করিবার মত হীনতা আর যাহারই থাক্ আমার নাই। এ বস্তু এতই দুর্লভ যে দেখিবামাত্র একটা গভীর শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নত হইয়া যায়। যদিও ক্ষুদ্র বুদ্ধির বিচারে ইহা অস্বাভাবিক এবং কেহ কেহ ইহাকে অন্যায়ও বলিয়াছেন কিন্তু সংসারের কুটিলতা তখনও আমার মনটাকে আবিল করিয়া তোলে নাই ; তখনও অবিশ্বাসের বিষবাষ্প আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে নাই। এবং সামাজিক নীতি শাসনের দুর্লংঘ্য নিষেধগুলি তখনও আমার মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া তোলে নাই। তাই সেদিন সেই দুইটি অনাত্মীয় মানুষের ঘনিষ্ঠতাকে শুধু যে অসন্দিগ্ধ চিত্তে স্বীকার করিয়া ছিলাম তাহাই নহে ; তাহার অন্তর্নিহিত মাধুর্যটুকুও যেন নিঃশেষে অনুভব করিয়া ছিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

দুর্গাপূজা কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, ভাল করিয়া জানিতেও পারিলাম না। শুধু তাহাই নহে, যে কয়মাস বিকাশ বিছানায় পড়িয়া রহিল, সে কয়মাস যে আমার কি ভাবে কাটিল তাহা একা আমিই জানি। সারাদিনটা কারখানার ল্যাবরেটরীতে থাকিয়া কোন রকমে কাটিয়া যাইত। কিন্তু বিকাল হইতে না হইতেই কারখানা ফেরৎ মানুষগুলির সঙ্গে একসঙ্গে আসিতে আসিতে সমস্ত মনটা অত্যন্ত অকারণে বিষণ্ণ হইয়া পড়িত। নানা জাতের, নানা ধর্ম্মের, নানা ভাষা-ভাষী লোকের সম্মিলিত কোলাহলের মধ্যে অসীম নিঃসঙ্গতার একটা অপরিচিত ব্যথায় মনটা ভারী হইয়া উঠিত। কর্মক্লান্ত ঘর্মাক্ত মানুষগুলা—সমস্ত মুখে চোখে অপরিসীম ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ, চোখে আশাহীন উদাস দৃষ্টি, শুধু যেন গায়ের জোরে অকারণ উচ্চহাস্য এবং অশ্লীল কথায় সমস্ত পথটাকে সচকিত করিয়া তুলিত। বেলা শেষের পড়ন্ত রৌদ্রের স্বর্ণ-আলোক চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। এবং সেই অস্তগামীসূর্যের রক্তরশ্মি পথচারী মানুষগুলির মুখের উপর পড়িয়া, শ্রান্তিমলিন মুখগুলিকে যখন রাঙাইয়া তুলিত, তখন মনে হইত বুঝি বা তাহা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর মুখের শেষ রক্তোচ্ছ্বাস, দীপ্ত প্রাণের সর্বশেষ ব্যাকুলতা। কোনরকমে মেসে ফিরিয়া চান খাওয়া সারিয়া চলিয়া আসিতাম জনশূন্য দামোদরের নির্জন তীরে। শরতের শান্ত শীর্ণ

দামোদরের মন্থর জলধারার অদ্ভুত কলোচ্ছাস, তীরবর্তী গাছগুলিতে কুলায় প্রত্যাগত পাখিদের উচ্ছ্বাসিত কলকাকলি, আর আসন্ন সন্ধ্যা-সমাগমে দিনের সমস্ত উচ্ছ্বাস স্তিমিত করিয়া এক সুনিবিড় শান্ত নিস্তব্ধতার অদৃশ্য ইঙ্গিত—সবকিছু মিলাইয়া আমার সঙ্গীহীন মনের দুঃসহ বেদনাকে যেন আমার কাছে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তুলিত। দামোদরের এই নির্জ্জন স্থানটিকে এই জন্যই বড় ভাল লাগিত; এবং স্থানটির প্রতি একটা মমতা জন্মিয়া ছিল।

এই সময়টায় দামোদরে খেয়া পারাপার হয়। কিছুটা দূরে একটা সাময়িক খেয়াঘাট আছে। সেখান হইতে যাত্রীবোঝাই ছোট নৌকাখানা দামোদরের ঈষৎ প্রবল স্রোতের মুখে দ্রুত ভাসিয়া যায়। নির্নিমেষ নেত্রে কখনও কখনও তাহার পানেই চাহিয়া থাকিতাম; ভাবিতাম আমার মনের সঙ্গীহীন বেদনার বোঝা লইয়া অমনি করিয়া কবে পাড়ি দিব কে জানে? মাঝে মাঝে নিজের বিগত জীবনের কথা মনে পড়িত। ভাবিতাম মানুষের জীবনে স্বপ্নের অবকাশ কত কম। এইত মাত্র সেদিন সবে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া নূতন কলেজ জীবনের অনাস্বাদিত আনন্দলাভে পুলকিত হইয়া, সঙ্গীদল পরিবেষ্টিত হইয়া কলেজ যাইতাম, কলেজ হইতে ফিরিতাম, অবসর সময়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় অকারণ প্রাণের আনন্দে কলধ্বনি করিয়া ফিরিতাম। নানা অছিলায় বাবার কাছে পয়সা চাহিয়া, তিনটার আগে কোন রকমে পার্সেণ্টেজ দিয়া প্রফেসারের অন্যমনস্কতার সুযোগে পিছনের দরজা দিয়া একে একে বাহির হইয়া দল বাঁধিয়া সিনেমায় যাইতাম। তখন প্রাণে ছিল কত আশা, চোখে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন, কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া অনাগত ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করিয়া

তুলিবার কত আশা, কত উদ্যম! এমনি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন পার হইয়া নবলব্ধ মুক্তির আনন্দ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু কখন যে গোপনে গোপনে জীবনের ঈশান কোনে অদৃশ্য দুর্যোগের কালোমেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, বুঝিতে পারি নাই। জীবনের প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিবার মুহূর্ত্তেই ভাগ্যের বজ্রাঘাতে চকিত হইয়া নিজের অসহায় অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলাম। বাবার মৃত্যু যেন কোন অদৃশ্য ভাগ্যদেবতার নির্ম্ম বিচার। সে বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা চলে না, অবনত শিরে সে বিচার গ্রহণ করিতে হয়। এবং অদৃষ্টের অমোঘ নির্দ্দেশে নব যৌবনের মুকুলিত আশা, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন, এক নিমিষেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এবং মানসচক্ষে সংসারের যে নিরুপদ্রব ছবি দেখিতাম, বাস্তবজগতের সীমানায় প্রবেশের মুহূর্ত্তেই উপলব্ধি করিলাম তাহা কত মিথ্যা, কত অকিঞ্চিৎকর। নিরুদ্বিগ্ন জীবন-যাপন বোধ হয় আধুনিক উপন্যাসের নায়কের পক্ষেই সম্ভব, যাহাদের স্যুটকেশ ভরা অফুরন্ত টাকা থাকে, আর থাকে একটি শিক্ষিতা মার্জ্জিতা-রুচি সুন্দরী প্রেয়সী। এবং স্যুটকেশের টাকাও ফুরায় না, প্রেয়সীর ভালবাসায়ও ভাঁটা পড়ে না, স্বপ্নের আবেশেই জীবনটা কাটিয়া যায়। কিন্তু আমরা তেমন ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। যদিও বা আরও পাঁচজন অল্পবয়স্ক বাঙালী যুবকের মত ঐভাবে বাঁচিবার দুর্দমনীয় আগ্রহ লইয়া জন্মিয়াছিলাম কিন্তু বাঁচিবার মত সঙ্গতি ছিল না। তাই বাবার মৃত্যুর পর সংসারের যাবতীয় ভার যখন আমার উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহারই গুরুভারে নতশিরে পথ চলিতে গিয়া মনে হইত, কোথায়ই বা জীবনের সেই স্বপ্নমুগ্ধ গতি আর কোথায়ই বা জীবনের কাল্পনিক "বৃহত্তর জগৎ"—সবই ফাঁকি। এতদিন শুধু একটা বিরাট

ফাঁকিদ্বারা নিজেকে প্রবঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। ইহার পর বিশ্বের কর্মরবথশ্মির স্পর্শলাভের জন্য ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিয়া বিশাল জনসমুদ্রের প্রবল গতিবেগে কোথায় হারাইয়া গেলাম কে জানে? তাহার পর মায়ের মৃত্যু যে আমায় কোথায় আনিয়া দিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারিতাম দামোদরের জনশূন্য বালুবেলার সেই পাথরের চিবিটার পাশে বসিয়া। মা বাঁচিয়া থাকিতে চিন্তার ভারটা ছিল তাঁর, কাজের ভার ছিল আমার। কিন্তু মায়ের মৃত্যুতে কাজ এবং চিন্তা দুইটারই ভার যখন আমার উপর আসিয়া পড়িল, তখন যেন অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত আবিষ্কার করিলাম যে সে ভার একাকী বহন করিয়া চলিবার মত শক্তি আমার নাই। শূন্য দৃষ্টিতে স্তব্ধ আকাশের পানে চাহিয়া অন্তরের নানা জটিল প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়াছি কিন্তু পাই নাই। কেবলই যেন মনে হইত নিশ্ছিদ্র কর্ত্তব্যের গুরুভার আমার মনের উপর চাপিয়া বসিয়া আমায় অকালে জীর্ণ করিয়া দিতেছে। জীবনের জনবহুল রাজপথে নিজের একাকী চলিবার অক্ষমতার কথা মনে হইলেই জানিনা কেন বিকাশের কথা মনে হইত। ভাবিতাম এমানুষটার উপর বোধহয় আমার চিন্তার ভার কিছুটা দেওয়া যায়। কেন যে একথা মনে হইত জানি না। অনেক দিন পরে বুঝিয়াছিলাম এমনিই হয়। এক এক সময় চলমান সংসারের পথে এক ধরণের বিচিত্র মানুষের দেখা পাওয়া যায়, যাহার আবির্ভাবের মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তর্যামী ব্যাকুল অঙ্গুলি তুলিয়া বলিয়া উঠেন, "এই সেই, যাকে তুমি খুঁজছ।" বিকাশও আমার অন্তর্যামী নির্দ্দিষ্ট আমার জীবনের অপরিচিত আগন্তুক, তাই আত্মীয়স্বজন-হীন বিদেশে থাকিতে থাকিতে তাহার সহিত নিজের জীবনটাকে সহসা মিশাইয়া দিয়াছিলাম। পরিণামের কথা ভাবিবার অবসরও ছিল না। এবং তাহার সহিত যেকটা দিন এক সঙ্গে ছিলাম, সে কটা দিনের মধ্যে একথা একবারও মনে হয় নাই

যে আমার দুশ্চিন্তার ভার মানুষটিকে যে পরিমাণে দিতে চাহিয়াছিলাম তাহা ও যেমন দিতে পারি নাই, তেমনি তাহার হৃদয়ের গোপন বেদনার ভার গ্রহণ করিবার জন্য মনে মনে যতখানি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম তাহার কিছুমাত্রও সে আমায় দেয় নাই। বোধ হয় ঠিকমত চাহিতে পারি নাই। যে অপরিচিতের দূরত্ব লইয়া সে আসিয়াছিল, তেমনি অপরিচিতের দূরত্ব বজায় রাখিয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়া গেল, এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তাহা অপেক্ষা বেশী অপরিচয়ের দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া অন্তহীন সংসার সমুদ্রে কোথায় ভাসিয়া গেল জানি না, কিন্তু আর কখনও তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই।

কিন্তু থাক সেসব কথা। বৌদির স্নেহমধুর পরিচর্যা এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য বিকাশ ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। এবং তিনমাসেরও বেশী কিছু সময় ভুগিবার পর একদিন সে কারখানায় আসিয়া হাজির হইল। তাহার শরীর তখনও দুর্ব্বল। কারখানার ম্যানেজার তাহাকে কাজের ভার যথা সম্ভব লাঘব করিয়া দিলেন। এবং একদিন দেখা গেল বিকাশের নাইটস্কুল আবার খুলিয়াছে। এবং তাহার পূর্ব্বতন ছাত্রছাত্রীরা অর্থাৎ যাহারা সহসা স্কুল বন্ধ হওয়ার সুযোগে বিদ্যার্জনের সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়া জ্ঞানতীর্থের মধ্যপথে ইস্তাফা দিয়াছিল, তাহারা আবার তাহাদের পুরাতন শ্লেট পেন্সিল বই খাতা লইয়া আগেকার মত কলরব করিয়াই আসিয়া হাজির হইল। অবশ্য আগের অবস্থাটা যদিও আমার দেখা ছিল না, তবু ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহের আধিক্য ও গোলযোগের ঘটা দেখিয়া বুঝিলাম যে ছাত্র হিসাবে তাহারা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। প্রথম জানিতাম না যে ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র কোথা হইতে আসে? কারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সকলেই কারখানার অল্পবেতনের শ্রমিকদের ছেলে। এরং তাহাদের বাপমায়ের মধ্যে এমন নির্বোধ কেহ ছিল না যে মাসের উপার্জ্জন হইতে কিছু খরচ করিয়া মদ না খাইয়া ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ

যোগাইবে। কারণ তাহাদের ছেলেমেয়েরা যে কোনদিন লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না, সে বিশ্বাস তাহাদের সকলেরই ছিল; এমনকি দুই চারিটা ছাত্র বাদে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মনেও সে সংশয় কিছু কম ছিল না। তাই মাঝে মাঝে তাদের অমানুষিক অধ্যবসায় লক্ষ্য করিয়া সন্দেহ জাগিয়াছে যে পড়িবার জন্য এত আগ্রহ ইহাদের পক্ষে বোধ হয় সম্ভব নয়, স্বাভাবিক ও নহে। এবং হঠাৎ একদিন বিস্ময় বাড়িয়া গেল যখন জানিতে পারিলাম যে শুধু বইপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিকের ভার বহন করার দায়িত্বই বিকাশের ছিল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে প্রায়ই বিকাশ তাহার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিজের খরচায় জল খাবা-রের ব্যবস্থা করিত। এবং সেই মহৎ আশার প্রলোভনেই নাইট স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যার্জনের আগ্রহ অত প্রবল ছিল। তবে শুধুমাত্র যে জলখাবারের জন্যই তাহারা আসিত সে কথা বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে। শুনিয়াছিলাম স্কুল খুলিবার প্রথম দিনটায় অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীই শেষোক্ত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া দলে দলে ভিড় জমাইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষাদানের সুকঠোর বিধি ব্যবস্থার ফলে অধিকাংশই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ বিদ্যার অপেক্ষা খাওয়ার উপরেই যাহাদের ঝোঁক প্রবল ছিল, বিকাশ তাহাদের সযত্নে বাদ দিয়া দিয়াছিল। এবং শেষ পর্যন্ত যাহারা থাকিয়া গেল তাহাদের বিদ্যা এবং খাওয়ার প্রতি সমান আগ্রহ, তবে পরিপাক করিবার ক্ষমতার কিছু তারতম্য ছিল। কিন্তু সে যাই হোক সত্যিই ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে তাহারা কোন অংশে হেয় নহে। একটি জিনিষ আমার চোখে আশ্চর্য ঠেকিয়াছিল তাহা এই যে, বিকাশের যে কয়টি ছাত্র ছাত্রী ছিল তাহাদের মধ্যে বাঙালী একটিও ছিল না।

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই বিকাশ তাহার স্বভাব সুলভ

পরিহাসের ভঙ্গীতে বলিল, "বাঙালী ছেলের লেখা পড়া শিখে কি হবে? ওরা ত পেট থেকে পড়ার পরেই শিক্ষিত।"

কথাটা পরিহাস বলিয়া বুঝিতে পারিয়া প্রশ্ন করিতেই বলিল, "আসলে বাঙালীরা আমায় বিশ্বাস কর্তে পারে না। ভাবে ব্যাটার কি মতলব আছে ; নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে কে আর পরের ছেলেকে লেখাপড়া শেখায়।"

প্রথমে কথাটা পরিহাস বলিয়াই মনে হইয়াছিল। পরে দেখিয়াছিলাম তাহা নিছক পরিহাস নয়। অধিকাংশ বাঙালী ছেলেদের মুখে ভাবে এমন একটা কিছু থাকিত যাহার সোজা অর্থ এই যে, "আমরা ত সবই জানি। আমাদের আবার শিখাইবে কি?"

অবশ্য এই কথাটার দ্বারা বাঙালী জাতির প্রতি কোন কটাক্ষপাত করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

কিন্তু একবার কথা প্রসঙ্গে একটি বছর দশেকের বাঙালী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "খোকা তুমি নাইট স্কুলে পড়তে যাও না কেন?" খোকা তৎক্ষনাৎ খোকার পিতার মুখের ভাব অবিকল নকল করিয়া বলিল, "ও স্কুলে পড়ে কি হবে? ও ত ছাতুদের জন্য।"

ছাতু অর্থাৎ অবাঙালীদের জন্য। অবাঙালী মানেই যে ছাতু খায় এবং ছাতুর গুণে মাথায় বুদ্ধি নামক পদার্থটা যে অকালে ছাতুর মত দলা পাকাইয়া যায়, এ তথ্য খোকাটি কোথা হইতে শিখিয়াছিল জানি না। কিন্তু যেখান হইতেই শিখুক শিক্ষাটা যে মোটেই সম্পূর্ণ হয় নাই, সেকথা বুঝাইয়া বলার চেষ্টা করতেই বলিল, "ছাতুরা আর কতটা পড়বে? বড়জোর 1st Book পর্যন্ত।"

কথাটা শুনিয়া হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। হাসি পাওয়া

নিতান্ত অন্যায় নয়। নিজের সম্বন্ধে অহেতুক অহংকারের গর্ব এবং ভিত্তিহীন আত্মাভিমানের ব্যর্থ গর্ব যে মোটেই ভাল নয়, একথা খোকাদের বাবাগুলিকে বুঝাইতে গিয়াও পারি নাই।

সব শুনিয়া তাহারা হাসিয়া বলিত, "পাগল হয়েছেন মশাই, ঐ ছাতুদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে পড়াশুনা করা মানেই Prestige loss করা।" এবং এই ছদ্ম প্রেষ্টিজ ছাতুদের সহিত একাসনে বসিয়া যে হারাইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে, সে বিষয়ে অনেক বাঙালী পিতারাই একমত। তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া এ কথাটা প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই, যে জগৎ জোড়া প্রগতির অগ্রগতির মুখে তাহাদের এই ছদ্ম প্রেষ্টিজের স্থায়িত্ব কতটুকু? কিন্তু সে থাক্, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন কারণ নাই। কারণ তাহা হইলে হয়ত কাহিনীর মূল আখ্যান হইতে দূরে সরিয়া যাইব।

২

মিঃ ঘোষ একদিন কথাচ্ছলে বিকাশের স্কুল সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, সেদিন সেগুলি নেহাৎ রহস্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ কি ভাবিয়া বিকাশের স্কুলে গিয়া হাজির হইলাম। ক্লাসরুমের কোন বিশদ বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই ; কারণ সকল প্রকার বাহুল্য বর্জ্জিত একটি মাটির চালাঘরের মধ্যে একটি অকিঞ্চিৎকর লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়া ক্লাশ হইতেছে। বেঞ্চি গোটাকয়েক ছিল, তাহাতে সামান্য কয়েকটি ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হইয়াও অনেকখানি জায়গা বাঁচিয়া যায়। পরে বিকাশের কাছে শুনিয়াছিলাম বেঞ্চি আগে আরও কতকগুলি ছিল বটে, কিন্তু স্কুল বন্ধ হওয়ার সুযোগে দরজার তালা খুলিয়া কে বা কাহারা কয়েকখানি বেঞ্চি লইয়া গিয়াছে। এবং সম্ভবতঃ সেগুলি রন্ধন কার্যের জরুরী প্রয়োজনে লাগাইয়াছে। কারণ সেগুলি আর ফেরৎ পাওয়া যায় নাই। শিক্ষকের জন্য যে চেয়ারটা নির্দ্দিষ্ট তাহার অবস্থাও খুব ভাল নয়। দেয়ালে একটা পৃথিবীর মানচিত্র ঝুলান আছে। ভারতবর্ষের কয়েকজন কৃতী সন্তানের ছবিও টাঙ্গান আছে।

আমায় আসিতে দেখিয়া সস্মিত মুখে 'এস হে মাষ্টার" বলিয়া ছাত্রদের বেঞ্চিটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আর ত বসবার জায়গা নেই, ওইখানে বস।"

আমি নীরবে একটা বেঞ্চির একপাশে বসিয়া পড়িলাম। বিকাশ তখন ইতিহাস পড়াইতেছিল। আমি আসিয়া পড়ার জন্য

তাহার পড়ান অথবা ছাত্র ছাত্রীদের অখণ্ড মনোযোগ যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না, তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু অবাক হইলাম। আমার অভ্যর্থনার সময় ছেলেমেয়েগুলি একবার মাত্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল মাত্র। কিন্তু আমি বেঞ্চিতে আসিয়া বসিবার পরে বিকাশ যখন পড়াইতে সুরু করিল তখন আর কেহই আমার পানে ফিরিয়াও দেখিল না, অথবা অপরিচিত মানুষের আবির্ভাবের বিষয় লইয়া কাহাকেও গুরুতর জল্পনা-কল্পনাও করিতে দেখিলাম না। বিকাশ ইতিহাস বুঝাইতেছে এবং ছেলেমেয়েগুলা একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। এবং মাঝে মাঝে "মাষ্টার সাহাব" বলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাড়াইয়া বিকাশকে প্রশ্ন করিতেছে। পড়াইতে পড়াইতে বিকাশ যে আমার উপস্থিতি একদম ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এবং সবচেয়ে বিস্মিত হইলাম ছেলেমেয়েগুলার আচরণ দেখিয়া। একদিন মিঃ ঘোষ বিকাশের স্কুলের সম্বন্ধে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্যই নাকি বিকাশের এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। দেশের কল্যাণ সাধনের দুশ্চিন্তা বিকাশের ছিল কিনা অথবা থাকিলে তাহার গুরুত্বই বা কতখানি সে কথা লইয়া চিন্তা করি নাই। শুধু সেই স্বল্পপরিসর স্কুলঘরের মধ্যে শিক্ষাদানরত বিকাশের মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলাম, যাহাতে মনে হইয়াছিল মানুষটা তাহার অন্তরস্থিত একটা সুগভীর ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিয়া তুলিবার জন্য দুরন্ত প্রয়াসে জীবন মরণ পণ করিয়া লাগিয়াছে। ব্যকুলতা যে কিসের তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সেই ব্যাকুলতা প্রকাশের চেষ্টা যে শুধু এই স্কুলঘরটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা ঠিক বুঝিয়াছিলাম। এবং তাহার শিক্ষাদিবার ধারাটাও যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতেছে না সে কথাটা বুঝিবার পরেও মনে হইয়াছে যে আমি

নিজে যে সমস্ত স্কুল কলেজে পড়িয়াছি, তাহাদের মধ্যে যদি বিকাশের মত শিক্ষক অন্ততঃ একজনও থাকিত, তাহা হইলে অনেক ছেলের বিদ্যার্জন সার্থক হইত। একথাগুলি বলিলাম বিশেষ করিয়া তাহার স্কুলের ছেলে-মেয়েগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের প্রতি তাহার গভীর দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া এবং সে বিষয়ে তাহার প্রবল আগ্রহ দেখিয়া। নানা কথার মধ্য দিয়া সেই অনভিজ্ঞ শিশুগুলিকে প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য সস্নেহ অনুরোধ এবং আদেশ শুনিয়া মনে হইল, ইহার আগাগোড়া সবকিছুর মধ্যেই একটা দৃঢ় সংহতি আছে, যাহা নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কোন অসম্ভবের প্রত্যাশায় সে যে এই দুরূহ কাজের ব্রত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপহাস এবং উপেক্ষার পাত্র হইয়াছিল তাহা না জানিলেও, এটা বুঝিয়াছিলাম যে আপনার মনের সুদৃঢ় চিন্তাকে সফল করিবার মানসে এমানুষটা পারে না, এমন কাজ নাই। সত্যই বিশ্বকর্মা সে, তাহার সহিত ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে সম্পর্কটাও ঠিক শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক বলিয়া মনে হইল না, বরং সেই সম্পর্কটুকু অতিক্রম করিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে যে নিবিড় স্নেহের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ক্ষীণ আভাষটুকু তাহাদের কথাবার্ত্তা, প্রশ্নোত্তর এবং হাসিঠাট্টার মধ্যদিয়া নিতান্ত নির্বোধের কাছেও ধরা পড়ে। মনে মনে মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিলাম না। ক্লাশ শেষ হইলে যাইবার আগে ছেলে-মেয়েগুলিকে বিকাশ যে ভাবে বিদায় দিল, তাহা দেখিয়া মনে হইল, যে সাধারণ স্কুল কলেজের কোন শিক্ষক যদি কোন ছেলেকে এইভাবে বিদায় দিতে পারিতেন, তাহাহইলে সেই ছাত্রের মনের মধ্যে সেই শিক্ষকের স্থান চিরদিনের জন্য অক্ষয় হইয়া থাকিত। ছেলেমেয়েগুলি একে একে 'আদাব, সেলাম, নমস্তে,' জানাইয়া চলিয়া যাইবার পর দরজায় তালা লাগা-ইতে লাগাইতে বিকাশ বলিল, "তারপর মাষ্টার এখানে কি মনে করে?"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ হইতেই বিকাশ, তাহার স্কুলঘর, তাহার ছাত্রছাত্রী, তাহার ব্যক্তিজীবন, প্রভৃতি অসংলগ্ন বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়া চলিয়াছিলাম।

বিকাশের কথায় সে চিন্তাজাল ছিন্ন হওয়াতে বলিলাম, "না এমনি।"

"দেখতে এলে কেমন পড়াচ্ছি নাকি?"

বলিলাম, "না। আচ্ছা বিকাশ এই যে ছেলেমেয়েগুলির জন্মে এত পয়সা খরচ কর্ছ এতে লাভ কি?"

হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই কথাটাই ভাবছিলে নাকি এতক্ষণ ধরে?"

বলিলাম, "না, তা নয়। কথাটা হঠাৎ মনে হল। কিন্তু সত্যি জবাব দাও ত কি হবে এসবে?"

হাসিতে হাসিতে বলিল, "পরকালের কাজ হবে মাষ্টার। সস্তায় স্বর্গলাভ করার চেষ্টা কর্ছি।"

কথাটা শুনিয়া আমিও একটু হাসিয়া বলিলাম, "স্বর্গলাভের এ পথটা যে নেহাৎ সস্তা নয় তা আমি জানি। ঠাট্টা রেখে বলত এতে কি লাভ?"

তরল কণ্ঠে বলিল, "কেন লাভ না হলে কোন কাজ কর্তে নাই নাকি?"

বলিলাম, "আমি তা বলছি না, আমি বলছি এই যে স্কুল করেছ, ছেলেমেয়েদের বই কিনে দিয়েছ, আরও অনেক কিছু করেছ, এর উদ্দেশ্যটা কি?"

উত্তর দিলে, "সব কাজের পিছনেই একটা উদ্দেশ্য থাকবে এই-টাই কি নিয়ম নাকি?"

বলিলাম, "সাধারণতঃ তাই হয়ে থাকে, সবাইত তাই বলে।"

তেমনি হাসিমুখেই বলিল, "আমি কিন্তু সে সব কথা বিশ্বাস করি না মাষ্টার। উদ্দেশ্যবিহীন কাজও দুই একটা কর্তে হয়, নাহলে জীবনটা নেহাৎ বিস্বাদ লাগে।"

বলিলাম, "এই তোমার ভারি বদ স্বভাব। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্লে কখনও তার সোজা জবাব দেবে না তুমি?"

বলিল, "বাঁকা কথা ত কিছু বলিনি মাষ্টার। তুমি নিজেই বুঝতে ভুল করেছ। সত্যি কথা বলতে কি এ স্কুলটা যে করেছি তার পিছনে খুব যে একটা বড় উদ্দেশ্য আছে তা নয়। কিন্তু একটা কিছুত কর্তে হবে। তাই স্কুলটা খুলেছি।"

বুঝিলাম এখনও তাহার পরিহাস-রসিকতা কমে নাই। তবুও কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ কোন কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে সে প্রশ্নের উত্তর সে কখনই দেয় না। বিশেষতঃ জোর করিলে কোন কিছুই পাওয়া তার কাছে সম্ভব নয়, ইচ্ছা হইলে উত্তর দিবে, না হইলে কোন কথাই বলিবে না।

আমায় চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া বলিল, "অন্য কোন লোক এ প্রশ্ন কর্লে তাকে যে জবাব দিতাম, সে জবাব তোমায় দেওয়া চলে না। Because I don't like to cheat you. তুমি জিজ্ঞাসা কর্ছ স্কুল কেন কর্লাম এই ত!"

উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।" বলিল, "দেখ আমার সব কথাত তুমি জান না। কারণ বলিনি কখনও। আজও তা বলতে চাই না। শুধু এইটুকু জেন যে এছাড়া আর কোন পথ নেই। My salvation lies in this way.

বলিলাম, "Salvation এর জন্য তুমি অত চিন্তা কর তাত

বুঝিনি। তবে মনে হয়—”বাধা দিয়া বলিল, “মনে হয় আমি তোমায় bluff দিচ্ছি। কিন্তু আসলে তা নয়। আসলে মনে হয় আমি যে এত পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখলাম, তাকি সম্পূর্ণ হবে না? যদি সম্পূর্ণ হতে হয় তাহলে আমার এছাড়া কোন উপায় নেই। লেখাপড়া শিখে লাভ কি যদি কাউকে নাই শেখালাম।”

যুক্তি হিসাবে কথাগুলি যে খুব মূল্যবান নহে তাহা বুঝিলাম। এবং রহস্য করিয়া বলিলাম, “তাহলে ত আমার M.sc. পড়ার কোন মানে হয় না।”

হাসিয়া বলিল, “ঠিক তা নয়। কারণ তোমার উপর একটা দায়িত্ব দেওয়া আছে, সংসারে তোমার ভাইবোন আছে যাদের জন্য তোমায় খাটতে হবে। কিন্তু আমার কে আছে? None. কিন্তু প্রত্যেক মানুষকেই কাজ কর্ত্তে হয়, যদি কাজ না থাকে ত জোগাড় করে নিতে হয়। Every man must have something to do.”

সে আরও কতকগুলা অসংলগ্ন কথা বলিতে যাইতেছিল। তাই বাধা দিয়া বলিলাম, “তুমি যে কাজের কথা বল্লে তাহল কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি নিজে যা কর্চ্ছ তাত ঠিক কর্ত্তব্য নয়।”

কথাটা বোধ হয় তাহার মনের মত হইয়াছিল, বলিল, “Exactly it is my duty. এটা আমার কর্ত্তব্য এবং এটা আমি কর্ত্তে বাধ্য।”

চিরদিনই সে এইভাবে কথা বলে। কোন কথাই গুছাইয়া বলিতে পারে না, একটা কথা বলিতে আরেকটি বলে; বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিতে গিয়া এমন কয়েকটা কথা বলিয়া বসে যাহা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়ের কোঠায় পড়ে। কথায় কথায় মেসের

কাছে আসিয়া পড়িলাম দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ওহো ! একটা জিনিষ ভুল হয়ে গেছে। আমার একবার ফিতে হবে। আমি চলি—"বলিয়া পা বাড়াইবার পূর্বে বলিয়া উঠিল—

"মাষ্টার, তুমি যা জানতে চাইছ তার উত্তরে একটা কথা বলতে পারি, সেটা হল একটা কিছু নিয়ে মানুষের মত আমি বাঁচতে চাই।" বলিয়া সবেগে চলিয়া গেল। এবং তাহার রহস্যময় অন্তরের বিস্ময়জনক অভিব্যক্তি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেসে ঢুকিয়া পড়িলাম। মনে হইল বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য যে সীমাহীন ব্যাকুলতা মানুষটার বলিষ্ঠ চিত্তকে এমনি করিয়া আলোড়িত করিতেছে, না জানি সে ব্যাকুলতার সুনির্দ্দিষ্ট কারণটি কি ?—

কারখানা শ্রমিকদের যে সঙ্ঘ ছিল, বিকাশ ছিল তাহার সেক্রেটারী। শ্রমিক সঙ্ঘের কাজ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। শুধু সহরে থাকিতে সময়ে সময়ে ধর্মঘট উপলক্ষে শ্রমিকদের মিছিল দেখিয়া মনে হইত হয়ত বা ধর্মঘট করাটাই শ্রমিক সঙ্ঘের একমাত্র কাজ। বিকাশ যে সেক্রেটারী সে কথা জানিতাম বটে, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ আছে কিনা তাহা সঠিক জানিতাম না। এবং এ সমস্ত কথা লইয়া তাহার সহিত কখনও আলোচনা করি নাই। যদিও আমি নিজে শ্রমিক সঙ্ঘের সভ্য কিন্তু সে শুধু কারখানার কর্মচারী হওয়ার দাবীতেই। এবং শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধুমাত্র চাঁদার খাতায় সই করা ছাড়া বেশী কিছু ছিল না। এবং কানাঘুষায় শুনিয়াছিলাম বিকাশ সঙ্ঘের একজন সর্বজনমান্য কর্মী, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই।

এখন অগ্রহায়ণ মাস। আকাশে বাতাসে আসন্ন শীতের আভাষ-টুকু সবেমাত্র লাগিয়াছে। এই সময়টা হইতে বসন্তকাল পর্যন্ত এই জায়গার আবহাওয়ার মধ্যে একটা নূতনত্ব জাগিত। গ্রীষ্মের দাবদাহ কবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর বর্ষার অকৃপণ দাক্ষিন্যে তৃণ-শূন্য মাঠগুলি সবুজের শ্যামল আচ্ছাদন পরিয়া নবরূপে সাজিয়াছে। শরতের স্পর্শে সে রূপের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে—ম্লান আকাশের নিবিড়কৃষ্ণ মেঘের যবনিকা কে যেন উৎসব শেষের আড়ম্বরের মত সরাইয়া লইয়াছে—উদার উন্মুক্ত আকাশের বুকে শরতের বিত্ত-বিহীন মেঘের উদ্দেশ্যবিহীন আনাগোনার মধ্য দিয়া মালিন্যমুক্ত আকাশের সুনীল প্রসার পরিব্যপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবং আসন্ন শীতের আগমন-সঙ্কেতে প্রকৃতি যেন আপনার পক্ষপুটে ঢাকা পৃথিবীকে গোপনে গোপনে সতর্ক করিয়া দিতেছে। দীর্ঘদিনের সঞ্চয় ক্ষণিকের হস্তাবলেপনে বুঝি বা হারাইয়া যায়, সেই ভয়ে উদাসী পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে তাহার সতর্কবাণী একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্যের আলোতে ও যেন একটা সকরুণ বিষণ্ণতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

কারখানার ল্যাবরেটরীতে বসিয়া আমি এবং মিঃ ঘোষ কথা-বার্ত্তা বলিতেছিলাম, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। একজনের মুখে খবর পাইলাম যে সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যাণ্টের শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানার সহকারী ম্যানেজারের কি যেন ঝগড়া হইয়াছে। মিঃ ঘোষ একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেরেছে রে; ওখানে গোলমাল লাগলেই ত হয়েছে।"

বলিলাম, "কেন?"

বলিলেন, "ওখানে সব পাঠান আর পাঞ্জাবী লেবার; একটু এদিক ওদিক হলেই ডাণ্ডা চালিয়ে দেয়। ওদের সঙ্গে আবার কি হল? চলত দেখি।"

দুইজনে সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যাণ্টের কাছে আসিয়াই দেখি বেশ লোকজন জড় হইয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের সকলের মুখেই একটা অদম্য কৌতুকের চাপা হাসি। আমাদের আসিতে দেখিয়া সকলে রাস্তা ছাড়িয়া দিল এবং ভিতরে ঢুকিয়াই চক্ষু স্থির; দেখি সেই দীর্ঘদেহ পাঠান এবং পাঞ্জাবী ওয়ার্কারগুলো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছে, পরণে শুধু একজোড়া রবারের বুট-জুতা। তাহাদের সামনে কারখানার ইংরাজ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মুখচোখ লাল করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া,

আছে। ভাবে মনে হইল বাদানুবাদের পালাটা ইহার আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া লোকগুলা তাহার উপস্থিতি গ্রাহ্যও না করিয়া আপনার খেয়ালে কাজ করিয়া যাইতেছে।

মিঃ ঘোষের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি বলুন ত ?"

মিঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাটাদের মাথায় বোধ হয় ভূত চেপেছে।" বাস্তবিক পক্ষে অতগুলি বয়স্ক মানুষকে অমন অসংকোচে সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে নগ্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলে তাহাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না যে পাঠানগুলো মুসলমান হইয়াও কি করিয়া উলঙ্গ হইল। মুসলমানের পক্ষে বিবস্ত্র হওয়া তাহাদের শাস্ত্রের নিষেধ—কথাটা তাহাদেরই কাছে শোনা। সাহেব কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একজনকে ডাকিয়া কঠিন কণ্ঠে বলিল, "তুম লোক কাপড়া নেহি প্যায়নে-গা ?"

সে লোকটা হাতের শাবলটাকে বাগাইয়া ধরিয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, "নেহি।"

সাহেব বলিল, "কেঁও তুমলোক নাঙ্গা হোকে আয়া হ্যায় ?"

দু-একজন বলিল, "ফোরম্যান সাহেবকা হুকুম।"

কথাটা শুনিয়া সাহেব যেন চমকিয়া উঠিলেন, সেইসঙ্গে আমরা দুইজনও। ফোরম্যান অর্থাৎ বিকাশ। সে সম্প্রতি কারখানাকে আগুনের হাত হইতে বাঁচাইয়া ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যানের পদ হইতে জেনারেল ফোরম্যানের পদে উন্নীত হইয়াছে। সেই সঙ্গে মাহিনা এবং মর্যাদা দুই বাড়িয়াছে। তাই তাহারই হুকুমে লোক-

গুলা দিগম্বর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম.। সাহেব ত কথাটা শুনিয়া রাগে ফাটিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "what, you dirty rogues !"

তাহার অর্দ্ধোচারিত ইংরাজী কথাগুলির মধ্যে একটা পাঠান তাহার হাতের ডাণ্ডাখানা সাহেবের নাকের সামনে ঘুরাইয়া সাহেবের কণ্ঠস্বরের অপেক্ষা দ্বিগুণ জোরে হাঁক ছাড়িয়া বলিল, "খামোশ! গাধেকা বাচ্চা, আঁখ মৎ দেখাও।"

সাহেব কি বুঝিল জানি না। ভিড়ের মধ্যে চাহিয়া কাহাকে যেন বলিল, "জেনারেল ফোরম্যান কো বোলাও!"

লোকটা চলিয়া গেল। খবর পাইয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া বিকাশ আসিয়া দাঁড়াইল। ওয়ার্কমেনগুলা তাহার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া নিজের নিজের কাজে মন দিল। সাহেব দুর্জয় ক্রোধে অস্থির হইয়া বলিলেন, "Roy, did you tell these men to come like this ?"

বিকাশ শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "yes sir." উত্তর শুনিয়া সাহেব যেন রাগে কথা হারাইয়া ফেলিল; আমরাও শঙ্কিত বক্ষে বিকাশের উত্তর শুনিয়া পরিণামের কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সাহেব বলিল, "why did you say like that. ?"

বিনা দ্বিধায় বিকাশ প্রত্যুত্তর করিল, "Because, you told me yesterday." উত্তর শুনিয়া সাহেবের যে অবস্থা হইল, তাহাতে মনে হইল বুঝি উপায় থাকিলে বিকাশকে এইখানেই পুঁতিয়া ফেলিত।

বলিল, "Did I tell you that ?"

বিকাশ বলিল, "ofcourse, you did !" এবং কথাবার্তার

যাহা বুঝিলাম, তাহার অর্থ এই যে, সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যাণ্টে যাহারা কাজ করে, ফ্যাক্টরী হইতে তাহাদের কাজ করিবার জন্য জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করা হয়। অধিকাংশ শ্রমিকদের জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তাহারা বিকাশকে জানায়। এবং বিকাশও তাহাদের সে দাবী যথাস্থানে পেশ করে অর্থাৎ এই সাহেবটাকে জানায়। ফ্যাক্টরীর কর্মচারীদের মধ্যে এই লোকটিই সকলের অপ্রিয় ছিল নানা কারণে। এবং কথা প্রসঙ্গে সে জামা কাপড় দিতে অস্বীকার করায় বিকাশ বলে যে তাহা হইলে তাহারা কি পরিয়া কাজ করিবে। প্রত্যুত্তরে সাহেব বুঝি বলিয়াছিল, "Tell them to come naked!" এবং তাহা শুনিয়া বিকাশ সাহেবকে "Thank you sir." বলিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর আজ এই কাণ্ড। যুক্তি হিসাবে বিকাশের কথাগুলি অকাট্য। এবং সাহেব কিছু বলিতে না পারিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, "See me in the office immediately, I will sack you."

বিকাশ হাসিমুখে বলিয়া উঠিল, "All right, all right, I am coming." বলিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে যে লোক-গুলি কাজ করিতেছিল তাহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিল, "শালা কেয়া বোলা?" বিকাশ তাহাকে সাহেবের জবানী হিন্দুস্থানীতে শুনাইতেই লোকটার মুখ যেন প্রচণ্ড রাগে লাল হইয়া গেল। বলিল, "আপকো নোকরী খা লেগা ও গাধেকা বাচ্চা!" বলিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে বিকাশও স্মিতহাস্তে বলিল, "দেখা যায়গা কেয়া হোগা?" একটা দীর্ঘদেহ পাঠান ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে বলিল, "আগর সাব আপকা নোকরী খায়েগা ত, ইস কারখানেকা একঠো টিনাভি নেই

রহেগা। ইয়ে বাত ও শালাকো সমজা দেনা বাবুজী।"
বিকাশ কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। এবং যাইবার পূর্বে লোকগুলা এক-যোগে বলিয়া উঠিল, "চলিয়ে সাব, হামলোক ভি চলেঙ্গে আপকো সাথ্।" বলিয়া সেই অবস্থায় কেহ একটা শাবল লইয়া, কেহ হামার লইয়া, কেহ বা শুধু ডাণ্ডা লইয়া দল বাধিয়া বিকাশের পিছু পিছু চলিল। সে দৃশ্যটা সত্যই দেখিবার মত বটে। মনে হইল স্বর্গ হইতে মহাদেব তাঁহার প্রমথ-সঙ্গীদল লইয়া দিগ্বিজয়ে চলিয়াছেন। সাহেব যখন বিকাশকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার ভয় দেখাইল, তখনই মিঃ ঘোষ আমায় বলিয়াছিলেন, "সর্বনাশ হল। চাকরী যাওয়াত দূরের কথা, যদি বিকাশকে ব্যাটা ধমক টমক দেয় তাহলে কাল আর তাকে আস্ত পাওয়া যাবে না।"

কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "বলেন কি?"

হাসিয়া বলিলেন, "বলি ঠিকই, এর আগেও একবার এই কাণ্ড হয়ে গেছে কিনা?" ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তাহা দেখিবার জন্য আমরাও আফিসঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিকাশের প্রমথ সঙ্গীরা পা ছড়াইয়া মাটিতে বসিয়া দুর্বোধ্য ভাষায় গুন গুন করিয়া গান করিতে লাগিল। অফিসের ভিতরে কি ঘটিল বুঝিতে পারিলাম না। শুধু একবার বিকাশের সঙ্গে সাহেবের কথা কাটাকাটি হইতে হইতে সাহেবের "Shut up" বলিয়া চীৎকার শুনিয়া, বাহিরের লোকগুলা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এমন হল্লা সুরু করিয়া দিল যে, বিকাশকে বাহিরে আসিয়া থামাইতে হইল।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "ব্যাপার সুবিধের নয় বোধ হয়।" কিন্তু সে যাত্রা কিছুই হইল না। কিছুক্ষণ পরে বিকাশ ঘরের বাহির হইতেই লোকগুলা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া কি যেন জিজ্ঞাসাবাদ

করিতে লাগিল এবং বিকাশও কি সব বুঝাইয়া বলিল; সব কথা বুঝি নাই। শুধু লোকগুলা বিকাশের কথা আগাগোড়া শুনিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বিকাশকে যখন প্রশ্ন করিল, "তব্ হামলোক যাকে কাপড়া প্যায়নেগা ?"

তখন বিকাশ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ যাও কাপড়া প্যায়ন লো ?" এই দুটি কথা মনে আছে। লোকগুলি অত্যন্ত খুশী মনেই ফিরিয়া গেল।

ঘটনাটি সামান্য। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটির মধ্য দিয়া কারখানার অবাঙালী অশিক্ষিত শ্রমিকদের উপর বিকাশের অদ্ভুত অধিকার দেখিয়া অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বেশ বুঝিয়াছিলাম যে এই লোকগুলার কাছে মানুষটি এমনই একটা আসন লাভ করিয়াছে, যে আসন হইতে তাহাকে স্থানচ্যুত করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। অথচ ইহা যে কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাও নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারি নাই। ঘটনাটাও ভুলিতে পারি নাই। এবং বোধ হয় কারখানার কর্মকর্তারাও ভুলিতে পারেন নাই।

প্রথমেই বলিয়াছি কাহিনী লিখিতে বসিয়া দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ দিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অতএব সে চেষ্টা করিব না। শুধু যে কয়েকটি ঘটনার মধ্যদিয়া একটি মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়াই মানুষটির কথা জানাইবার চেষ্টা করিব। বিকাশের বিগত জীবনের সম্বন্ধে আমার কৌতুহল প্রবল হইলেও সে সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। অবশ্য কিছুটা তাহার নিজমুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তবুও মনে হইত ইহা ছাড়াও তাহার হৃদয়ে অদৃষ্টের এমন কোন নির্মম আঘাতের ক্ষত চিহ্ন আছে,

যাহা অনাবৃত করিবার কোন ইচ্ছাই তাহার নাই। বরং সযত্নে তাহা গোপন করিয়া চলিবার কৌশলটুকু দীর্ঘদিনের চেষ্টায় আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, অনাড়ম্বর ভাবেই গোপন রাখিয়া চলে। কি যে গোপন কথা তাহা সম্পূর্ণ না জানিলেও কিছুটা আন্দাজ করিয়াছিলাম। এবং একটি স্তব্ধ দুপুরের নির্জ্জনতার সুযোগে আমার অশোভন কৌতুহলের বশে তাহার স্যুটকেশের মধ্যে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম, সেই অপরিচিতা নারীটির সঙ্গে জড়িত বিকাশের জীবনের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া মনের মধ্যে একটা অশান্তি অনুভব করিতাম। হৃদয় ঘটিত দৌর্বল্যের চিহ্ন যে তাহার অন্তরের মধ্যে আছে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিলাম, অথচ আসল সত্যটি সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি নাই।

আমাদের মেসে একটি ছেলেছিল, তাহার নাম সুজিত দত্ত। ছেলেটির বয়স বছর ১৯।২০ হইবে। অত লাজুক এবং স্বল্পভাষী ছেলে সমস্ত কারখানায় কেহ ছিল না। আমি কারখানায় ঢুকিবার মাস আষ্টেক আগে সে আসিয়াছে। তাহার সারল্যমাখান কিশোর মুখখানির মধ্যে এমন একটা লাবণ্য ছিল যে, সে মুখের পানে চাহিলেই একটা অজ্ঞাত বেদনায় মনটা আকুল হইয়া উঠিত। এবং অজ্ঞাতসারেই তাহার প্রতি একটা স্নেহমিশ্রিত করুণার সঞ্চার হইত। তাহার সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ ছিল না। শুধু বিকাশের মারফৎ তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। এবং একমাত্র আমিই জানিতাম যে এই অল্প বয়স্ক অনভিজ্ঞ বালকটির প্রতি বিকাশের কি গভীর স্নেহ ছিল। বিকাশের মুখেই শুনিয়াছিলাম ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার মাস কয়েক আগে ছেলেটির বাবা হঠাৎ মারা যান; ফলে ছেলেটি আর পরীক্ষা দিতে পারে নাই। চাকরীর সন্ধানে বাহির হইয়া কি করিয়া বিকাশের সঙ্গে দেখা হয় এবং সেই তাহাকে আনিয়া কারখানায় ভর্ত্তি করাইয়া দেয়। বাড়ীতে তাহার বিধবা মা আছেন, একটি ছোট ভাই আছে এবং অল্পবয়স্ক অবিবাহিত ছোট বোন আছে। এবং এই চারজনের সংসারের গুরুভার আসিয়া পড়িয়াছে এই অল্পবয়স্ক বালকটির উপরে। তাহার মাহিনা ছিল ১২০৲ টাকা, এবং সেই টাকা হইতে মাত্র ৩০৲ টাকা সে নিজের জন্য রাখিয়া বাকী সব টাকা বাড়ীতে পাঠাইত। অর্থাৎ নিজের খাওয়া দাওয়ার খরচ বাদে মাত্র ৫৲ টাকা

লইয়া সে মাস চালাইত। অল্পবয়সে কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; মুখে চোখে কঠোর দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। ছেলেটি নিজের দৈন্যের সম্বন্ধে এত সচেতন যে সর্বত্রই সে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত এবং কারখানা হইতে মেসের খাওয়ার জায়গা পর্যন্ত তাহার কুণ্ঠিত কথাবার্ত্তা এবং আচার ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার বেদনাকরুণ চাহনির মধ্য দিয়া তাহার কুণ্ঠিত আচরণের মধ্যদিয়া, যেন অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র বাঙালা-দেশের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিত। ভাবিতাম না জানি এমনি আরও কত সুজিতের মূক বেদনার অকথিত আবেগে বাঙালাদেশের আকাশ বাতাস ভারী হইয়া আছে। তাহার গলার স্বর কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মেসের অন্যান্য ছেলেরা যখন অকারণ উচ্চহাস্য বা অশ্লীল গান করিয়া মেসের মধ্যে হট্টগোলের সৃষ্টি করিত তখন সে নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়া চুপচাপ শুইয়া থাকিত। এমন অবস্থায় যাহা স্বাভাবিক তাহা কিন্তু হয় নাই অর্থাৎ তাহার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অকারণে তাহাকে কেহ বিরক্ত করিতে সাহস পাইত না। কারণ জানিত বিকাশের সজাগ দৃষ্টি সর্বদাই তাহার উপর নিবদ্ধ আছে। অথচ আশ্চর্য্য এইযে ছেলেটাকে কখনও কোন কারণে বিকাশের কাছে আসিতে দেখি নাই। বিকাশ যে তাহাকে চাকরী দিয়াছে এবং বিকাশ যে তাহার অপেক্ষা অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একথা বুঝিতে পারিয়া সে সর্বদাই বিকাশের সঙ্গে সম্ভ্রম জনক দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিত। আমার সহিত কথাই বলিত না। মনে মনে ছেলেটাকে আমি সত্যই বড় ভালবাসিতাম। কিন্তু কোনদিন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি নাই। তাহাকে দেখিলে আমার ছোট ভাইটির কথা কেবলই মনে পড়িত। সে আপন মনের বেদনা লইয়া সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া

থাকিত যে, মনে হইত বুঝি কাছে ডাকিলে কাঁদিয়াই ফেলিবে।

পৌষমাসের শেষাশেষি একদিন কারখানায় কাজ করিতে করিতে সুজিত হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। খবর পাইয়া আমিও গেলাম। গিয়া দেখি বিকাশ আমার আগেই হাজির হইয়াছে। এবং গভীর মনোযোগের সহিত তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া আমার পানে চাহিয়া চিন্তিত মুখে বলিল, "কি ব্যাপার বুঝছি নাত ? বেশ টেম্পারেচার রয়েছে দেখছি, অথচ—" কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই সুজিতকে দুহাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ম্যানেজারকে ব্যাপার বুঝিয়ে বলো; আর বলে দিও আমি তাকে নিয়ে মেসে যাচ্ছি।" বলিয়া চলিয়া গেল। আমিও তাহার কথা মত ম্যানেজারকে গিয়া সব কথা জানাইলাম। বিকালবেলায় মেসে ফিরিয়া দেখি বিকাশের ঘরে বিছানার উপর সুজিত শুইয়া আছে, কপালে ওডিকোলন দেওয়া। মাথার কাছে বিকাশ বসিয়া বাতাস করিতেছে। কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখি সুজিতের দুই চোখ লাল হইয়া আছে এবং অস্ফুটে কি সব বলিতেছে। শুনিলাম তাহার টেম্পারে-চার নাকি ১০৫"।

আমি ঘরে ঢুকিতেই বিকাশ ভীতকণ্ঠে বলিল,"ডিলিরিয়াম সুরু হয়েছে মাষ্টার। কি করা যায় বলত ?"

কথাটা শুনিয়া আমারও ভয় হইল। বলিলাম, "ডাক্তারকে খবর দিয়েছ ?"

মাথা নাড়িয়া বলিল, "তিনজনকেই দিয়েছি; কোন শালাই এখনও আসেনি।"

এখানে ডাক্তার ছিলেন তিনজন। কারখানার হাঁসপাতালের ডাক্তার একজন, বাকী দুজন লোকাল প্রাকটিস্ করেন। একজন M.B. এবং অপরদুজন L.M.F. এবং তিনজনের কেহই আসিয়া পৌছান নাই

বলিলাম, "আচ্ছা আমি নিজে একবার যাচ্ছি। তুমি বস।"

আসিবার সময় চুপিচুপি বলিল, "হাঁসপাতালের ডাক্তারকে যদি না পাও ত, বাকী দুজনকে ধরে এনো। যদি আসতে না চায় আমার নাম করে বল যে আমি ডেকেছি।" বলিয়া অনুপস্থিত ডাক্তার তিনজনের সম্বন্ধে এমন একটি গালাগাল ব্যবহার করিল যাহা শুনিয়া আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

বলিলাম, "অত চটে আছ কেন ?"

বলিল, " দুপুর বেলায় শালাদের ডেকে পাঠালাম, এক বেটা খাচ্ছে, একটা ঘুমোচ্ছে। আরেকটা বলেছে বুঝি busy—দাঁড়াও না স্থজিত একটু ভাল হক্, মজা দেখাচ্ছি শালা লাটের বাচ্চাদের। ডাক্তারের গুষ্টির—"কথাটা শেষ করিল একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়া।

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "অত উতলা হোও না বিকাশ। আমি যাচ্ছি দেখি কি হয় ?'

আমি যাইতেই ডাক্তার তিনজনেই যেন লাফাইয়া উঠিলেন, এবং আমার মুখে রোগী ও রোগের কথা শুনিয়া তিনজনেই আসিয়া হাজির হইলেন। রোগের সময় ডাক্তারের উপস্থিতির প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু মুস্কিল হইল তাঁহাদের তিনজনের একসঙ্গে আগমনে। তিনজন তিরিশ রকমে রোগীকে নাড়িয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়া কি যে বুঝিলেন জানি না। তবে কেহই যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হন নাই; তাহা তাহাদের মুখ দেখিয়া এবং কথা-বার্ত্তা লক্ষ্য করিয়াই বুঝিলাম। এবং বেশ কিছুটা সহজ ভাবেই বলিলেন যে রোগ কিছু মারাত্মক নয়; খুব সম্ভব Sun-stroke হইয়াছিল। এবং জরটা আহারই আনুষঙ্গিক মাত্র। এবং আগামী

সকাল বেলাতেই যে এ জ্বর নিশ্চয়ই ছাড়িয়া যাইবে এমন আশাও দিলেন। এবং সত্যই সন্ধ্যার সময় সুজিতের অল্প জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। এবং সেই সময় বিকাশকে মাথার কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "স্যার আপনি এখানে ?"

সুজিত বিকাশকে যে সম্বোধন করিয়া ডাকিল তাহাতে বেশ বুঝিলাম রোগশয্যার মধ্যে থাকিয়াও ছেলেটা নিজের সঙ্কোচজড়িত মনোভাবকে ভুলিতে পারে নাই। বিকাশ হাসিয়া তাহার রুক্ষ চুল গুলির মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিল, কোন কথা বলিল না। তিনজন ডাক্তার দেখিয়া সুজিত শঙ্কাতুর চাহনি মেলিয়া বিকাশকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অসুখটা খুব খারাপ নাকি স্যার ? এত ডাক্তার ?"

বিকাশ সস্নেহ কণ্ঠে বলিল, "না, না ; অসুখ তোমার এমন কিছু নয়। তুমি কিছু ভেবনা, সব সেরে যাবে।"

সুজিত আবার বলিল, "কিন্তু ডাক্তারের ফি দেবার টাকা ত আমার নেই স্যার—টাকা—"

সস্মিতমুখে বিকাশ বলিল, "সে তোমার ভাবতে হবে না ; সব ঠিক হয়ে যাবে।" সত্যই রোগশয্যায় ডাক্তার ডাকিবার মত সামর্থ সুজিতের ছিল না। এবং ডাক্তারের ফি যে বিকাশই দিবে তাহাও বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু রোগশয্যায় শুইয়া অর্থের অভাবজনিত অসহায় অবস্থা সুজিতকে যথেষ্ট ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এবং কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল, "কি করে হবে স্যার ? আপনার কাছে ত অনেক টাকাই ধার হয়েছে সে গুলো—"

কথাটা শুনিয়াই বিকাশ চকিত হইয়া তাহার মুখের উপর নিজের ডান হাতখানি রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "চুপ চুপ পাগল কোথাকার !

ওসব কথা এখন নয়।”

কথাটা শুনিয়া আমারও মনের মধ্যে চিন্তার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বিকাশ যে গোপনে ছেলেটাকে অর্থসাহায্য করে আমি ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। ধার বলিয়াই দিয়াছে অন্তত সুজিত তাহাই বলিল। কিন্তু আমি বেশ বুঝিলাম যে সে ধার শোধের কোন আশা না করিয়াই সে টাকা দিয়াছে। কিন্তু বিকাশের কথায় সুজিত বোধহয় বেশী বিশ্বাস করিল না। কারণ সে জানে যে তাহার উপার্জ্জনের যে অংশটা সে বাড়ীতে পাঠায় তাহা হইতে একটি টাকাও সে নিজের জন্য রাখিতে পারে না। এবং সে টাকা হইতে ঋণ শোধ করার কল্পনাও করিতে পারে না। আপনার দরিদ্র জীবনের বিনিময়ে সে যে কোন মানুষের প্রত্যাশাহীন স্নেহ লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে, একথাটা বেচারী একবারও ভাবিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার দিকে জ্বর নামিয়া ১০২° এ নামিয়াছিল বটে কিন্তু রাত্রের দিকে জ্বরটা বাড়িয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার ডিলিরিয়াম সুরু হইল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকও বাদ রহিল না। আমি মেসেই ছিলাম। বিকাশ আমায় ডাকিয়া ডাক্তারকে খবর দিতে বলিল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া কি কয়েকটা ওষুধ দিয়া বলিলেন, “রোগীর বিশ্রামের প্রয়োজন এবং সেইজন্য ইনজেকশনের সাহায্যে ঘুমের ওষুধ দিয়া বলিলেন কিছুক্ষণ ঘুমাইতে পারিলে যন্ত্রণার উপশম হইবে। কিন্তু ওষুধে কোন ফল হইল না। এবং সেই যে সকাল হইতে বিকাশ তাহার বিছানার পাশে বসিয়াছিল, সারাদিনরাত্রির মধ্যে তাহাকে বিশেষ প্রয়োজনে দুই একবার ছাড়া আর উঠিতে দেখি নাই। এবং সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন দরিদ্র

ছেলেটিকে বাঁচাইবার জন্য তাহার অমানুষিক সেবা লক্ষ্য করিয়া একান্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এমনও যে মানুষ পারে তাহা কখনও দেখি নাই। বৌদির মুখে একদিন তাঁহার অসুস্থ অবস্থার মধ্যে বিকাশের সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম যে লোকে বলে মেয়েরাই সেবা কর্তে পারে, কিন্তু বিকাশের সেবা করা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। আজ হঠাৎ যখন সেই সুযোগ আসিয়া হাজির হইল, তখন নির্ণিমেষনেত্রে শুধু চাহিয়া রহিলাম। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় মানুষের সেবা করিবার সময় কোন সঙ্কোচ, কোন কুণ্ঠার আভাসমাত্র দেখিতে পাইলাম না। খাওয়া দাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলিয়া গেল। অনেকে হয়ত বলিবেন, একটা দিনের সেবার মধ্যে এমন কি অসাধারণত্ব আছে! সে কথার প্রতিবাদ করিবার মত মন আমার নাই। কারণ যদি কখনও কোন বিচিত্র অবস্থার মধ্যে বিকাশের মত মানুষের সঙ্গে কাহারও দেখা হয়, শুধু সেই দিনই তাহার স্বরূপটুকু বুঝা যাইবে। হঠাৎ তাহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নির্বুদ্ধিতা। আমিও সেখানে ছিলাম, মেসে অন্যান্য লোকজনও ছিল, কিন্তু কাহাকেও সে একটা অনুরোধও করে নাই। এ যেন শুধু তাহার একলারই কাজ। এর জন্য শুধু তাহাকেই জবাবদিহি করিতে হইবে; তাই নিজের অসুবিধা বা অস্বস্তির কথা ঘুণাক্ষরেও কাহাকে জানায় নাই। আমি নিজে যাচিয়া যখন বলিলাম, "ভাবছি রাত্রে তোমার ঘরেই শোব, যদি দরকার টরকার হয়, আমায় ডেক।" উত্তরে সে শুধু মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা—"

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সুজিত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। এরই মধ্যে কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না।

হঠাৎ কি কারণে ঘুম ভাঙিতেই দেখি বিকাশ তাহার পড়ার টেবিলের কাছে বসিয়া কি একটা বই পড়িতেছে। খাটের উপর সুজিত অকাতরে নিদ্রামগ্ন; রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। অর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখি সে মুখে শ্রান্তি, ক্লান্তি, উদ্বেগের কোন চিহ্ন নাই। কেমন যেন একটা শান্ত সমাহিত ভাব তাহার মুখে এবং ইলেকট্রিকের আলো তাহার মুখে প্রতিফলিত হইয়া তাহার তাম্রাভ মুখের পরে এমন একটা দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল মানুষটা যেন এ পৃথিবীর নয়; সে যেন এক অপরিচিত কল্পলোকের। আমার সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়া যে মানুষটিকে নিয়ত কাছে পাইয়াছি, সে যেন এই মানুষটিই নয়। হঠাৎ সুজিতের অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিয়া বইটা মুড়িয়া বিছানার কাছে গিয়া, তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিবার সময় আমায় জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া সস্মিতমুখে চুপিচুপি বলিল, "ঘুমোও নি মাষ্টার ?"

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, একটুখানি ঘুমিয়েছি—কিন্তু আর ঘুম আসছে না।"

বলিল, "চল বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়াই।"

দুজনে অতি সন্তর্পনে বারান্দায় আসিলাম। এবং আসিবার পূর্বে ঘরের ভিতর হইতে বিকাশ একটি হুইস্কির বোতল সঙ্গে করিয়া আনিল। তাহার মদ খাওয়াটাকে কোনদিনই ভাল চোখে দেখি নাই। কিন্তু আজ যেন মনে হইল তাহার পক্ষে মদ খাওয়াটা অপরাধত নয়ই, বরং ঐটুকু না থাকিলেই যেন তাহাকে মানাইত না। কোন কথা না বলিয়া ছিপিটা খুলিয়া বোতলে মুখ দিয়া

বেশ কিছুটা পান করিয়া, একটা চুরুট ধরাইয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচলাম।

হাসিয়া বলিলাম, "খালি পেটে গোগ্রাসে মদ গিলছ, liver এর মাথাটা খাবে নাকি?"

হাসিয়া বলিল, "liver? আমার Liver লোহার তৈরী। দুচার পেগ হুইস্কিতে আমার কি হবে?" বলিয়া চুরুটে লম্বা টান দিয়া বলিল, "ছেলেটা বড় ভাবিয়ে তুল্লে মাষ্টার।"

বুঝিলাম সুজিতের কথা বলিতেছে। বলিলাম, "ডাক্তার ঠিক করে কিছু বলতে পাচ্ছে না তুমি—"

বাধা দিয়া বলিল, "তাইত! ভাবছি ছেলেটার বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া উচিত। বিধবা মায়ের একছেলে—"বলিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বলিলাম, "খবর দিলে যদি কেউ আসে ত থাকার অসুবিধা—"

কথা শেষ হইবার আগেই বলিয়া উঠিল, তার জন্যে ভাবিনা, আমার বৌদি রয়েছেন যতক্ষণ ততক্ষণ কোন ভয় নেই। কিন্তু—"

ঘরের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া সুজিত যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাগো একটু জল।" চুরুটটা ফেলিয়া বিকাশ ছুটিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালেও সুজিতের জ্বর ১০২° এর নীচে নামিল না। এবং সমস্ত দিনটা সে ছটফট করিয়া কাটাইল। মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে বিকাশকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন সব অদ্ভুত কথা বলিতে লাগিল যে সে সব শুনিয়া ভয় হইল। এবং ভয়টা যে নেহাৎ অমূলক নয় তাহা সন্ধ্যার পরেই বুঝিতে পারিলাম। একটু একটু করিয়া জ্বর বাড়িতে বাড়িতে রাত্রি নয়টা নাগাদ টেম্পারেচার

উঠিল ১০৫°, এযে কি অসুখ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এবং সেই প্রবল জ্বরের ঘোরে সুজিতের ডিলিরিয়ামেরও আর বিরাম নাই, মাঝে মাঝে উঠিয়া বসিতে চায়, বিকাশ জোর করিয়া শোয়াইয়া দেয়। ডাক্তারের কথামত মাথায় বরফ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু জ্বর ছাড়ে না। দেখিলাম বিকাশের প্রশান্ত ললাটেও উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। আরেকবার ডাক্তার ডাকা হইল। এবার ও তাহারা তিনজনে আসিয়া হাজির হইলেন। এবং এবারও রোগ নির্ণয় ব্যাপারে তিনজন তিনজনের ব্যক্তিগত মতামত লইয়া তর্ক সুরু করিয়া দিলেন। এবং তর্ক যে কোথায় থামিত জানি না, হঠাৎ বিকাশ বিকৃত মুখে রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "রাখুন মশাই আপনাদের বিদ্যার বাহাদুরী। কি হয়েছে খুলে বলুন—যত সব"—ডাক্তারদের সামনেই তাহাদের গালাগালি দিয়া কথাটা শেষ করিল।

দেখিলাম ইহাতে সুফল ফলিল। তিনজনে তর্ক রাখিয়া মতামত ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু মুস্কিল হইল যে তিনজনের তিনটে মত হইল। একজন বলিলেন টাইফয়েড্, একজন বলিলেন নিমোনিয়া, এবং একজন বলিলেন ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। অতএব ঔষধের ব্যবস্থাও একরকম হইল না। শেষ পর্যন্ত তিনজন ডাক্তারে মিলিয়া আড়ালে গিয়া কি সব পরামর্শ করিয়া বলিলেন একটা ইনজেকশন দেবার জরুরী প্রয়োজন, কিন্তু সে ঔষধটা তাঁহাদের কাহারও কাছে নাই। এবং সহরে না যাইলে পাওয়াও যাইবে না। কথাটা শুনিয়া রাগে ঘৃণায় আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

বিকাশ এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া বলিল, "টাউনে গেলে পাওয়া যাবে?"

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া একজন বলিলেন, "খুব সম্ভব।"

বিকাশ আমায় বলিল, "মাষ্টার, রামেশ্বরের সাইকেলটা বার করতে বলত, আর তুমি একটু সুজিতের কাছে বস। আমি দেখি ওষুধ পাই কি না।" বলিয়া আমায় কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই একটা সাইকেল লইয়া তীরবেগে সহরের অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল। আমি নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া সুজিতের বিছানার পাশে বসিয়া রহিলাম। বিকাশের নিজের শরীর তখনও কিছুটা দুর্বল, তাহার উপর গতকাল হইতে খাওয়া দাওয়া করে নাই। এবং পৌষমাসের এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ২০ মাইল রাস্তা সাইকেলে করিয়া যাওয়ার কথা মনে হইতেই কেমন যেন একটা ভয় করিতে লাগিল। অনাত্মীয় মানুষের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিবার দুরন্ত দুঃসাহস দেখিয়া মনে হইল সকল মানুষের প্রতি এতখানি মমতা এই পাষাণের বুকে কি করিয়া আসিল জানি না, কিন্তু এই সুগভীর মমত্ববোধের জন্য সে যে জগতের কোথাও নিজের প্রয়োজনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই, এমন কি নিজের জীবনের মায়াও নয়, সে কথাটা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিলাম। এবং মনে মনে বিশ্বদেবতার কাছে রহস্যময় মানুষটির উদ্দেশ্যে বোধ হয় এই প্রার্থনাই জানাইয়াছিলাম যে মানুষটা সকলের সুখের জন্য নিজের সর্বস্ব অত্যন্ত অবহেলার সহিত তুচ্ছ করিতে পারে, তাহার সকল শুভাশুভের ভার তুমি নিজেই গ্রহণ করিও।

রাত্রি ১টার পর হইতে সুজিতের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। সময় যেন আর কাটিতেই চায় না। দুঃসহ যন্ত্রণায় সুজিত ছটফট করিতেছে। এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম না। তাই যন্ত্রণা কাতর দারিদ্র্য-পীড়িত শীর্ণ সুজিতের ছটফটানি

দেখিয়া মনের মধ্যটা একটা নিরুদ্ধ বেদনার আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। এবং নিষ্ফল আক্রোশে টাইমপিশটার পানে চাহিয়া চাহিয়া বিকাশের ফিরিয়া আসিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলাম। ডাক্তারটিও দেখিলাম চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। রাত্রির স্তব্ধ নীরবতা মনের মধ্যে কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা সঞ্চারিত করিয়া দিতে লাগিল। মনে হইল যেন সমস্ত ঘরটা আচ্ছন্ন করিয়া মৃত্যুর নিকষ কালো যবনিকা নামিয়া আসিতেছে। একটা অপরিচিত উদ্বেগে মনটা ক্রমশই অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল—কেবলই মনে হইতে লাগিল কি যেন একটা ঘটিবে, তাহার জন্য এখনই প্রস্তুত হওয়া ভাল। কে যেন নিঃশব্দে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছে, কি যেন ঘটিবে—ভাল কি মন্দ জানি না—। হয়ত অভূতপূর্ব একটা কিছু— বিকাশ কতক্ষণ আগে গেছে ২০ মাইল রাস্তা সাইকেলে যেতে কত সময় লাগে—পথে কোন বিপদ ঘটেনি ত—সুজিতের কাতরোক্তি বাড়িয়া চলিয়াছে মনে মনে অধীর হইয়া উঠিলাম। কিন্তু কিছুইত করিবার নাই। সত্যিই কিই বা করিতে পারি আমি? কিছু করিতে পারিলাম না। রাত্রি ৩া০ টার সময় সুজিত মারা গেল।

(৩)

মৃত্যু আমার জীবনে কিছু নূতন নয়। কিন্তু সুজিতের এই মৃত্যু আমার জীবনে এমনই এক বেদনা জাগাইয়া তুলিল যে নিজেকে সংযত করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল। এবং উঠিয়া গিয়া খোলা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার এই কান্না যে ঠিক সুজিতের মৃত্যুর জন্য তাহা নয়। কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন অকারণে একটা প্রাণ কেন নষ্ট হইয়া যায়? দুঃখ কষ্টের চাপে এমনি করিয়া কত তরুণ প্রাণ অকালেই ঝরিয়া যায়, কেহ বা তাহার খবর রাখে? দারিদ্র-নিপীড়িত উৎসাদিত যৌবনের শুষ্ক মরু-প্রান্তরে গতিহারা হইয়া সুজিতের মত আরও কত অসহায় প্রাণ এমনই অনাড়ম্বর ভাবে শেষ হইয়া যায়। সুজিতের মৃত্যুর মধ্যদিয়া জীবনের একটা প্রচণ্ড ব্যর্থতার স্বরূপ যেন অতি অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, এবং সেই অনিবার্য ব্যর্থতার পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনটা যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল জানি না। হঠাৎ সাইকেলের শব্দ পাইয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া নীচের দিকে যাইতেই দেখি বিকাশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির কাছে যাইতেই দেখি সে ঊর্দ্ধশ্বাসে উপরে আসিতেছে। হাতে ওষুধের বাক্সটা। আমায় দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "খবর ভাল ত মাষ্টার, ওষুধ পেয়েছি।" আনন্দের আবেগে ওষুধের বাক্সটা তুলিয়া দেখাইল। কিন্তু তাহার কথার উত্তরে সহসা কোন কথা বলিতে পারিলাম না। আমার

অন্তরের মধ্যে তখনও কান্নার আবেগ থামিয়া যায় নাই।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলাম, "সব শেষ হয়ে গেছে বিকাশ—"বলিয়া নিজেকে আবার একবার সংযত করিয়া লইলাম।

আমার কথাটা শুনিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বেশ বুঝিলাম মৃত্যুর সহিত শক্তি পরীক্ষার দুরন্ত আশা তাহার মন হইতে এক নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এবং তাহার মুখটা অপরিসীম ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া গেল। রক্তশূন্য মুখে কুঞ্চিত ললাটে আমার পানে চাহিয়া আবিষ্টের মত শান্তস্বরে বলিল, "Finished ?

প্রত্যুত্তরে নীরবে শুধু মাথা নাড়িলাম। এবং পর মুহূর্তেই বিকাশ সশব্দে সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। এবং তাহার বেদনা-ভারাতুর আশাহত অন্তর মথিত করিয়া অস্ফুটে শুধু একটি কথা বাহির হইয়া আসিল, "উঃ, ভগবান!" বিকাশের মুখে কেহ কখনও ভগবানের নামোচ্চারণ শুনে নাই, এবং তাহাকে এতখানি বিচলিত হইতেও কেহ কখনও দেখে নাই। তাই তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমিও নির্বাক দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম। জানি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাও বৃথা। সে শক্তিও আমার নাই, সাহসও নাই। সুজিতের মৃত্যু যে তাহার অন্তরে কি গভীর আঘাত করিয়াছে তাহা আমার অজ্ঞাত নয়। এই অবস্থায় তাহাকে কিছু বুঝাইবার মত চেষ্টা করা যে নিতান্ত ধৃষ্টতা, সে কথা বুঝিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কারণ এত দুর্বল-চিত্তের অসহায় আক্ষেপ নয়, এ শক্তির দ্বন্দ্বে পরাজিত বলিষ্ঠ মানবাত্মার অন্তর্ভেদী হাহাকার। কিছুক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিয়া ক্লান্তপদে উঠিয়া ঘরে গেল। এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম তাহার

চোখে জল নাই। ঘরে ঢুকিয়া ওষুধের বাক্সটা টেবিলের উপর রাখিয়া, সুজিতের বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া, তাহার তৈলবিহীন রুক্ষ চুলগুলির মধ্যে গভীর স্নেহের সহিত হাত বুলাইতে লাগিল। এবং এক সময় নীচু হইয়া সুজিতের মৃত্যুশীতল রক্তশূন্য ললাট চুম্বন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "I am sorry, I am sorry." তাহার মনে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগিয়াছে তাহার কিছুটা প্রশমিত হইতে না পারিলে শান্ত হইবেনা বুঝিয়া ধীরপদে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইলাম। এবং অনেকক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকার পর বিকাশকে ডাকিতে গিয়া কি মনে হইল। দরজার ফুটো দিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখি নিজের দুইহাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া আছে। এবং মুখের যে সামান্য অংশটুকু চোখে পড়িল, তাহাতে সজ্জনক শোকের কঠিন চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিতে পারিলাম না। যেমন করিয়া আসিয়াছিলাম, তেমনি করিয়াই চলিয়া আসিলাম।

পরদিন মৃতদেহ দাহ করিতে করিতে বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। দামোদরের তীরে সুজিতের শেষচিহ্ন চিতার আগুনে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মুখাগ্নি করিল বিকাশ নিজে। এবং স্পষ্ট লক্ষ্য করিলাম মৃত সুজিতের মুখাগ্নি করিবার সময় তাহার বলিষ্ঠ হাতখানি একটু কাঁপিয়া উঠিল এবং চোখের কোনে জল জমিয়া উঠিল। এবং পাছে এতলোকের সামনে তাহার চোখের জল পড়ে এই ভয়ে বাঁহাত দিয়া চোখ দুইটা মুছিতে মুছিতে বলিল, "ধোঁয়ার আগুন একদম সহ্য হয় না মাষ্টার।" বলিয়াই

আমার পানে চাহিয়া অর্থহীন হাসি হাসিল। এবং ভাবে ভঙ্গীতে প্রমাণ করিল যেন ধোঁয়ার জন্যই চোখে জল আসিয়াছে। আমি তাহার এই সতর্ক ছলনাটুকু লক্ষ্য করিয়া তাহারই মত অর্থহীন হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলাম, কোন জবাব দিলাম না। কারণ আমার চক্ষুও তখন শুকনো ছিল না।—এবং সেইরাত্রে অনেকদিন পরে দেখিলাম প্রচুর মদ খাইয়া বিকাশ নিজের ঘরে বসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বেহালা বাজাইতেছে। এবং সেই অজ্ঞাত রাগিনীর মূর্ছনা যেন তাহার অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনার আবেগকে নিবিড়ভাবে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে।

তাহার পরদিন ছিল রবিবার। কারখানা ছুটি থাকায় বিকাশের ঘরে বসিয়া বিকাশের সঙ্গে গল্প করিতেছি, হঠাৎ মেসের চাকর আসিয়া খবর দিল কলকাতা হইতে সুজিতের মা এবং দুটি ভাই-বোন আসিয়া হাজির হইয়াছে। এবং বিকাশের নাম করিয়া ডাকিতেছেন। খবরটা শুনিয়াই বিকাশ যেন কেমন হইয়া গেল। সে যে সুজিতের মায়ের সামনে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে তাহা বুঝিয়া বলিলাম, "চল দেখি কি ব্যাপার!" কিন্তু আমরা যাইবার পূর্বেই তাঁহারা উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজিতের মায়ের বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে, ছোট বোনটির বয়স ষোল এবং ভাইটির বয়স ১৪ হইবে। সুজিতের মা আমাদের দুইজনকে এক-সঙ্গে দেখিয়া বিকাশের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বিকাশ পরিচয় দিবামাত্র পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি প্রথমটা হতচকিত হইয়া গিয়াছিলাম। সুজিতের ছোট ছোট ভাইবোন দুটিও ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এরকম অবস্থায় আমার পক্ষে বসিয়া থাকা সম্ভব নয়। বিকাশের মত মানুষও দেখিলাম যথেষ্ট

বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আগাইয়া আসিয়া সুজিতের ভাই ও বোনটিকে গভীর মমতার সহিত নিজের প্রশস্ত বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এবং আমিও সেই শোকের দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া ছুটিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

সেইদিন বিকালবেলায় সুজিতের মা ও ভাইবোনদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল। এবং যাইবার সময় সুজিতের পরিত্যক্ত জিনিষগুলি তাঁহারা লইয়া গেলেন। বিকাশের সঙ্গে তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল জানি না। পরে শুনিয়াছিলাম সুজিতের একটা ইনসিওরেন্স ছিল, ৫ হাজার টাকার, বিশেষ করিয়া সেই টাকাটা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য বিকাশকেই তিনি বারবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।

সুজিতের ইনসিওরেন্স ছিল শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বিকাশকে বলিলাম, "কই এ কথাত জানতাম না। তুমিত বলেছিলে তার মাইনের টাকা থেকে কোন রকমে সংসার চলে। তবে ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিত কোথা থেকে?"

একটু হাসিয়া বলিল, "প্রিমিয়ামটা অবিশ্যি আমিই দিতাম! ওকে যখন প্রথম এখানে আনি তখনই ওর বাড়ীর অবস্থা শুনে আমি একটা ইনসিওরেন্স করিয়ে দিই ওর নামে। শুনলে না অসুখের সময় বেচারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল আমার দেনা কি করে শোধ দেবে সেই কথা ভেবে।" বলিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, "কে কার দেনা শোধ করে?" মনে পড়িয়া গেল রোগশয্যায় শুইয়া সুজিত কথাটা বলিয়াছিল বটে। তখন সব কিছু বুঝি নাই। এবং আজ সব কথা শুনিবার পর অন্য সব কথা ছাপাইয়া একটি কথা বারবার মনে হইতে লাগিত যে ইহা শুধু বিকাশের পক্ষেই সম্ভব।

এতখানি ঔদার্য, এতখানি মহত্ত্ব' এ বিকাশের পক্ষেই শোভন এবং সঙ্গত।

বিকাশ বলিল, "হতভাগা বাড়ীতে চিঠি লিখবার সময় আমার নামে কি লিখেছিল জানি না' ওর মা তো আমায় একটা মহাপুরুষ বলে ভেবে নিয়েছেন।" রহস্য করিয়া বলিলাম, "নেহাৎ মিথ্যা ভাবেন নি!"

কৃত্রিম রাগের সহিত বলিল, "হয়েছে, তুমি থাম দেখি।"

বলিলাম, "আর কি কথা হল?"

বিকাশ বলিল, "অপর্ণা মানে সুজিতের বোন; তার একটা পাত্র ঠিক করে দিতে?"

হাসিয়া বলিলাম, "যাক্ কাজ পেয়েছ কিছু।"

প্রত্যুত্তরে সহাস্য তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "হাঁ ঐ করি আর কি বসে বসে? আর ত কোন কাজ নেই আমার।" বলিয়া কথাটা তখনকার মত হাসিয়া উড়াইয়া ছিল। শুধু আমিই জানিলাম যে এ পাষাণের বুকে যদি কোন দাগ কাটিয়া থাকে ত, সে দাগ কখনও মুছিবে না। এবং আমার অনুমান যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহার প্রমাণও পাইয়াছিলাম।

৭ম পরিচ্ছেদ

(১)

বিকাশের কাহিনী লিখিতে বসিয়া আজ অনেক কিছুই লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু সব কিছু খুঁটি নাটি বিষয় লইয়া কাহিনী রচনা করিতে গেলে কাহিনীর রসমাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে সে চেষ্টা আর করিলাম না। শুধু বিকাশের জীবনের যে কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার পরিব্যাপ্ত জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম, সেই সব ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশের মনের বিশেষ চেহারাটা স্পষ্ট করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। প্রত্যেক মানুষের জীবনই কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। এবং ছোট বড় কয়েকটি ঘটনার অভিঘাতেই প্রত্যেক মানুষের জীবনে অনেক ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলে। কিন্তু সকলের জীবনের সবগুলি ঘটনার ইতিহাস রচনা হয় না, রচনা করিবার মানুষের অভাব বলিয়াই হোক্ অথবা যে শিল্প দৃষ্টি থাকিলে একটি মানুষের মনের গভীরে দৃষ্টি স্বভাবতঃই চলিয়া যায় সেই সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টির অভাবের জন্যই হোক, অধিকাংশ মানুষের জীবনই আমাদের কাছে অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ প্রকাশিত হইয়াও অনেক মানুষের জীবনের প্রকৃত রূপটি প্রমাণিত হইবার উপাদানের অভাবে অন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বিশেষতঃ আমরা যখন বলি অমুক মানুষের জীবনটা খুব ঘটনাবহুল, তখনই বুঝি যে অমুক মানুষটি তাহার জীবনের বৈচিত্র্যগুলি প্রমাণ

করিতে পারিয়াছেন। অথচ প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে অনুবিস্তর সাধারণত্বের ব্যতিক্রম ঘটে, এ কথাটা মনে মনে সত্য বলিয়া জানিয়াও মানিতে দ্বিধা বোধ করি। তাহার কারণ আর কিছুই নয় প্রমাণের অভাব। কারণ প্রমাণ করিবার একমাত্র উপাদান মানুষের ভাষা। এবং দীর্ঘদিনের ব্যবহারে মানুষের ভাষা এত পুরাতন হইয়া গিয়াছে যে, সেই পুরাতন ভাষা দিয়া কোন নূতন অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে তাহার সমস্ত অভিনবত্ব লইয়া প্রমাণ করিতে পারি না। যাঁহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহারা হয়ত বলিবেন, "বুদ্ধির তরবারী ঘুরাইয়া আমাদের ফাঁকি দিতে পারিবে না। কথাগুলি বলিতেছ খুব মুন্সীয়ানা করিয়া কিন্তু ইহার মূল যুক্তি কোথায়?" প্রত্যুত্তরে এইটুকু বলিতে পারি যে সাধারণ পাঁচটি মানুষ একত্র বসিয়া গল্পগুজব করিবার সময় প্রত্যেকের জীবনেরই ছোটখাট দুই একটা নূতন উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কিন্তু যখনই তাহা প্রমাণ করিতে যাওয়া যায় তখনই তাহাকে ভাষার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আনিয়া একটা কিছু তৈয়ারী করিয়া প্রতিবেশী মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিতে হয়। ফলে তখনই একজন মন্তব্য করে, এ আর এমন কি; আমার জীবনেও ঠিক এমনটি ঘটিয়াছিল। ইহা লইয়া তর্ক করাও বৃথা, কারণ যাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সামগ্রী তাহা অন্যের বুদ্ধিগোচর করা সহজ নহে। তবুও বলিব যাঁহারা বলেন এমনটি তাঁহাদের জীবনেও ঘটিয়াছিল, তাঁহারা ভুল বলেন। কারণ যাহা আমার জীবনে ঘটিল, তাহা অন্যের জীবনে যেমন ঘটিবেনা, তেমনি অপরের জীবনের অনুভূত বেদনা আমার জীবনে সত্য হইতে পারে না। ইহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি অখণ্ড সত্য। শুধু মাত্র ভাষার দৌর্বল্য জনিত প্রকাশভঙ্গীই এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে যে দুই মানুষের জীবনে একরকম ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে এ প্রশ্নও হইতে

পারে তবে কি দুইটা মানুষের জীবনের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় জীবনের মধ্যে ঐক্য নিশ্চয়ই নাই, ঐক্য আছে তাহাদের জীবনের অনুভূত সত্যগুলির মধ্যে। এই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবনে এক একটি বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং এক একজন মানুষ সেই বিচ্ছিন্ন সত্যগুলিকে এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছে। আসলে তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা নিগূঢ় ঐক্য সূত্র রহিয়াছে; মূলতঃ সবগুলিই এক। যদি কোন উপায়ে বিশ্বমানবকে একটি কোন বিশেষ মূর্ত্তিতে চিত্রিত করা যাইত তাহা হইলে দেখা যাইত প্রত্যেক মানুষের মূলীভূত অনৈক্যগুলি এক অপরূপ রূপ লইয়া গভীরতর ঐক্যের স্বরূপটিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এবং জীবনের নানা অসাম্য সত্ত্বেও সবকিছু মিলাইয়া প্রত্যেক মানুষের জীবনই এক বিরাটতম সত্যকে প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে একের চিন্তাধারা আরেকজন কখনই গ্রহণ করিতে পারিত না। অথচ তাহাও হয়, অর্থাৎ একের সুখ-দুখের কাহিনী শুনিয়া, একজন মানুষের আনন্দ বেদনা সংসারের অন্য বহু মানুষের চোখেই জল আনিয়া দেয়। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে জীবনের মূলগত অসঙ্গতি সত্ত্বেও, মানুষে মানুষে হৃদয়ের বিনিময় হয় এবং ভবিষ্যতেও হইবে। সুতরাং বিকাশের যে জীবনটা সংসারের কোন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, তাহা যে সত্যই আকর্ষণ করিবার মত, একথা নিজে না বুঝিলে বুঝাইবার উপায় নাই। এবং এই জন্যই বিকাশের জীবনটা আমার চোখে অভিনব বলিয়া মনে হইয়াছিল বটে কিন্তু যাহারা তাহার চিরদিনের সঙ্গী তাহারা তাহাকে বুঝিতে পারে নাই। ইহার আরও একটি কারণ অবশ্য আছে। সেটি হইতেছে যে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে

একটি মানুষ কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়াও নিজের জীবনের অনেক জটিলতম সমস্যার সমাধান স্বচ্ছন্দে করিয়া লইতে পারে। ইহার জন্য বুদ্ধি জ্ঞান বা ঐ জাতীয় কোন দৈবদত্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রত্যেক মানুষই আপনার অজ্ঞাতসারে জীবনের অনেক জটিলতম সমস্যা সহজে সমাধান করিয়া লয়। অনেক অসংলগ্ন অপ্রয়োজনীয় চিন্তার মধ্য দিয়া অতি অকস্মাৎ আপন মনের এমন অনেক প্রশ্নের জবাব মিলিয়া যায়, যাহা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হয়না। এবং এইজন্যই দেখা যায় যে অনেক অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষ নিজের জীবনটাকে নানা কঠিন বাধা-বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়া অতি সহজেই একটি নির্দ্দিষ্ট ধারায় অতিবাহিত করিয়া দেয়। মানুষের আদিমতম অবস্থায় যে স্বাভাবিক বুদ্ধি তাহাকে তাহার নানা বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়া পথ দেখাইয়াছিল, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বাভাবিক বুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজও মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহা মানুষেব মনকে সময়ে অসময়ে পরিচালিত করে। এবং আমিও শুধু মাত্র এই স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রেরণাতেই বিকাশের জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দুর্ভেদ্য যবনিকা আংশিক অপসারিত করিয়াছিলাম; ইহা ছাড়া অন্য কোন শক্তিই আমার ছিল না। এবং এই স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বিকাশের বহির্জীবনের এই সব অদ্ভুত কাজকর্ম্মের সহিত তাহার অন্তর জীবনের একটা সুগভীর সংযোগ রহিয়াছে। কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার বলিষ্ঠ পুরুষচিত্ত এমনই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার জন্য কক্ষচ্যুত উল্কার মত জীবনের কক্ষপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অজ্ঞাত জীবনের পথে বিপথে উদ্দেশ্যবিহীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও যেন শান্তি পাইল না। কিন্তু কেন যে এমন হইয়াছিল,

এবং কেনই বা সে এমন করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজের গোপন বেদনাকে সচেতন সতর্কতার সহিত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গেল, তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই।

বহির্জীবনে বিকাশকে চিনিয়াছি বলিয়া যত বেশী নিশ্চিন্ত হইতে লাগিলাম, অন্তর্জীবনে সে যেন ততবেশী অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে যে আমাদের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের কেউ নয়, এই সত্যটা যেন ক্রমশঃই প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। মিঃ ঘোষ প্রায়ই অনুযোগ করিতেন যে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, কারণ তাঁহার বাড়ীতে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই। রাঁচিতে যাওয়াও বিকাশ বন্ধ করিয়াছে। সন্ধ্যার পর স্কুলের কাজ শেষ করিয়া সে যে কোথায় যায় জানিতাম না। অধিকাংশ দিন গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসে। আমি তখনও জাগিয়া থাকি। কিন্তু আমার সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া সোজা নিজের ঘরে চলিয়া যায় এবং ঘরের ভিতর নানা রকম আওয়াজ শুনিয়া বুঝিতে পারি যে সে আকণ্ঠ মদ খাইতেছে। দু' একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, উঠিয়া আসিয়া তাহার ঘরের ফুটা দিয়া দেখিয়াছি গভীর মনোযোগের সহিত সে যেন কি পড়িতেছে। আবার কখনও কখনও কি যেন লিখিত। অথচ কি যে সে পড়িত, এবং কিই বা লিখিত তাহা জানিতে পারি নাই। দিনের বেলায় সে আগেকার মতই সহজ মানুষ ছিল। পরিচিত রসিকতা এবং রহস্যের মধ্য দিয়া সকলের সঙ্গেই সহজভাবে কথাবার্ত্তা বলিত। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতেই তাহার কি যেন হইত। অথচ ইহার মূলে যে কি আছে, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু কয়েক-দিনের মধ্যেই একটা চাপা গুজব শুনিলাম, যে ফ্যাক্টরীর লোকজনের সহিত ফ্যাক্টরীর কর্ম্মকর্ত্তাদের কি কারণে মতভেদ ঘটিয়াছে। এবং

ফ্যাক্টরীর লোকজনদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ একটা কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন এমন আভাসও পাইলাম। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছে। এবং সেইজন্য বড়বড় কারখানাগুলিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে অক্ষত রাখিবার জন্য ভারত-সরকার প্রবর্ত্তিত ভারতরক্ষা আইন জারী হইয়াছে। কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের সবকিছু ভার তখন সামরিক কর্ম্মচারীদের হাতে। সর্ব্বপ্রকার শ্রমিক-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত আইনকানুনের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা সত্যসত্যই অত্যন্ত কঠোর, তাই কানাঘুষায় কারখানায় আসন্ন গোলযোগের আভাস পাইয়া যথেষ্ট চিন্তিত হইলাম। এবং সে দুশ্চিন্তা এক সময় গভীর আশঙ্কায় পরিণত হইল যখন শুনিলাম যে শ্রমিকদের পক্ষ লইয়া বিকাশ কি একটা আন্দোলনের উদ্যোগ করিতেছে। কথাটার সত্য মিথ্যা যাচাই করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিলনা। বিশেষতঃ বিকাশকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে কোন লাভ নাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সে হয়ত আমার কথা শুনিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে। অথচ এ অবস্থায় কি যে করা যায় বুঝিতে না পারিয়া একদিন মিঃ ঘোষের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। এবং যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। সব শুনিয়া মিঃ ঘোষের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল।

বলিলেন, "ওকি প্রত্যেকদিন রাত্রি করে ফেরে?

বলিলাম, "হাঁ।"

"কোথায় যায় না যায় জিজ্ঞেস করেছ কি?"

বলিলাম, "না, তা করিনি। জিজ্ঞেস কর্লে ওত কিছু বলবে না।"

মিঃ ঘোষ গম্ভীরভাবে হুঁ বলিয়া চুপ করিলেন। এবং বেশ

বুঝিলাম আমার কথাগুলি তাহার মনে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। বলিলেন, "ওকে বলে কিস্‌সু লাভ নেই সে কথা সত্যি। চিরকালই সে একটু বেশীরকম একগুঁয়ে। অথচ—" বলিয়া কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া বলিলেন, "এর আগেও বার দু'তিন এ রকম হয়েছে কিনা? ১৯৩৬ সালে একবার এই রকম একটা গোলমাল হয়েছিল। সেবার ষ্ট্রাইক করা নিয়ে পুলিশে লাঠি চালিয়েছিল। ও তার মধ্যে ছিল। কিন্তু কিছু হয়নি। আরেকবার ১৯৩৮ সালে ওয়ার্ককারদের মাইনে নিয়ে এক ব্যাপার হয় সেবারও ষ্ট্রাইক হয়েছিল বিকাশই করিয়েছিল ষ্ট্রাইকটা। শেষকালে এক বিরাট কাণ্ড হয়ে গেল। ম্যানেজার ছিল ম্যাকলীন সাহেব। সে কর্লে কি গোটাকয়েক বাঙালীকে লাগিয়ে দিলে ষ্ট্রাইক ভাঙ্গাবার জন্যে, আর ওদিকে পুলিশেও কে খবর দিল কে জানে; আমরাও ঠিক ব্যাপারটা জানি না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল দু'জন বাঙালী আর ম্যাকলীন্‌ সাহেব খুন হয়ে গেছে।"

অপরিসীম বিস্ময়ে বলিলাম, "খুন হয়ে গেল?"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "হ্যাঁ, তারপর পুলিশ এসে বিকাশ এবং আরও তিন চারজন পাঠানকে ধর্লে। শেষে রোশন খাঁ বলে এক পাঠান confess কর্ল যে সেই murder করেছে। ফলে বিকাশ আর একজন পাঠান ছাড়া পেল। কিন্তু রোশান খাঁর Transportation হয়ে গেল আর বাকী দুই জনের ৫ বছর করে সাজা হয়ে গেল। সেই ব্যাপারের পর থেকে বিকাশের সঙ্গে ফ্যাক্টরীর মালিকদের প্রায়ই ছোটখাট গোলমাল হচ্ছে। এবার কি হয়েছে জানি না—তবে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া মিঃ ঘোষ চুপ করিলেন। বিগত দিনের সেই সব ভয়াবহ স্মৃতি বোধ হয় মিঃ ঘোষকে নির্ব্বাক করিয়া দিল।

এবং তিনি মনে মনে কি যেন একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এ সমস্ত তথ্য আমি আগে কখনও শুনি নাই।

বলিলাম, "আপনি কি মনে করেন এবারও সেই রকম কিছু হতে পারে ?"

মিঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "না মনে করি না বটে, কিন্তু হলে আশ্চর্য হব না। কারণ বিকাশকে ত জানি। He is so very rash and daring যে ওর কথা ভাবলে সত্যিই ভয় হয়। কারণ He does not care for himself তাছাড়া পাঠান আর পাঞ্জাবী ওয়ার্কমেনগুলো ত ওর কথায় উঠে বসে—ওযা বলবে তাই কর্ব্বে—দেখলে না সেদিন সালফিউরিক এ্যাসিড্ প্ল্যাণ্টের ব্যাপারটা ?" বলিয়া কি একটা কথা মনে পড়িয়া যাইতেই বলিয়া উঠিলেন, "১৯৩৮ এর ষ্ট্রাইকের পর বিকাশকে ফ্যাক্টরী থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু হঠাৎ একদিন নূতন ম্যানেজারের কাছে উড়ো চিঠি গেল উর্দ্দুতে লেখা যে বিকাশকে যদি ছাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে ফ্যাক্টরীর একটি চিমনিও থাকবে না। ফলে ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ে গেল। কিন্তু সেই থেকে বিকাশের উপর Authority মোটেই সন্তুষ্ট নয়।"

বলিলাম, "কিন্তু আগুন লাগার দিন ত ফ্যাক্টরীটাকে বাঁচাবার জন্যে সে যা কর্ল তাও ত—"

মিঃ ঘোষ বাধা দিয়া বলিলেন, "ওইখানেই ত মজা। ওর ব্যাপার বুঝা মুস্কিল। তবে মনে হয় লোকগুলোকে বাঁচাবার জন্যেই he made that daring attempt.

মিঃ ঘোষের কথা শুনিয়া নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং কেবলই মনে হইতে লাগিল, "মানুষটা এমন হইল কি করিয়া ? কিসের প্রেরণা মানুষটাকে এমনি করিয়া অস্থির

অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে? কি সেটা?" এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ বিকাশের স্টকেশের মধ্যে সেই অপরিচিতা নারীর বিবর্ণ ছবিখানি মনে পড়িয়া গেল। মনে হইল ইহার মধ্যে হয়ত কোন যোগাযোগ আছে।

২

ইহার পরের ঘটনাগুলি এমনি এক অস্বাভাবিক দ্রুতছন্দে ঘটিয়া গেল যে তাহাদের অতিদ্রুত সংঘটনের মধ্যে কিছু ভাবিবার সামান্য অবকাশটুকুও পাইলাম না। যে অনাগত বিপদের আশঙ্কায় অপেক্ষমান চিত্তে আমরা সকলে দিন কাটাইতেছিলাম, সহসা সেই বিপদ এক ভীষণতম রূপ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। যুদ্ধের দরুণ ফ্যাক্টরীতে কয়েকটি allowance দেওয়া হইত। সেই Allowance যথেষ্ট নয় বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে বার কয়েক আবেদন জানাইয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে যুদ্ধ সংক্রান্ত allowance সমূহের প্রবর্দ্ধিত হার সম্পর্কে একটা সংবাদ প্রকাশিত হইল। তাহাতে জানান হইয়াছে যে ভারতের অন্যান্য কারখানাগুলিতে allowance বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং শ্রমিকদের কয়েকটি বাধ্যতামূলক সুবিধাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সঙ্গে কারখানাগুলিতে যে রেশন দেওয়া হইত তাহারও পরিমাণ

বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। খবরটি যেদিন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, সেইদিন বিকাশকে একটি খবরের কাগজ হাতে করিয়া ওয়ার্কমেনদের বস্তীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিলাম। এবং পরদিনই শুনিলাম আমাদের কারখানার শ্রমিক সভার পক্ষ হইতে পুরাণ দাবীগুলি স্মরণ করাইয়া কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পেশ করা হইয়াছে। আবেদনের মধ্যে শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির একটা দাবী ছিল। আবেদনের উত্তর আসিবার আগেই কারখানার ইংরেজ ম্যানেজার অবসর গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার জায়গায় যিনি নূতন ম্যানেজার হইয়া আসিলেন তিনি বাঙালী। এই ম্যানেজার সাহেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম সুধাজিৎ মুখার্জ্জী। ভদ্রলোকের নামটুকু ছাড়া আর কোথাও বাঙালীত্ব ছিল না। এবং তাহার উগ্র সাহেবিপনার পরিচয় পাইয়া কারখানার লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। শোনা গেল ভদ্রলোক নাকি I. C. S. পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন এবং দুইবার I. C. S. পরীক্ষায় ফেল করিবার পর কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিলেন যে I. C. S. পরীক্ষায় পাশ করা তাহার দ্বারা সম্ভব নয়। এবং তখনই তিনি নূতন করিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে সুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পড়িবার পর তাঁহার মনে হইল যে ব্যারিষ্টারী পড়িয়া কোন লাভ নাই। অতএব আরেকবার বইপত্র বিক্রী করিয়া নূতন বইপত্র কিনিয়া মাইনিং পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষায় পাশ করিয়া কি একটা উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তাহার পর বিস্তর অর্থব্যয়ে আরও কয়েকটা খেতাব সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিলেন। বিলাত যাইবার আগে তিনি দেশে একটি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিলাত হইতে বিস্তার জাহাজ হইয়া ফিরিবার সময় পাছে ভরা জাহাজ ডুবি হয়, এই ভয়ে বিলাত হইতে একটি মেম বিবাহ করিয়া আনিলেন। এবং বিবাহ

উপলক্ষে নাকি তাঁহার সহিত তাঁহার পিতার মতান্তর হয়। এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যাহা হইতে একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেহই সুধাজিৎ মুখার্জীকে রক্ষা করিতে পারিত না। পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া পিতার স্নেহের সম্বন্ধে সুধাজিৎ একটু ভুল করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন পিতার উপর একটু চাপ দিলে বোধ হয় তিনি ইংরেজ পুত্রবধূকে বরণ করিয়া লইবেন। কিন্তু সুধাজিতের পিতা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু। এবং সুধাজিতের বিলাত যাইবার পূর্বে যে মেয়েটিকে বংশ দেখিয়া, কুষ্ঠী মিলাইয়া ভূতভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন, তাহাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকেই তিনি পুত্রবধূ বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। এবং সুধাজিৎ যেদিন বাপের উপর রাগ করিয়া আলাদা থাকিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, সেইদিনই তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ ৪ খানা বাড়ী, গাড়ী এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তিন লাখ নগদ টাকা উইল করিয়া পুত্রবধূর নামে লিখিয়া দিয়া সুধাজিৎকে আলাদা থাকিবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। এই অবস্থায় কি যে করা যায় তাহা বুঝিতে না পারিয়া সুধাজিৎ বোধ হয় ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন এবং ভগবানও তাহা শুনিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ সপ্তাহকাল যাইতে না যাইতেই কোন এক হোটেলে ডিনার খাইয়া মেমসাহেবটি কলেরা হইয়া মারা গেলেন। এবং তাহার পরদিনই অনুতপ্ত সুধাজিৎ আসিয়া বাপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। বাপ বিষয়ী লোক। সবই বুঝিলেন। বুঝিয়া সুধাজিতের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন বটে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন না। অর্থাৎ ক্ষমা করিলেন কিন্তু উইল নাকচ করিলেন না। এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পুত্রবধূকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিয়া

বলিলেন, "উইলটা কখনও হাতছাড়া করো না মা। এইটিই তোমার সম্বল। আমি ত থাকতে পার্লাম না যে তোমার বিপদে সাহায্য কর্ব। এখন থেকে এই উইলটাই তোমায় রক্ষা করবে—অতএব ওটি হাত ছাড়া করো না। এ আমার অনুরোধ নয়, এ আমার হুকুম। এ হুকুম অমান্য করনা কখনও।"

পিতার মৃত্যুর পর সুধাজিৎ উইলটি হস্তগত করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও সফল হইলেন না। ফলে স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিলেও স্ত্রীকে কখনও ভালবাসিতে পারেন নাই। এবং শোনা যায় যে দীর্ঘদিন বিলাতে থাকিয়া সে দেশের সাহেবদের মত মদ খাওয়ার অভ্যাস এবং এদেশের সাহেবদের মত স্ত্রীকে মারিবার অভ্যাসটা তাহার জন্মিয়াছিল। এবং মাঝে মাঝে মদের ঝোঁকে স্ত্রীর উপর এমন অত্যাচার সুরু করিতেন যে বাড়ীর চাকর বাকর আসিয়া স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে পড়িয়া স্ত্রীকে সরাইয়া লইয়া যাইত। সুধাজিতের স্ত্রী নিজেও বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু তবু কেন যে এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া এই অসভ্য মাতাল স্বামীর ঘরে থাকিত, তাহার কারণ কেহই বুঝিত না। শুধু যে বাঙালী মেয়ে বলিয়াই স্বামীর বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া যাইত তাহা মনে হয় না। কিন্তু সে সব কথা থাক।

সুধাজিৎ মুখার্জি দাম্পত্য জীবনে মদ্যপ স্বামীর অংশ গ্রহণ করিয়াই যদি সন্তুষ্ট থাকিত, তাহা হইলে হয়ত গোলযোগের কারণ ঘটিত না, কিন্তু বহির্জীবনে তাহার উৎকট সাহেবিয়ানা ও উগ্র মেজাজ অপরিচিত মানুষের মনে যে ভাবের উদ্রেক করিত, তাহা ঠিক শ্রদ্ধার নয় বরং আন্তরিক ঘৃণার। সর্বত্র নিজেকে ইংরাজ বলিয়া পরিচিত করিবার উৎকট ইচ্ছা তাহাকে মানুষের কাছে

উত্তরোত্তর অপ্রিয়ভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে তাহার আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। না থাকুক তাহাতে কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু কারখানার ভার গ্রহণের পর হঠাৎ একদিন অসময়ে কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কারখানা পরিদর্শনের সময় সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্টের পরিদর্শনের সময় জন কয়েক পাঠানকে কর্মক্লান্ত দেহে বসিয়া সিগারেট খাইতে দেখিয়া সহসা তাহার ইংরেজী ক্রোধ ও আত্মসম্মান জ্ঞান জাগিয়া উঠিল। বিশেষতঃ পাঠানগুলা তাহাকে দেখিয়া সেলাম ত করেই নাই, সিগারেটও লুকায় নাই। তিনি পাঠানগুলিকে ডাকিয়া ডিসিপ্লিন সম্পর্কে কিছুটা বক্তৃতা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নির্বোধ পাঠানেরা সে সব কথাত শুনিলই না, বরং প্রত্যুত্তরে এমন কয়েকটি পরিহাস করিল যে সুধাজিৎ মুখার্জির বাঙালীদেহের ফ্রেমে বাঁধানো ইংরেজী মনটা অপরিসীম ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল। এবং পরদিনই তিনি কি কতকগুলা কাল্পনিক অভিযোগ আনিয়া সেই কয়জনকে হঠাৎ বরখাস্ত করিয়া বসিলেন। ফল যাহা হইল তাহার জন্য ম্যানেজার সাহেব প্রস্তুত ছিলেন কিনা জানি না কিন্তু কারখানার লোকেরা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কারণ বারুদ তৈয়ারী হইয়াই ছিল, এখন সেই বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলেন ম্যানেজার সাহেব অর্থাৎ সুধাজিৎ মুখার্জী। চারজন পাঠান বরখাস্ত হইবার পরদিনই কয়েকটা উড়োচিঠি এবং একখানি দরখাস্ত গিয়া পৌঁছিল ম্যানেজার সাহেবের হাতে। শুনিলাম উড়োচিঠিগুলিতে নাকি ম্যানেজার সাহেবের অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে কি কয়েকটা ইঙ্গিত ছিল। এবং আবেদন খানিতে লেখা ছিল যে চারজন নির্দোষ মানুষের অন্ন কাড়িয়া লাভ নাই। বিশেষতঃ সে অধিকার যখন ম্যানেজার সাহেবের নাই।

আইন সঙ্গত অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহার নাই। অতএব এই চারজন পাঠানকে পুনর্নিযুক্ত না করিলে কারখানায় ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী।

চিঠিটা পড়িয়া 'Damn it' বলিয়া ম্যানেজার সাহেব শ্রমিক সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক শুনিয়া কর্মক্লান্ত বিকাশ ঘর্মাক্ত দেহে ম্যানেজারের সহিত দেখা করিল। কিন্তু কথা যাহা হইল তাহা অতি সামান্য। শুধু ক্রুদ্ধ ম্যানেজার সাহেবের উচ্চকণ্ঠে, "I will sack you" কথাটি এবং তাহার প্রত্যুত্তরে অধিকতর উচ্চকণ্ঠের "All right, all right, do whatever you like," কথাগুলো শোনা গেল। বিকাশ ঘর হইতে বাহির হইবার পর মুখার্জী সাহেবের অপমানিত ইংরেজ চিত্ত নিস্ফল আক্রোশে গর্জন করিতে লাগিল। এবং তাহারই বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ "Impudent, Rascal, that swine' ইত্যাদি কথাগুলি বাহির হইতে স্পষ্ট শোনা গেল। বিকাশও শুনিয়াছিল। এবং শুনিবামাত্রই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে ফিরিয়া এমন এক অদ্ভুত বক্র দৃষ্টিতে ঘরের পানে চাহিল যে, সে দৃষ্টি দেখিতে পাইলে হয়ত ভয়ে মুখার্জী সাহেবের কথা বন্ধ হইয়া যাইত। ঠিক সেই সময় মিঃ ঘোষ গিয়া বিকাশের কাঁধে হাত রাখিয়া তাঁহার স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "চলে এসো বিকাশ।"

বিকাশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল। বুঝিলাম বারুদে আগুন লাগিয়াছে। ম্যানেজারের ঘরে যাইবার পরই সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যাণ্টে, এ্যামোনিয়া প্ল্যাণ্টের শ্রমিকগুলি কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। বিকাশ ফিরিতেই তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "শালা কেয়া

বোলা বাবুজী ?”

সংযতকণ্ঠে বিকাশ একটা বিরাট দেহ পাঠানকে ডাকিয়া বলিল, “ইকবাল, সবকো বোল দেও শামকো ছে বাজে জরুরী মিটিং হোগা।”

ইকবাল সসম্ভ্রমে, “বহুৎ আচ্ছা বাবুজী,” বলিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। মিঃ ঘোষের পিছনে পিছনে আমিও ছিলাম। কথাটা শুনিয়াই যেন ভয় লাগিল। মনে হইল ঐ ছোট্ট কয়টি কথার নীচে আরও ভয়ঙ্কর কিছু একটা লুকান আছে। কি ভাবিয়া একথা মনে হইল জানি না। তবে মনে হয় এ আমার সেই স্বাভাবিক মানব বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব হইল, যাহাকে বলা হয় Intuition…। সেইদিন মুখার্জী সাহেব আরও দুইজন পাঞ্জাবী এবং তিনজন পাঠানকে বরখাস্ত করিলেন। বিকাশকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে আসিতে মিঃ ঘোষ ম্লানকণ্ঠে বলিলেন, “কেলেঙ্কারী বোধহয় বাধলো সত্যেন।” বলিয়া একটা অস্ফুট খেদোক্তি করিলেন। এবং তাঁহার শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের সুর আমাকেও চিন্তিত করিয়া তুলিল। বুঝিলাম শীঘ্রই কি যেন একটা হইবে। সন্ধ্যাবেলায় মিটিংএ যাইবার ইচ্ছাও ছিল। মিঃ ঘোষ বলিলেন, “আমার বাড়ী-তেই এসো এক সঙ্গেই যাব—।”

৩

সন্ধ্যাবেলা মিঃ ঘোষের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। বৌদি ভিতরে ছিলেন। খবর পাইয়া আসিয়া হাজির হইলেন এবং কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "পুরুষ মানুষ জাতটাই কি এই রকম নিমকহারাম ;"

হাসিয়া বলিলাম, "কেন বলুন ত বৌদি ?"

বৌদি বলিলেন, "নয়ত কি ? একদিন পরে হঠাৎ কি মনে করে আসা হল শুনি ?"

রহস্য করিয়া বলিলাম, "ঘোষমশাই ডেকে এনেছেন তাই—"

কথার মাঝখানে ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তা জানি, না

ডাকলে যে আসবে না তা জানি! আমি যে একটা মানুষ তা যেন কারুর মনেই থাকে না! তা একা আসা হল ? দোসরটি কোথায় ? তিনি আবার কোন রাজ-কাজে ব্যস্ত আছেন ?"

বুঝিলাম বিকাশের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হাসিয়া বলিলাম, "রাজ কাজই বটে, সে গেছে মিটিং কর্তে।"

সহসা বৌদির কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বলিলেন, "মিটিং ? কিসের মিটিং ?"

আনুপূর্বিক ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। এবং সব শুনিবার পর

বৌদির অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী উদ্বেগে আতঙ্কে শ্রীহীন বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে মিঃ ঘোষকে বলিলেন. "হাঁগো, তুমি তাকে বারণ কর্লে না কেন?"

মিঃ ঘোষ জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি বারণ কর্লে, শুনবে কিনা সে?" কোনদিন শুনেছে দেখেছ?"

বৌদিও যে তাহা জানিতেন না তাহা নয়, তবুও ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাহোক তবুও বলে দেখলেনা কেন? আচ্ছা একবার আমার নাম করে ডেকে পাঠালে হয় না?"

বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাদের পানে চাহিলেন। মিঃ ঘোষ কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, বৌদি যেন আপনার মনেই বলিতে লাগিলেন, "কি জানি কি হবে? তার কাণ্ডজ্ঞানত কিছু নেই! কি যে করে বসবে—তখন—"বলিয়া কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া অভিমানাহত বেদনাভারাতুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমারই হয়েছে যত জ্বালা"—বলিয়া বোধ হয় অশ্রুর উদ্গত আবেগ গোপন করিবার জন্য ত্রস্তপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘর থেকে বলিলেন "চলে যেওনা সত্যেন, চা খাবার খেয়ে তবে যেও।"

রক্তের সম্পর্কটাকেই যাহারা জগতে একমাত্র সত্য বলিয়া জানে তাহারা ধারণাই করিতে পারিবে না যে বিকাশের সহিত বৌদির সম্পর্কটা কিসের। এবং কতখানি নিবিড় স্নেহের দাবীতে সেই অনাত্মীয়া নারী অসঙ্কোচে বলিতে পারিয়াছিল, "একবার আমার নাম করে ডেকে পাঠালে হয় না?" দেরী হইয়া যায় দেখিয়া মিঃ ঘোষকে বলিলাম, "মিটিং এ যাবেন না আপনি?"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "পাগল হয়েছ! পাছে বিকাশের পাল্লায়

পড়ে তুমি যাও সেই জন্য তোমায় ধরে রাখলাম।"

বলিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওসব জায়গায় গোলমাল বাধতে কতক্ষণ?" কথাটা শুনিয়া নির্বাক বিস্ময়ে মিঃ ঘোষের পানে চাহিয়া রহিলাম। বৌদি মেয়ে মানুষ, তাঁহার স্নেহের অভিব্যক্তি ঘটে। কিন্তু মিঃ ঘোষ স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী মানুষ, তাই তাঁহার অন্তঃশীলা স্নেহের পরিচয় সব সময় পাওয়া যায় না। আজ নির্জন সন্ধ্যায় তাঁহার ছোট্ট কয়টি কথার মধ্যদিয়া তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহের স্বরূপটুকু যেন দেখিতে পাইলাম বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আমার মনে তখন বিকাশের চিন্তা বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া উদিত হইতেছে। কেবলই মনে হইতে লাগিল, "যদি তাহার কিছু হয়, যদি কোন গোলমাল হয়। যদি—?"

আর ভাবিতে পারিলাম না। ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বিকাশের যদি কিছু হয়? মানে যদি—ইয়ে মানে—" মিঃ ঘোষ বাধা দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে রকম কিছু হবে না। অন্তত: ওই পাঠান আর পাঞ্জাবী ওয়ার্কমেনগুলো থাকতে ওর কাছেও কেউ পৌছতে পারে না।" কথাটা শুনিয়া মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পাইলাম বটে, কিন্তু তবুও তাহার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ঘুচিতে চাহিল না। বৌদি চা খাবার লইয়া হাজির হইলেন। সদ্য খাবার খাইয়া চায়ের বাটি হাতে তুলতে যাইতেছি এমন সময় বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠের তীব্র চীৎকারে ঝিল্লি মুখরিত শান্ত সন্ধ্যার প্রশান্ত নিস্তব্ধতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কুলি লাইনের দিক হইতে একটা গর্জন ভাসিয়া আসিল, "চাক্কা বন্ধ হো।"

মিঃ ঘোষ কম্পিতকণ্ঠে চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "শেষ পর্যন্ত ষ্ট্রাইক হল সত্যেন।"

বলিয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন। চলিয়া আসিবার সময় বৌদি বলিলেন, "সত্যেন বিকাশকে আমার নাম করে বলত কাল যেন আমার সঙ্গে একবার অতি অবশ্য দেখা করে।"

বলিলাম, "বলব।"

রাত্রি বেলায় মেসে ফিরিয়া দেখি সকলের মুখে চোখে একটা চাপা উদ্বেগের চিহ্ন। কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সকলের বুক থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। শুনিলাম বিকাশ মেসে ফিরে নাই। গভীর রাত্রে বিকাশ ফিরিল। তাহার পায়ের শব্দে আমি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমায় দেখিয়া পরিচিত হাসি হাসিয়া বলিল, "কি মাষ্টার আজও কি আমার জন্য জেগে বসে আছ নাকি?"

আবিষ্টের মত শুধু বলিলাম, "হাঁ।"

বলিল, "এসো, এসো আমার ঘরে এসো।" বলিয়া আমার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। বলিল, "বস আজ তোমার সঙ্গে একটু গল্প কর্ব। আপত্তি নেই ত।' অন্যদিন তাহার সহিত সহজভাবে কথা বলিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করি নাই। কিন্তু আজ কেবলই মনে হইতে লাগিল এ মানুষটা আমাদের কেউ নয়। এ মানুষটা যেন আমাদের পরিচিত জগত হইতে বড় দূরে থাকে—ইহাকে চিনিয়াছি জানিয়াছি বলিয়া যে বিশ্বাস জাগিয়াছিল, আজকের রাত্রের মুখের চেহারার মধ্যে একটা অজ্ঞাত রহস্যের দুর্ভেদ্য যবনিকা দেখিয়া মনে হইল, "ভুল, ভুল, এমানুষটার কিছুই জানি না। এ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই সে যে কি বলিল, তাহা শুনিয়াও যেন তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

শূন্য দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

আমার মুখে সেই বাক্যহারা স্তব্ধতা দেখিয়া সহাস্তে আমার মুখখানা তুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া দিয়া বলিল, "wake up wake up মাষ্টার। কি হল কি তোমার ?"

মনের জড়তা তখনও কাটে নাই বলিলাম, "না, হয়নিত কিছু !' ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "বটে ? তা হলে বস।"

তাহার খাটের উপর বসিয়া কিছুক্ষণ নিজের মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। কারণ তাহাকে আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কিন্তু পাছে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া প্রথমেই কথা উলট পালট হইয়া যায়, এই ভয়ে নিজের মনে মনে প্রশ্নোত্তরের জাল বুনিয়া চলিতে লাগিলাম। মনে মনে তাহাকে অনেক প্রশ্নই করিলাম বটে, কিন্তু বাহিরে একটা কথাও বলিতে পারিলাম না। এমনকি কিভাবে কথা সুরু করা যায় তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া, শেষ পর্যন্ত হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "বৌদি একবার তোমায় দেখা কর্তে বলেছেন।"

বিকাশ বলিল, "তাই নাকি ? আচ্ছা দেখি কাল সময় পাইত যাব একবার।"

এতক্ষণে কথা আরম্ভ করিবার একটা সুযোগ পাইয়া বলিলাম, "কেন সময় না পাবার কি আছে ?"

বলিল, "তুমি কি কিছু শোননি ?"

বলিলাম, "কিসের সম্বন্ধে ?"

"কারখানার ষ্ট্রাইক সম্বন্ধে ?"

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "কিছু কিছু শুনেছি। কি হলো ? শেষ

পর্যন্ত তুমি কি ষ্ট্রাইক করানই ঠিক কর্লে?"

কথাটা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আমি কি ষ্ট্রাইক করানর মালিক? কারখানার লোকজনেরা প্রয়োজন বুঝেছে, তাই ষ্ট্রাইক করেছে।"

কথাটা সে এমনভাবে বলিল, যেন সেইটাই সত্য।

বলিলাম, "মিঃ ঘোষ বলছিলেন তুমি চেষ্টা করলেই ধর্ম্মঘট বন্ধ কর্তে পার্তে। কারণ ফ্যাক্টরীর লোকেরা তোমার কথায় উঠে বসে।"

বিকাশ উঠিয়া গিয়া আলমারী খুলিয়া তাহার পানীয়ের ব্যবস্থা করিতেছিল।

বলিল, "ঘোষ মশাই তাই বলছিলেন নাকি?"

বলিলাম, "হাঁ।"

হাসিয়া বলিল, "উনি আমায় বড্ড ভালবাসেন।"

তাহার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুর লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "ঠাট্টা নয় বিকাশ, আমি নিজেও জানি তুমি ইচ্ছা কর্লে এ ষ্ট্রাইকটা বন্ধ কর্তে পার।"

সকৌতুক চাহনিতে চাহিয়া বলিল, "পারি নাকি?"

বলিলাম, "নিশ্চয়ই পার। এবং এ ধর্ম্মঘট তোমার বন্ধ কতে হবে।"

কথাটা শুনিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল যেন ভুল করিয়া একটা মস্তবড় পরিহাস করিয়া ফেলিয়াছি।

বলিল, "বন্ধ হয়ত কর্তে পারি। কিন্তু কেন কর্ব আমায় বলতে পার?"

ইহার উত্তরে আমার কিছু বলার ছিল না। তাই চুপ করিয়া গেলাম। সে কিছুক্ষণ উত্তরের আশায় আমার মুখের পানে চাহিয়া

থাকিয়া বলিল, "জানি না মাষ্টার হঠাৎ এমন কথাটা কেন বল্লে। তবে এটা জেনে রেখ যে এ আগুণ যেমন হঠাৎ জলে না, তেমনি হঠাৎ এ আগুণ নেভে না। এর জলবার জন্তে যেমন অনেকদিনের অনেক কাঠখড় লাগে, নিভবার সময় হলে তা আপনি থেকে নিভে যায়। এবং আমি নিজে যে আগুণ জালিয়েছি তার কাজ না হলে যদি নেভাতে যাই, তাতে নিজেই পুড়ে মর্ব, লাভ কিছু হবে না। অতএব সে কথা থাক্। কিন্তু হঠাৎ একথাটা কেন বল্লে বলত ?"

ধর্মঘটের সহিত আগুণের তুলনা করায় মনের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হইল তাহাতে বেশ বুঝিলাম যে সে কথাগুলি শুধু ভয় দেখাইবার জন্তই বলে নাই। সত্যই এই ধর্মঘটের মধ্যে অগ্নির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা রহিয়াছে, সে ক্ষুধার তৃপ্তি না হইলে এ অগ্নি নিভিবেনা। এবং কথাটা মনে করিতেই একটা ভয় হইল।

ভাবিলাম, যে আগুণ সে জালাইয়াছে তাহা কবে এবং কিভাবে নিভিবে ? হয়ত বা তাহা নিঃশেষে সর্বস্ব গ্রাস করিয়া আপনার ইন্ধন আপনিই সংগ্রহ করিয়া লইবে। কেবলই মনে হইতে লাগিল এই ধর্মঘট অদূর ভবিষ্যতের বুকে যে সীমাহীন সর্বনাশের চিহ্ন আঁকিয়া দিল, তাহা হয়ত সহজে মুছিবেনা। এবং সেই অনাগত দিনের ভয়াবহ রূপটি মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "মিঃ ঘোষ বলছিলেন যে এইসব ব্যাপার থেকে নাকি অনেকরকম গোলমালের সৃষ্টি হয়, এমনকি রক্তারক্তি পর্যন্ত।"

হাসিয়া বলিল, "তা মাঝে মাঝে হয় বইকি। সে রকম প্রয়োজন ঘটলেই হয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া কেমন যেন মনে হইতে লাগিল।

বলিলাম, "ধর তোমার যদি কিছু হয়, মানে একটা—"

অন্তর্নিহিত গোপন আশঙ্কাজনিত জড়তায় আমার কথা জড়াইয়া গেল। সেই বিপদজনক পরিস্থিতিতে যে কোন মুহূর্তে তাহারও যে কিছু একটা বিপদ ঘটিতে পারে একথাটা কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলামনা। সে কিন্তু আমার ইঙ্গিতটুকু বুঝিতে পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সেটা আর অমন নূতন কথা কি ? আগুন নিয়ে কাজ কর্তে গেলেই মাঝে মাঝে আগুণে হাত পোড়ে বই কি ? তাই বলে ত কাজ বন্ধ রাখলে চলে না। তুমিই বল না চলে কি ?"

তাহার সহজ প্রশ্নের উত্তরে কিছুই যেন আমার বলিবার ছিলনা। যে মানুষটিকে ভালবাসি তাহাকে যখন স্বেচ্ছায় নিশ্চিত বিপদের মুখে নির্ভিক হৃদয়ে অগ্রসর হইতে দেখি তখন তাহার পথরোধ করিয়া ধরিবার দুরন্ত বাসনা অস্বাভাবিকও নয়, অসঙ্গতও নয়। কিন্তু মনে হইল এই মানুষটির গতিপথে বাধা সৃষ্টি করিবার মত শক্তি আমার নাই। এবং বাধা দিলেও, সে বাধা তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইতে এই পাষাণের বুকে কিছুমাত্র বেদনা জাগিবেনা। নিস্ফল বেদনার প্রচণ্ড আকুলতা এবং স্নেহব্যাকুল অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিমানে বুকের মধ্যটা কাঁদিয়া উঠিল। অথচ কিছুই করিবার নাই। আমার আবেগ বিহ্বল অসহায় চাহনির অর্থও কিন্তু সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টির মানুষটির কাছে অস্পষ্ট রহিল না। সে তখন মদের বোতল খালি করিয়া গেলাসে মদ ঢালিতেছিল। গেলাস পূর্ণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত চুমুক মারিয়া আমার পানে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি মাষ্টার বল্লে না যে ? বলনা আগুনের ভয়ে কাজ বন্ধ রাখা চলে কি ?"

শান্ত স্বরে বলিলাম, "আমি যা বলব তাত তুমি শুনবে না।" একটা চুরুট ধরাইয়া লম্বা টান মারিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল,

নিশ্চয়ই শুনব, "Provided you don't say anything unreasonable।"

Unreasonable! হাসি পাইল কথাটা শুনিয়া। ভাবিলাম আমার মনের গভীরে তাহার এই দুঃসাহসিক অভিযান যে কি প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ইহাকে কি করিয়া বুঝাই? কি কুক্ষণেই যে আমার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল জানি না। অথচ সেইদিন হইতেই মানুষটির প্রতি অন্তরের সুগভীর বিস্ময় অচিন্ত্যনীয়ভাবে প্রগাঢ় ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায় পর্যবসিত হইয়া গেল। এবং তাহারই জের টানিতে টানিতে আজ এমনই এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি যে এখন যদি তাহার মাত্রাহীন দুঃসাহসের সমর্থন করিয়া কিছু বলি ত, সেইটাই হইবে মিথ্যা। এবং অন্তরের সত্যকথাটি যদি বলি তাহা হইলে সেইটাই হইবে Unreasonable অথচ মানুষের ভালবাসা মাত্রেই যে কিছুটা Unreasonable এ সত্যটা সাধারণ মানুষকে বুঝান যায়, কিন্তু ইহাকে বুঝাই কি করিয়া।

আমায় নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল, "বলে ফেল, বলে ফেল, লজ্জা কিসের?"

তখনও কোন কথা বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। অবশিষ্ট পানীয় নিঃশেষ করিয়া দ্বিতীয়বার সেটা পূর্ণ করিয়া বলিল,

"I see-বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও? কিন্তু কেন তা চাইছ তাত তুমি বল্লে না মাষ্টার?"

হায়রে! একথাটাও কি তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে? বলিলাম "আমি চাইনা যে—"

কথার মাঝখানে সে তেমনি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "But why?"

মনে হইল সে যেন পরিহাসচ্ছলে জোর করিয়া আমার মনের কথাটা টানিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "দেখ বিকাশ, এমন অনেক কথা আছে যা স্পষ্ট করে বলা যায় না। অন্ততঃ আমি পারি না। I am sure যে তুমি জান আমি তোমায় ভালবাসি, তাই এমনি করে তুমি আমায় ঠাট্টা কর্চ্ছ।"

ঝোঁকের মাথায় কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াই মনে হইল কাজটা যেন ঠিক হয় নাই। আমার কথায় এ লোকটা হয়ত এখনই হাসিয়া উঠিবে, হয়ত এখনই বিদ্রূপ করিয়া উঠিবে। কিন্তু কিছুই করিল না। মনে হইল আমার কথার মধ্য হইতে কি একটা কথা যেন তাহার হৃদয়-বীণায় আঘাত করিয়া বহুদিনের পুরাণ কোন একটি বিস্মৃত সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে, যাহার আবেশে তাহার বলিষ্ঠ চিত্ত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চেতনা হারাইয়া নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে।

সে নীরবতা ভঙ্গ করা হয়ত আমার উচিত ছিল না। কিন্তু তাহার এই একান্ত স্তব্ধতা অসহ্য বোধ হইল বলিলাম, "আচ্ছা বিকাশ তুমি কি নিজের জীবনটা সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা কর না?"
সে মুখ না তুলিয়াই তেমনি নত মুখেই মাথা নাড়িয়া বলিল, "Not in the least."

বুঝিলাম প্রশ্নটা করাই আমার উচিত হয় নাই। এমনকি কোন প্রশ্ন না করিলে হয়ত সে কিছু একটা বলিত। কিন্তু আমার অসঙ্গত প্রশ্নটা তাহাকে আরও উন্মনা করিয়া দিল। এবং অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সহসা পাগলের মত অট্টহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল "কি বল্লে মাষ্টার তুমি আমায় ভালবাস—তাই না?"
তাহার অট্টহাস্যে সচকিত হইয়া উঠিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ। কিন্তু—"
আমায় কথা শেষ করিতে না দিয়া তেমনি ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল,

"ভালবাসা—Love ! Well that's a nice joke."

বিকাশের এমন অদ্ভুত আচরণ কখনও দেখি নাই। মদ খাইতে তাহাকে আগেও বহুবার দেখিয়াছি। এবং পরিমিত পরিমাণে মদ খাওয়াটা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। একদিন এই লইয়া নিষেধ করায় বলিয়াছিল, "মদ জিনিষটা তৈরীই হয়েছে, অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হবার জন্যে। wine means excess" এবং অতিরিক্ত মদ খাওয়ার পরও তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখি নাই, অথবা তাহার আচার ব্যবহারে কোন জড়তা দেখি নাই কখনও। স্নতরাং আজ সে যে মদের নেশায় প্রলাপ স্নরু করিয়াছে তাহা মনে হইল না। কিন্তু তাহার কথাটা শুনিয়া কি রকম যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। এবং তাহাকে যে ভালবাসি সে কথাটা অকপটে স্বীকার করিবার পর সে যখন অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, "Thats a nice joke" তখন অজ্ঞাতসারেই নিজের মনের মধ্যে নূতন করিয়া বুঝিলাম যে তাহার প্রচণ্ড অবিশ্বাসের প্রাচীরের গায়ে আমার অকুণ্ঠ ভালবাসা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই মানুষটার কাছে আমার ভালাবাসা তুচ্ছ অর্থহীন সামগ্রী। কিন্তু তবুও তাহাকে ঘৃণা করিতে পারিলাম না। বরং এই কঠিন ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনার স্নর যেন আমায় বিস্মিত করিয়া দিল। মনে হইল আরও কিছু বলিতে গিয়া সে যেন কৌশলে নিজেকে গোপন করিয়া রাখিল। এবং আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় তাহা পর মুহূর্ত্তেই প্রমাণিত হইল।

বলিলাম, "Do you mean to call my love a joke ?"

সে চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "Oh, no, no, I did n't mean you—I meant something else." বলিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত

কুঞ্চিত করিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিল। অনেকদিন ধরিয়া কথাটা তাহাকে বহুবার চেষ্টা করিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, আজ সহসা তাহার অসংলগ্ন কথার মধ্য দিয়া সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম।

বলিলাম, "দেখ বিকাশ, একটা কথা জিজ্ঞেস কর্ব, সত্যিকথা বলবে ?"

আমার প্রশ্নের ধরণ শুনিয়া সে মদের গেলাস হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "কি কথা ?',

বলিলাম, "তুমি কি একটা কথা যেন সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াও। আমার মনে হয় জীবনে তুমি এমন একটা আঘাত পেয়েছ—"ভাবিয়াছিলাম আমার কথাটায় সে বিস্মিত হইবে। কিন্তু আমার কথার মাঝখানেই ঠোঁট দুইটার অদ্ভুতভঙ্গী করিয়া বার দুয়েক মাথা নাড়িয়া যে কথা বলিল তাহাতে আমি দ্বিগুণ বিস্মিত হইলাম।

বলিল, "কথাটা মনে হয়েছে কি আমার স্যুটকেসের মধ্যে ছবিটা দেখার আগে না পরে হে মাষ্টার ?"

লজ্জিতকণ্ঠে হাসিয়া বলিলাম; "ছবি দেখার পরে; কিন্তু কি করে তুমি জানলে যে ছবিটা দেখেছি ?"

সত্যই সে যে কি করিয়া জানিল তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আমার কথার উত্তরে হাসিয়া বলিল, "Don't take me to be a fool মাষ্টার ? কিন্তু সে কথা যাক্। এখন তোমার প্রশ্নটা কি তাই বল।"

ধরা পড়িয়া গিয়াছি দেখিয়া বুঝিলাম লজ্জা করিয়া লাভ নাই।

বলিলাম, "মেয়েটি কে ?"

শেষবারের মত গেলাসটায় চুমুক দিয়া গেলাসটা নামাইয়া রাখিয়া নূতন করিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল, "বলছি সব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নিই। সেটা হল তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে কেবলই মনে হত, তোমার কাছে আমার সব কথা যেন খুলে বলা যায়। যদি বল কেন একথা মনে হল, তার উত্তরে স্রেফ বলব জানি না। মনে আছে একদিন তোমায় বলেছিলাম তোমায় আমি ভালবাসি।"

দামোদরের তীরে সেই ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সন্ধ্যার কথা মনে পড়িয়া গেল।

সস্মিত মুখে বলিলাম, "মনে আছে" বলিল, "good তারপর থেকে বলবার চেষ্টাও করেছি কয়েকবার। কিন্তু পারিনি। পারিনি কারণ নিজের কথা নিয়ে আলোচনা করার স্বভাব আমার নয়, তার ওপর ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এমন কয়েকটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে, যেগুলো জানলে লোকের কাছে আমায় লজ্জিত হতে হবে। যেমন ধর—আমার ছোট বোনের কথা—you know what she is—' বলিয়া ম্লানমুখে আমার পানে চাহিল। তাহার কথা এতদিনে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম, "সে এখন কোথায়?"
বলিল, "কলকাতায়। তাই এসব কথা কাউকে বলিনি কখনও? তুমি যে আমায় ভালবেসেছ একথাটা বুঝতে আমার বেশী দেরী হয়নি। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম তুমি নিজেই জিজ্ঞেস করবে। কারণ নিজে থেকে কি করে যে কথাগুলো বলা যায় তা বুঝতে পারতাম না। এর পর হঠাৎ একদিন দেখি আমার স্যুটকেসের মধ্যে ছবিটা উল্টান রয়েছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া হাসিয়া বলিল, "তাড়াতাড়িতে বোধহয় ঠিক করে রাখতে ভুলে গিয়েছিলে?" বলিয়া

আবার সুরু করিল, "সেই দিনই বুঝলাম ছবিটা তুমি দেখেছ। তারপর থেকে প্রায়ই ভাবতাম কথাটা তুমি জিজ্ঞেস করবে? Really I was expecting you to ask me some questions about the photo? But you did not—well! আমিও কোন কথা বলিনি। তবে জানতাম একদিন আমায় নিজে থেকেই বলতে হবে। এবং তোমার কাছেই বলতে হবে। তারপর হঠাৎ তুমি আমায় রাণীচকে যেতে দেখলে। সেদিন যে তুমি আমার পিছু নিয়েছিলে তা বুঝতে পারিনি।"

রহস্য করিয়া বলিলাম, "বুঝতে পার্লে কি কত্তে?"

হাসিয়া বলিল, "হয়ত তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। যাক সে কথা। রাণীচকে যাওয়া নিয়ে যখন প্রশ্ন কর্লে তখন ঠিক যেটুকু জানতে চেয়েছ তার উত্তর দিয়েছিলাম। সেদিনও তুমি জিজ্ঞেস কত্তে গিয়েও থেমে গিয়েছিলে। তারপর এসে পৌছেছি আজকের দিনটায় Well—now you will have it।" বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল। তারপর বলিতে সুরু করিল, "But one thing যে ঘটনাটা বলছি, সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। এমন ঘটনা প্রায় সকলের জীবনেই ঘটেছে।"

বলিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "হয়ত বা তোমার জীবনেও—"

বলিলাম, "সে কথা ছাড়, এখন বলত শুনি।"

বিকাশ আরম্ভ করিল, "তখন আমি স্কটিশ কলেজে I. A. পড়ি। দেশের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলকাতায় এসেছি। কলকাতার আদব কায়দা বিশেষ শিখিনি। যা দেখি সবই নতুন লাগত, বয়সও ছিল তখন সব কিছুতেই চমকে ওঠার বয়স সেটা। হঠাৎ একদিন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটির নাম তুমি

জান, সুনীতি—কি করে আলাপ হল সে প্রশ্ন অবান্তর। শুধু 1st year এর শেষে দুজনেই বুঝলাম যে অতনুদেবের শরাঘাতে আমাদের দুজনের হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে।”

আমি ছিলাম কাঠ বাঙ্গাল, কথায় কথায় মারপিট কর্তে যেতাম, আরও নানারকম গোলমাল কর্তাম। কিন্তু মেয়েটা এমন অদ্ভুতভাবে আমায় শান্ত করে আনল যে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। তাদের বাড়ীতে যাতায়াতও সুরু হল। আমি তখন হোষ্টেলে থাকতাম। বড়লোকের ছেলে বলে হোষ্টেলে আমার খাতিরও ছিল খুবই এবং সুনীতির সঙ্গে যে আমার আলাপ জমে উঠেছিল তারও কারণ ঐ একই। কিন্তু তখন ত ওসব বুঝতাম না। তখন ভাবতাম বুঝি ভালবাসাই বড়—Love is above everything. এমনি করেত I. A. টা পাশ কর্লাম। তখন আমাদের প্রেম জমে উঠেছে। দুজনে খুব ঘুরে বেড়াতাম, আজ লেকের ধারে, কাল গঙ্গার ধারে, পশু বটানিকেল গার্ডেনে। আর দুজনে মিলে পরামর্শ হত আমাদের বিয়ের পরে কি ভাবে আমাদের সংসার পাতা হবে। Those silly dreams! এবং B.A টা পাশ করার পরই যে আমাদের বিয়ে হবে এ বিষয়ে কারুরই কোন সন্দেহ ছিল না। 3rd yearটা স্বপ্নের প্রাসাদ গড়েই কেটে গেল। এবং এক একদিন ভাবের আবেগে দুজনে যে কত বাজে কথাই বলেছি মাষ্টার তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে কেলেঙ্কারীও দু চারটে না করেছি তাও নয়—মানে”

কথাটা গোপন করিয়া ওষ্ঠের সশব্দ ভঙ্গীতে কেলেঙ্কারীর ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করিয়া দিল। আমি শুধু নীরবে হাসিলাম। বিকাশ বলিতে লাগিল, “অনেকদিন জোছনা রাত্রে তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে ভেবেছি স্বর্গ যদি কোথাও থাকেত সে বুঝি এইখানেই, সুখ বলে

যদি কিছু থাকেত সে এই প্রেয়সীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে—" এই পর্যন্ত বলিয়া একবার সহাস্যে স্বগতোক্তি করিয়া উঠিল, "Fools তখনও জানতাম না যে মেয়েদের সব কিছুতে অসঙ্কোচে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমার একটা ডাক নাম ছিল মণ্টু। বাবা আমায় আদর করে মণ্টু বলে ডাকতেন। কলকাতায় থাকতে আমার সে নামটা কেউ জানত না, একমাত্র সুনীতি ছাড়া। বাবা মা সব মারা যাবার পরও একমাত্র সেই আমায় ওই নামটা ধরে ডাকত। নামটা তাকে ইচ্ছা করেই বলেছিলাম। প্রায়ই এসে বলত, "বিয়ের পর কিন্তু আমরা কলকাতায় থাকব না মণ্টুদা। অন্য কোথাও চলে যাব।"

হেসে বলতাম, "বিয়েটা হোক্ আগে।" এই বিয়ে হওয়া নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেম বলে কতদিন কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। তার জন্ম-দিনে নেমন্তন্নে যেতে পারিনি বলে রাত্রি ১০৷৷০ টার সময় গাড়ী নিয়ে হোষ্টেলে এসে হাজির হয়ে কত কান্নাই কেঁদেছে মাষ্টার? সে সব চোখের জল জমিয়ে রাখলে ফ্যাক্টরীর পুকুরটা ভর্ত্তি হয়ে যেত।"

হাসিয়া বলিলাম, "হয়ত তা বুকের মধ্যে জমে আছে।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিল, "পাগল হয়েছ, she is a forgotten dream to me!"

বলিলাম, "তা হবে হয়ত। তার পর?"

বলিল, "তারপর? তার পরের ইতিহাস সামান্যই। অনেক স্বপ্ন দেখে, অনেক চোখের জল ফেলে, কবিতা লিখে চিঠি লিখে, শেষ পর্যন্ত একদিন সব গেল ভেস্তে। B.A. পরীক্ষার ঠিক একমাস আগে বাড়ীর থেকে সেই টেলিগ্রাম পেলাম যার কথা তোমায়

একদিন বলেছি। এবং দেশ থেকে ফিরে আসার পর তখন আমার মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা বলে বোঝাতে পার্ব না। সুনীতিকে সব কথা বল্লাম। ওত আমায় অনেক করে বোঝাল যে যা হবার তাত হয়েছেই, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়াই উচিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরীক্ষা হয় ত দিতাম না, শুধু সুনীতিই জোর করে পরীক্ষাটা দিইয়েছিল। দিলাম পরীক্ষা। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম একটা 1st class. শেষের কমাস নিজে টিউশনী করে নিজের খরচ জোগাড় করেছি। কারণ টাকাকড়ি গহনাপত্র যা ছিল, সব বাড়ীতেই ছিল। ব্যাঙ্কে রাখার কথা কেউ ভাবত না। ফলে সর্বস্বই মুসলমানে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। Result বেরুবার পর যখন সুনীতির বাবার কাছে বিয়ের কথা পাড়লাম, ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন। আমাদের বাড়ীর খবর তার কাণে এসে পৌঁছেছিল। তিনি ত আমতা আমতা করে যা বল্লেন, সোজা কথায় তার অর্থ হল, আমি চাকরী-বাকরী করি না, তা ছাড়া নিতান্ত নাবালক, আমার উপর ভরসা করে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি মোটেই রাজী নন। কি বলব মাষ্টার ইচ্ছা কর্ছিল শালার টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলে দিই। নির্লজ্জের মত বল্লাম, "আপনার মেয়ের ত এ বিয়েতে মত আছে।" বুড়ো বল্লে, "সে আর কতটুকু বোঝে—নিতান্ত ছেলে মানুষ ইত্যাদি—। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুনীতিকে রাস্তায় একা পেয়ে সব বল্লাম। সে ত শুনে খুব খানিকটা কাঁদল, শেষে বল্ল, "বাপ মায়ের অমতে বিয়ে করা কি উচিত হবে?" শুধু তাই নয় তাতে নাকি গুরুতর অমঙ্গল হবে। চুপচাপ চলে এলাম। সেই দিন যেন পৃথিবীটাকে চিনতে পার্লাম। একবার ভাবলাম আত্মহত্যা করি। তারপর ভাবলাম "তা কেন,

একটা মেয়ের জন্য শুধু শুধু নিজের প্রাণটা নষ্ট করি কেন?" জাহান্নামে যাক সুনীতি—তারপরেই চলে এলাম এইখানে—and here ends my story."

সত্যই ঘটনাটি ছোট এবং নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এবং ঘটনার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, যাহার ফলে মানুষটির জীবনটা স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্ত্তিত করিয়া অস্বাভাবিক পথে চলিয়া গেল। এবং ঘটনাটির সহিত তাহার বিগত জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিলেও, পরবর্ত্তী জীবনের উপর তাহার প্রভাব নাই বলিলেও চলে। এবং মনে হইল বিগত জীবনের সেই তুচ্ছ প্রেমের ব্যর্থতার সম্বন্ধে নিজের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, তাহার সমাধান করিতে গিয়া সে নিজের মনের মধ্য হইতে এমন কিছু অলৌকিক সত্যের সন্ধান পাইয়াছে যাহার দ্বারা সে নিজেই নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়াছে। একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সে জীবনের শত সহস্র জটিলতা-জাল হইতে নিজেকে অসঙ্কোচে মুক্ত করিয়া তুলিয়া, মহত্তর জীবনের পথে চলিয়া গিয়াছে। এবং ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল, সে প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সে নিজেই বলিয়া উঠিল, "এই প্রেমের ব্যাপারটা আমায় একটা জিনিষ শিখিয়েছে। জীবনে ব্যর্থ প্রেমিকের আক্ষেপ বহু শুনেছি মাষ্টার; এমন কি রাগের বশে ছুরি ছোরা মার্ত্তে যায় এমন কথাও শুনেছি। কিন্তু আমি ভেবে পাই না এটা কেমন করে হয়? আমারত মনে হয় ভালবাসা মানুষকে কখনও ছোট করে না, কর্ত্তে পারেও না। বরং ভালবাসা মানুষকে বড় করে দেয়—কথাটা হয় ত বুঝিয়ে বলতে পার্লাম না মাষ্টার। কিন্তু

নিজের মনের মধ্যে কথাটা যেন কেমন করে বুঝতে পেরেছি। মনে হয় Love kindles the heart so that it burns for others,

সুনীতির ব্যাপারে সেদিন সত্যই রাগ হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য তার কোন ক্ষতি কর্ব বা অনিষ্ঠ কর্ব এমন কথা ভাবিনি। এবং কেমন যেন একটা লজ্জা পেয়ে নিজেই পালিয়ে এলাম। সে লজ্জা যেন আমার নিজের জন্যই। বিশ্বাস কর মাষ্টার তাকে আমি সম্পূর্ণ ক্ষমা করেছি। এবং সে যে বাপ মায়ের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার্ল না, এর জন্যে তাকে যে যাই বলুক, আমি কোন দোষ দিই না। কারণ যতই B.A. পাশ করুক আর যাই করুক, বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে ত সে। সংস্কার কাটিয়ে ওঠা কি এতই সহজ? তা ছাড়া জন্মের পর থেকেই ত বাঙালী মেয়েরা পরাধীন. তাদের আর অপরাধ কি বল? তাই তার ওপর আমার কোন রাগ নেই, কোন অভিমান নেই। আমি ভাবি তার বাবার কথা, সেত আর ছেলে মানুষ ছিল না। তবে সে এভুল কেন কর্ল? কিন্তু তার ওপরও যে কোন রাগ আছে, তাও নয়। সত্যি বলছি তোমায় সুনীতিকে না পাওয়ার দুঃখ একদিন যতটুকু ছিল, আজ তার কিছুমাত্রও নেই। বরং একটা কথা কেবল মনে হয় যে আজকের দিনে আমি সত্যিই সুখে আছি। একটা সামান্য জীবনের মধ্যে আটকা পড়ে যে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকিনি এই যথেষ্ঠ। আজ বুঝতে পাচ্ছি যে শুধু ঘরের ভিতরের ছোট জগতটার মধ্যে জীবনধারণ করার জন্যে আমি জন্মাইনি। আমি জন্মেছিলাম ঘরের বাইরের জগতের মধ্যে হেসে খেলে বেঁচে থাকার জন্য। আমার সবচেয়ে আনন্দ হয় এই ভেবে যে I am all alone in this

world—তুমি জান না মাষ্টার এটা একটা কতবড় আশীর্বাদ বিধাতার। তাইত আজ সব মানুষই আমার কাছে সমান—বুঝেছি যে আমার কিছু হারাবার ভয় নেই সেই জন্যেইত কারুর কাছে কখনও মাথা নোয়াইনি। যা কিছু ভয় ছিল সব ভেঙ্গে গেছে। Really I am happy to day.” বিকাশ চুপ করিল। কারখানার পেটা ঘড়িতে সশব্দে ৪টা বাজিয়া গেল। বিকাশ একটা হাই তুলিয়া বলিল, “All right. আজকের মত এইখানেই শেষ হল। এবার একটু ঘুমিয়ে নিই। আবার ঘণ্টা দুই তিন বাদে উঠতে হবে, অনেক কাজ আছে।” আসিবার আগে বলিলাম, “একটা শেষ কথা জিজ্ঞাসা কর্তে পারি সত্যিকথা বলবে?” বলিল, “কি?” বলিলাম, “সত্যিই কি তুমি সুনীতিকে ভুলতে পেরেছ?” প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসিয়া বলিল, “তাই কি কখনও পারা যায় মাষ্টার? good night.” বলিয়া জোর করিয়াই আমায় সরাইয়া দিল।

ক্লান্ত পদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি শেষ হইতে বড় বেশী বাকী নাই। সমস্ত সহরটা নীরব নিস্পন্দ। কোথাও প্রাণের সামান্যতম সাড়াটুকুও নাই। কি একটা পরিচিত বেদনার প্রলেপে সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন করিয়া নামিয়া আসিল সুগভীর অবসাদ। এইমাত্র যে মানুষটির বিগত জীবনের গোপন কাহিনীটি শুনিয়া আসিলাম, নিজের মনের মধ্যে সেই মানুষটির কথাই যে নিজের অজ্ঞাতসারে চিন্তা করিয়া চলিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিয়া যেন চেতনা ফিরিয়া পাইলাম। ঘটনা হিসাবে সে যে কাহিনীটি বলিল, সত্যই তাহা নিতান্ত সামান্য। অথচ এই সামান্য ঘটনাটি এই মানুষটির জীবনকে যে পথে পরিচালিত করিয়া দিল, সে পথ সাধারণের পথ নহে। সাধারণ মানুষের জীবনে দেখিতে পাই প্রেমের ব্যর্থতা

তাহাদের মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, তাহার জের টানিয়া কত মানুষ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধ হয়। তাহাদের প্রত্যাশা ক্ষুব্ধ জীবনের ব্যর্থ অপচয়ের মধ্য দিয়া জীবনের প্রতি জাগে অশ্রদ্ধা, মানুষের প্রতি জাগে বিদ্বেষ এবং সন্দেহ। সাধারণ মানুষের জীবনে এইটাই স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবনের মধ্যে সামান্য সংঘাত যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাহাতে সাধারণের জীবনের সব সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া মোহমুগ্ধ অন্তরের বীভৎস নগ্নতা এমন কুৎসিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে তাহাকে আর মানুষ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। ইহার ভালমন্দ বিচার করা আমার কাজ নয়। এবং ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেও আপত্তি করিব না। প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা যখন অদৃষ্টের নির্মম আঘাতে স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন বেদনা-বিধ্বস্ত হৃদয়ের গোপনতম তলদেশে ক্ষমাহীন প্রতি-হিংসার যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া জানিতাম। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও যে হইতে পারে তাহা আজ যেন প্রথম জানিলাম।

চিরদিন শুনিয়াছি প্রেম মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয়, স্বার্থপর করিয়া দেয়, অতৃপ্ত করিয়া তোলে; কিন্তু প্রেম যে কোন কোন মানুষকে পথও দেখায়, তাহাকে তাহার স্বার্থবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবনের সংকীর্ণ সীমা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এমন অনাড়ম্বরভাবে সংযুক্ত করিয়া দেয়, তাহা জানিতাম না। একটি নারীর হৃদয়ের দৌর্বল্য বিকাশের জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে এক নিমেষে নির্মূল করিয়া দিয়াছে, তাহার চিরদিনের সুখস্বপ্নকে মুহূর্ত্তে ধূলায় মিশাইয়া দিয়াছে, অথচ তবুও তাহার জন্য

মানুষটির কোথাও কোন ক্ষোভ নাই। শুধু ত তাহাই নয়; সে নিঃশেষে সেই হৃদয়হীন নারীর চিরন্তন দৌর্বল্যকে হাসিমুখে ক্ষমা করিয়াছে। অভিযোগ করে নাই। এবং সুনীতি যে সংস্কারের কঠিন বন্ধন অস্বীকার করিতে পারে নাই, তাহার জন্যও মানুষটির কোন দুঃখ নাই। এমনভাবে ইহাকে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে যেন এইটাই সত্য এবং স্বাভাবিক। সাধারণের মত এই মানুষটি প্রেমের ব্যর্থতাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া, অসহায় কাতরোক্তি করিয়া নিজের অপমান করে নাই। বরং সস্মিতমুখে প্রেমের বেদনাটুকু সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়া, প্রেমের গৌরব এবং আনন্দকে জীবনের সর্বোচ্চ আসন দিয়াছে। একটি নারীর ভালবাসাকে সে লোভীর মত রুদ্ধদ্বার গৃহকোনে বসিয়া রাখিয়া চাকিয়া উপভোগ করে নাই, সে সুযোগও আসে নাই। বিচ্ছেদ যখন আসিয়াছে তখন অকম্পিত হৃদয়ে সে বিচ্ছেদের বেদনা আপন অন্তরের মধ্যে গোপন রাখিয়া, অচরিতার্থ প্রেমের যোগ্য মর্য্যাদা দিয়াছে। তাহার প্রেম তাহাকে নির্ভীক করিয়াছে, উদার করিয়াছে, মহৎ করিয়াছে—। সেই নারীর তুচ্ছ প্রেমের অনির্বাণ স্মৃতির আলোকে মানুষটা জীবনের জটিলতম পথে, শঙ্কাহীন চিত্তে, দ্বিধাহীন দৃপ্ত পদে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কোথাও বাধা পায় নাই। মনে মনে তাহার পুরুষ চিত্তের অসামান্য বলিষ্ঠতাকে প্রণাম জানাইলাম। এবং মনে মনে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিলাম যে সত্যই সে বাঁচিয়া গিয়াছে। যাহাকে পাইলে তাহার জীবন সার্থক হইত বলিয়া মনে হয়, তাহাকে না পাওয়ার দুঃসহ বেদনাই তাহার জীবনটাকে অধিকতর সার্থকতার পানে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। তাই সেই জিতিয়াছে—সুনীতি হারিয়াছে।

বিবাহোত্তর জীবনে সুনীতি হয়ত তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

কর্মহীন অবকাশ মুহূর্ত্তে এই যুগ-বিস্মৃত প্রেমের স্মৃতিখানি চকিতের জন্য তাহার মর্ম-মানসকে সামান্য দোলা দিয়া যায়; ইহার বেশী হয় ত কিছু নয়। কিন্তু এই মানুষটি তাহার জীবনের প্রথম প্রেমের স্মৃতিখানি মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলে নাই, ভুলিতে দেয় নাই। নিজের প্রতিটি চিন্তাধারার মধ্যে, প্রতিটি কর্মের মধ্যে, সেই বিস্মৃতিহীন প্রেমের বেদনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে সেই নারীকে স্মরণ করিতেছে। এবং এই যে বিরহদীপ্ত প্রেমের আলোকে তাহার জীবন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার জন্য প্রাপ্য গৌরব সুনীতির নহে, বিকাশের নিজের।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখি বিকাশ ঘরে নাই। খবর লইয়া জানিলাম ৬॥৽টা নাগাদ কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ রাত্রে মাত্র ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিয়াছে। যথা সময়ে কারখানায় যাইবার জন্য বাহির হইয়া দেখি ধর্মঘটরত শ্রমিকদের বিরাট জনতা কারখানার চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া রহিয়াছে। সকলের মুখে চোখেই একটা অদ্ভুত পৈশাচিক উল্লাসের ছাপ। পাঠান এবং পাঞ্জাবীগুলা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে. "চাক্কা বন্ধ হো।—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।" কারখানার গেটে দুইটি সশস্ত্র প্রহরী বরাবরের মত মোতায়েন করা হইয়াছে। খোলা গেটটার মধ্য দিয়া কারখানার ভিতর যতদূর দৃষ্টি চলে, একটাও মানুষ দেখা যায় না। বাঙালীদের অধিকাংশের মুখেই একটা উদ্বেগের চিহ্ন এবং বেশ বুঝিলাম কারখানায় ঢুকিবার ইচ্ছা তাহাদের পুরামাত্রায়ই আছে। কিন্তু পাঠান এবং পাঞ্জাবীদের ভয়ে ঢুকিতে পারিতেছে না। বিকাশকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া একটি পাঠানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পাশাপাপাশি গ্রামগুলিতে যে

সব ছোটখাট কারখানা আছে তাহাদেরও ধর্মঘট করার কথা ছিল। তাহারা করিয়াছে কিনা তাহাই সে দেখিতে গিয়াছে। গোটা ১১টা নাগাদ বিকাশ আসিয়া হাজির হইল। ঘামে এবং ধূলায় সমস্ত মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। চুলগুলি রুক্ষ। মুখে অনিদ্রাজনিত অত্যাচারের স্পষ্ট ছাপ। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সাইকেল হইতে নামিয়া দুই চারিজন ধর্মঘটিদের কি যেন বলিল, এবং তাহারা তাহা শুনিয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইল সেটা তাহাদের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল।

(৪)

বেলা ১২টা নাগাদ মুখার্জী সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। ধর্মঘট করাতে তিনি যে বিশেষ খুশী হন নাই, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যায়। তিনি যে সাবডিভিসনাল Head quarter এ পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন পাঠাইয়াছেন, তাহাও তিনি তাঁহার কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সোজা ফ্যাক্টরীর মধ্যে গিয়া কয়েকজন লোকের সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বলিয়া বাহিরে আসিয়া একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন। যাহার অর্থ এই যে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য কারখানার কর্মভার সরকার নিজেই সাময়িকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব অযৌক্তিক কারণে অনুপস্থিত হইলে ভারতরক্ষা-বিধানে শুধু যে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে তাহাই নহে, উপরন্তু জেলে যাইবার ব্যবস্থাও করা

হইবে। কিন্তু সে সব কথা শুনিবার মত অবস্থা কাহারও ছিল না। তাই মুখার্জী সাহেবের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অগণিত মানুষের চীৎকারের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। সাহেব মুখ লাল করিয়া ক্রোধকম্পিত পদে কারখানায় ঢুকিয়া গেলেন। বাকী দিনের মধ্যে কোথাও কোন গোলযোগ হইল না। এবং বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই ধর্মঘটের প্রথম দিন শেষ হইয়া আসিল।

সন্ধ্যাবেলা বিকাশ মেসে আসিল। সারাদিনের মধ্যে সকাল বেলায় তাহাকে একবার দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। তারপর সে আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এখন ফিরিল। তখনও হাতমুখ ধোয় নাই এবং শুনিলাম সারাদিন খাওয়া হয় নাই।

বলিল, "চল একবার মিঃ ঘোষের বাড়ী থেকে ঘুরে আসা যাক। বৌদি কাল ডেকে পাঠিয়েছিলেন, শুনে আসি কি বলছেন।"

হাসিয়া বলিলাম, "তোমার মনে আছে দেখছি।" বলিল, "বাঃ, মনে থাকবেনা? এ ডাক একবার যে শুনেছে সেকি ভুলতে পারে?"

কাল রাত্রির পর হইতে এই তাহার সহিত প্রথম দেখা। এবং কাল তাহার অজ্ঞাত পরিচয়টুকু জানিবার পর হইতেই তাহাকে যেন নূতন রূপে দেখিলাম। এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলাও যেন সহজ হইয়া আসিল। এতদিন তাহার কথাবার্তায়, কাজের মধ্যে একটা অজ্ঞাত রহস্যের সুর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে যেন জটিল করিয়া তুলিত। এবং সর্বদাই তাহার সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়া তাহাকে আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিত। কিন্তু আজ তাহার সহিত সহজ ভাবে কথা বলিতে পাইয়া মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি অনুভব করিলাম। দুইজনে মিঃ ঘোষের বাড়ীতে আসিতেই, মিঃ

ঘোষের ছেলেমেয়েগুলি কলধ্বনি করিয়া উঠিল।

বৌদি রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিকাশের ধূলি ধূসরিত শ্রীহীন মলিন চেহারা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, একি চেহারা হয়েছে? সারাদিন ছিলে কোথায়?"

বিকাশ বলিল, "একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। ফিতে দেরী হয়ে গেল। আমার কিন্তু সারাদিন খাওয়া হয়নি বৌদি; জলদি জলদি কিছু খেতে দিন, আমি ততক্ষণ চান করে আসি।" বলিয়া বৌদিকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া বাথরুমে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বৌদি তবুও চেঁচাইয়া বলিলেন, "আমার কাছে তোমার দরকার বুঝি শুধু খাবার বেলায়? আর অন্য সময় ডেকে না পাঠালে আসা হয় না।" বিকাশ কোন জবাব না দিয়া ভাঙ্গা গলায় গান ধরিল। এবং প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া চান করিবার পর বাহিরে আসিয়া গা মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি বলছিলেন বৌদি?"

কৃত্রিম রাগের সহিত বৌদি বলিলেন, "বলছিলাম আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "সেটাত সব শেষে। এর আগে কি বলছিলেন।"

বৌদি উত্তর না দিয়া খাবার তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। খাবার দিয়া আমাদের তিনজনকে ডাকিলেন। আমি, বিকাশ ও মিঃ ঘোষ একসঙ্গে খাইতে বসিলাম।

বৌদি বলিলেন, "আচ্ছা বিকাশ, আবার কি কাণ্ড আরম্ভ কর্লে শুনি?"

খানতিনেক লুচি একসঙ্গে মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "কি কাণ্ড কর্লাম আবার?"

বৌদি বলিলেন, "আবার এইসব ধর্মঘট কর্মঘট কিসের জন্য! শুধু শুধু—"

বাধা দিয়া হাত নাড়িয়া বিকাশ বলিল, "ওসব, আপনি মেয়ে মানুষ, বুঝতে পার্বেননা ?"

বৌদি বলিলেন, "না, বুঝবনা। শুধু তোমরাই বোঝ। খুব বুঝি—"

বিকাশ বলিল, "উহুঃ না। এ-সব ভারি Serious জিনিষ বুঝবেন না।"

বৌদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "আমার পিণ্ডি।"

বিকাশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরে, না, না। আপনার পিণ্ডিত সামান্য জিনিষ। এ-তার চেয়েও Serious।"

বৌদি রাগিয়া বলিলেন, "আমায় রাগিওনা বিকাশ—ভাল হবেনা। আচ্ছা মজুর খেপান ছাড়া আর কোন কাজ বুঝি নেই তোমার ?"

ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।"

সহসা বৌদি কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিলেন, "সত্যি বলত বিকাশ, তোমার নিজের জীবনটার সম্বন্ধে বোধ হয় একটুও ভয় নেই তোমার তাই না ?"

বৌদির প্রশ্নে গতরাত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিকাশও একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া, বৌদির দিকে ফিরিয়া বলিল, "প্রাণের ভয় নেই, এমন মানুষ আছে নাকি ?"

বৌদি বিকাশের কথায় পরিহাসের সুর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "না থাকলে তুমি আছ কি করে ?"

বিকাশ নিজের পানে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, "আমার প্রাণের

ভয় নেই, বলেন কি ?”

বৌদি বিকাশের শূন্য পাতে আরো গোটা কয়েক লুচি দিতে দিতে বলিলেন, “ছাই আছে। থাকলেত বেঁচে যেতাম। সত্যি এক এক সময় ভারি ভয় হয় তোমার কথা ভেবে। আচ্ছা এ ধর্মঘট বন্ধ করা যায় না।” বিকাশ এ সমস্ত কথার কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে খাইতে লাগিল। বেশ বুঝিলাম কি একটা কথা বলিবার জন্য বৌদি মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। একটু থামিয়া বৌদি মিঃ ঘোষকে বলিলেন, “হ্যাঁগো, যায়না বন্ধ করা ?”

স্বল্পভাষী মিঃ ঘোষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “যায় কি না যায়, ওই মহাত্মাকেই জিজ্ঞাসা কর।” হঠাৎ যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বৌদি বলিয়া উঠিলেন, “নিশ্চয়ই বন্ধ করা যায়; তোমার কথা ত সকলেই শোনে—তুমি বল্লে নিশ্চয়ই মিটে যাবে। লক্ষ্মী ভাইটি মিটিয়ে দাওনা—তোমার পায়ে পড়ি।”

তাঁহার স্নেহকাতর কণ্ঠস্বরে কতখানি ব্যাকুলতা মাখান ছিল তাহা শুধু আমরাই জানি। এই অনাত্মীয় মানুষটির বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মমতাময়ী নারীচিত্ত মথিত করিয়া কি গভীর উদ্বেগই না সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কথাটা বলিয়া বৌদি বিকাশের হাত ধরিতে যাইতেই, বিকাশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আরে, আরে, করেন কি বৌদি। কি হল বলুন ত আপনার ?”

“কি আবার হবে, কিছুই হয়নি,” বলিয়া ত্রস্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এবং তিনি যে চোখের জল গোপন করিবার জন্যই সহসা উঠিয়া গেলেন তাহা আমাদের কাহারও বুঝিবার বাকী রহিল না। বিকাশ অপরাধীর মত মিঃ ঘোষের পানে চাহিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, “কি ব্যাপার বলুন ত।”

মিঃ ঘোষ কোন কথা না বলিয়া খাইতে লাগিলেন।

আমার বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তপটে বৌদির সেই স্নেহ-কাতর মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল।

(৫)

সে রাত্রে কাহারও ঘুম হইল না। খবর পাওয়া গেল কাল সকালের মধ্যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আসিয়া পড়িবে, এবং জোর করিয়া লোকদের কাজে পাঠান হইবে। খবরের শেষাংশ কতদূর সত্য জানা গেল না। কিন্তু সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ খবরটা এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল যে, সেই রাত্রেই বিকাশ চলিয়া গেল কুলি লাইনে। সেখানে উত্তেজিত পাঠান এবং শিখেরা নাকি কারখানায় আগুন লাগাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। বিকাশ ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত শুইতে পারিলাম না। রাত্রি ২টা নাগাদ বিকাশ ফিরিয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার হে?" দেখিলাম তাহার মুখেও উদ্বেগের অদৃশ্য ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

বলিল, "আর্মড পুলিশ আসছে; এ খবর ঠিক। কাল সকালে একবার মুখার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্তে হবে। আজ রাত্রেই কর্তাম, কিন্তু পাঠানগুলো এমন মদ খেয়েছে যে, ভয় হল, এখন গেলে হয়ত একটা কেলেঙ্কারী করে বসবে। ওদের ত বিশ্বাস নেই।"

বলিলাম, "ফ্যাক্টরীতে আগুন লাগাবার কথা শুনছিলাম, সেটা কি সত্যি নাকি?"

হাসিয়া বলিল, "হাঁ, সে মতলবও করেছিল। অনেক বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। কিন্তু ভাবছি,—দেখি কাল সকালে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

ভোরবেলা মেসের চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?"

সে বলিল, "ঘোষ সাহেবকা কোঠীসে মাইজী বোলাতা হেঁয়।"

অবাক হইয়া গেলাম, "মাইজী বোলাতা হ্যায়?"

বলিলাম, "কেঁও বোলায়া, কুছ মালুম হ্যায়?"

মাথা নাড়িয়া বলিল, "নেহি, লেকিন জলদি যানে বোলা, আভি—"

কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া জামাটা গায়ে দিয়া ছুটিয়া মিঃ ঘোষের বাড়ীতে আসিয়া পৌছাইতেই দেখি দরজার কাছে বৌদি দাঁড়াইয়া আছেন। আমায় দেখিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ ভাই; শিগ্রী যাও মুখার্জী সাহেবের বাড়ীর দিকে, বিকাশ গেছে; সঙ্গে একদল লোক রয়েছে। ওঁকেও পাঠিয়েছি, তোমরা দুজনে ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আন না ভাই।"

গতকাল রাত্রে বিকাশ বলিয়াছিল বটে যে সকাল বেলায় সে মুখার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবে। ভাবিলাম বৌদিকে বলি ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু হঠাৎ মনে হইল এত সকালে তাহার যাইবার প্রয়োজন কি? কথাটা বলিতে গিয়া নিজের মনেও কেমন একটা ভয় হইল। সত্যিই যদি কিছু একটা সে করিয়া বসে।

বৌদিকে বলিলাম, "আচ্ছা যাচ্ছি আমি। আপনি ভিতরে যান।"

বলিয়া আবার মুখার্জী সাহেবের বাংলোর দিকে ছুটিলাম। সেখানে পৌছিয়া দেখি প্রায় দুই তিনশ লোক জড় হইয়া আছে। কোন-রকমে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখি গোলমালের আশঙ্কা

করিয়া মুখার্জী সাহেবের বাংলো পাহারা দিবার জন্য যে দুইজন বন্দুকধারী প্রহরী ছিল, বিকাশের সঙ্গের লোকগুলা তাহাদের বন্দুক দুইটা কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এবং বাংলোর সামনের লনটায় বিকাশ এবং মুখার্জী সাহেব দাঁড়াইয়া আছে।

বিকাশ বলিতেছে, "আপনি আর্মডপুলিশ আনালেন কেন?"

মুখার্জী সাহেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ইংরেজীতে উত্তর দিলেন যে এ প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি রাজী নহেন। বিকাশ শান্ত কণ্ঠে বলিল, "দেখুন মিষ্টার মুখার্জী; আপনার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যে ফ্যাক্টরীর ওয়ার্কারদের উপর যদি কোন রকম অত্যাচার হয়, তাহলে আপনিও বেঁচে থাকবেন না।"

মুখার্জী সাহেব মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "Don't threaten me. I will teach you such a good lesson that you will never forget in your life—if you wish your safety just leave this place at once."

মুখার্জী সাহেবের উদ্ধত্য সত্যই বিস্ময়কর। পাঠানগুলা ইংরেজী বোঝে না, একজন চীৎকার করিয়া বিকাশকে জিজ্ঞাসা করিল, "শালাকো বাচ্চা কেয়া বোলতা?"

গালাগাল শুনিয়া মুখার্জী সাহেব লোকটাকে মারিবার জন্য আগাইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেই, বিকাশ সবলে তাহার হাত ধরিয়া টান দিতেই, তিনি বেশ কিছুটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেলেন। বিকাশ তাঁহার ভালর জন্যই তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। কারণ সেই পাঠান জনতার মধ্যে একজনকে মারিলে মুখার্জী সাহেবকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কিন্তু মুখার্জী সাহেব তাহা বুঝিতে না

পারিয়া বোধহয় ভাবিলেন যে বিকাশ তাহাকে অপমান করিতে চাহিয়াছে। এবং কাছেই মাটি খুঁড়িবার একটা শাবল পড়িয়াছিল; হঠাৎ সেইটা তুলিয়া তিনি বিকাশকে মারিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান পাঠানদের মধ্য হইতে কে একজন একটা লোহার ডাণ্ডা বিকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। বিকাশ সেইটা তুলিয়া লইয়া আত্মরক্ষার জন্য আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে—হঠাৎ মুখার্জী সাহেবের বাংলো হইতে তাহার স্ত্রী পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "মণ্টু দা, ওঁকে মের না।"

এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা নারীর কণ্ঠে নিজের বহু যুগ বিস্মৃত পুরাতন নাম শুনিয়া আত্মবিস্মৃত বিকাশ তাহার পানে ফিরিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কে? সুনীতি?" সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জী সাহেবের শাবলের প্রচণ্ড আঘাতে গুরুতর আহত হইয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বিকাশ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। এতক্ষণ পাঠান এবং শিখগুলি বিকাশের আদেশমত গেটের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। বিকাশকে আহত হইতে দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে লনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মুখার্জী সাহেব প্রাণ ভয়ে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেলেন। এবং ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটিয়া গেল যে ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এবং ঠিক সেই সময় পিছন হইতে ঘন ঘন বারকয়েক বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম। বুঝিলাম সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে।

তাহার পরের খবর সঠিক জানি না। আমার যে কি হইয়াছিল জানি না। এবং কেমন করিয়াই যে বাহিরে আসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। পরে মিঃ ঘোষের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি এবং একটা পাঞ্জাবীতে মিলিয়া আমার অচৈতন্য দেহটাকে কোন রকমে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। উত্তেজিত জনতার উপর গুলি বর্ষণের ফলে

প্রায় ১০।১২ জন মারা গিয়াছে। এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। ইহার পর কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পুলিশের অত্যাচার চলিল। তাহার বিশদ বিবরণী দিবার চেষ্টা না করাই ভাল। শুধু বিকাশের খবর লইয়া জানিলাম যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবৈধ জনতা সৃষ্টি করা এবং নরহত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া সে হাজতে আছে।

৮ম পরিচ্ছেদ

(১)

কয়েকদিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া জেল হাসপাতালে বিকাশের সঙ্গে দেখা করিলাম। কাঁধে একটা বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাধা। শুনিলাম তাহার কাঁধের হাড়টা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এবং হাতখানা চিরদিনের মত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। আমায় ঢুকিতে দেখিয়া তাহার বেদনা-পাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল "এসেছ মাষ্টার? আমি জানতাম তুমি আসবে।"

এই অবস্থায় তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলাম, "এখন কি রকম আছ?"

হাসিয়া বলিল, "আর থাকাথাকি কি? এখান থেকে বেরুলেত আবার শ্রীঘর বাস!" চুপ করিয়া রহিলাম। তাহাকে সাহস বা সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। কারণ যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে তাহার নিষ্কৃতির কোন আশাই করা যায় না। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশকে বহু টাকা দিয়া কেসটাকে বেশ মনোমত করিয়া সাজাইয়া লইয়াছেন। সাক্ষীসাবুদেরও অভাব হয় নাই। সে আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "কি ভাবছ মাষ্টার?"

বলিলাম, "ভাবছি কি করা যায়।"

বলিল, "কিছু ভাবতে হবে না। যা হবার তা হবে। ওসব বাদ দাও। তারপর—বৌদি কেমন আছেন? মিঃ ঘোষ?"

একে একে সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। পুলিশের গুলিতে কতজন মরিয়াছে, কতজন আহত হইয়াছে, ধর্মঘট আরও কতদিন চলিল এবং শেষ পর্যন্ত কি ভাবে মিটিল ইত্যাদি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর খবর লইল। এবং সবশেষে একটু হাসিয়া বলিল, মিসেস্ মুখার্জীকে চিনতে পারলে মাষ্টার ?"

কথাটি বলিবার সময় অব্যক্ত বেদনার দুঃসহ আবেগে তাহার মত মানুষের কণ্ঠস্বরও কাঁপিয়া উঠিল বলিয়া মনে হইল। বলিলাম, "চিনব না ? মণ্টুদা বলে তোমায় ডাকে এমন লোক একজনই আছে।" নীরবে মাথা নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িল। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর তাহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু দেখা করিতে পাই নাই।

বিকাশের অভাব এমন নিবিড় ভাবে অনুভব করিলাম যে তাহা হয়ত প্রকাশ করিতে পারিবনা। তাহার অভাবে চারিদিক হইতে এমন একটা শূন্যতা আমায় ঘিরিয়া ধরিল, মনে হইতে লাগিল বুঝিবা শ্বাসবদ্ধ হইয়া মারা যাইব। মেসের লোকজনদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করি নাই, ফলে সেটা যেন একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বিকাশ থাকিতে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করি নাই, কিন্তু আজ বিকাশের অনুপস্থিতিতে তাহাদের মধ্যে থাকিতে গিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। সে যে আমায় কতখানি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া ছিল এবং তাহার অন্তর্ধান যে আমায় কতখানি নিরাশ্রয় করিয়া দিয়াছে, তাহা যেন আজ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম। চিরদিনই আমি একা—ছাত্রজীবনের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত কোথাও কখনও কোন সঙ্গী জোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবুও মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও

নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করি নাই। কিন্তু বিকাশের সঙ্গে পরিচয়ের পর হইতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহাকে আমার নিজের জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, যে কোনদিন যে সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিব, এমন কথা ভাবি নাই। আজ সহসা অদৃষ্টের নির্মম আঘাতে যখন সেই বিচ্ছেদ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন গভীর বেদনার সহিত অনুভব করিলাম, যে সেই মানুষটি আমায় কি নিঃসীম নিঃসঙ্গতার মাঝে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। প্রতিপদে পদে তাহার অভাবের বেদনা অর্দ্ধবিস্মৃত গানের চরণের মত কারণে অকারণে বাজিয়া উঠিত। কতরাত্রে উৎকণ্ঠিত আবেগে জাগিয়া উঠিয়াছি, মনে হইয়াছে এখনই হয়ত পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিব, হয়ত বা এখনই পাশের ঘর হইতে বেহালার সকরুণ সুর ভাসিয়া আসিবে। মনে আছে একদিন মধ্যরাত্রে কিসের একটা আওয়াজ শুনিয়া ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া অনিশ্চিত প্রত্যাশায় বলিয়া উঠিয়াছিলাম. "বিকাশ নাকি?" প্রত্যুত্তরে খোলা জানালাটা দিয়া মেসের বিড়ালটা লাফাইয়া পলাইয়া গেল। এবং যাইবার আগে তাহার জান্তব ভাষায় শব্দ করিয়া হয়ত বা আমার ব্যাকুল হৃদয়ের অসম্ভব আশাকে বিদ্রূপ করিয়া গেল।

(২)

নিম্ন আদালত হইতে বিকাশের মামলা দায়রা আদালতে গেল। শুনিলাম বিকাশের পক্ষসমর্থনের জন্য কলিকাতার একজন বিখ্যাত উকিল নিযুক্ত হইয়াছেন। সেইদিন আদালতের অনুমতিক্রমে বিকাশের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। একমুখ দাঁড়ি গোঁফের মধ্য দিয়া বিকাশকে হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। কাছে যাইতেই তাহার পরিচিত হাসি হাসিয়া বলিল, "এখানেও এসেছ? তুমি দেখছি আমায় ছাড়তে পার্বেনা।"

সামান্য কয়টি কথা, পরিহাসচ্ছলে বলিল। কিন্তু তাহার সস্মিত-মুখের ঐ কয়টি কথা যেন আমায় চঞ্চল করিয়া দিল। ভাবিলাম বলি, সত্যিই তোমায় ভুলতে পার্ব না বিকাশ, তোমায় ভোলা অসম্ভব।" কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিলাম, "তুমি উকিল পেলে কোথায়?"

চুপি চুপি বলিল, "বেলা, আমার ছোট বোন। যার কথা তোমায় বলেছিলাম, মনে আছে। সেই ঠিক করে দিয়েছে। ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বলিয়া চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিল। দেখি কিছুটা দূরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে বেলা আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি এখন আছেন কোথা?"

বিকাশ আমার মুখের পানে এক মুহূর্তের জন্য চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কলকাতায়—আমিই জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।"

বলিলাম, "ওর, তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়েছে?"

মাথা নাড়িয়া বলিল, "ক্ষেপেছ; এখন যদি ওর সাথে কথা বলি তাহলে কি আর কেলেঙ্কারীর শেষ থাববে? তাছাড়া ও নিজেই বারণ করেছে।" বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "একটা কথা বলব, রাখবে মাষ্টার?"

তাহার অনুরোধের ধরণ দেখিয়া বলিলাম, "আমায় তুমি এমনি করে বোল না বিকাশ। যা বলবার—"

বাধা দিয়া বলিল, "Sorry, Sorry আর বলব না। বলছিলাম ও আজ রাত্রে কলকাতা চলে যাবে। তুমি বরং ওর সঙ্গে একটু পরিচয় করে রাখ, ভবিষ্যতে আমার দরকার হতে পারে। অবিশ্যি আলাপ কত্তে তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

তাহার শেষ কথাটি আমার অন্তরে তীব্র আঘাত করিল। ব্যথিত হইয়া বলিলাম, "আপত্তি হবার মত কোন্ কারণ আছে কি?"

আমার আহত কণ্ঠস্বরে সে হাসিয়া ফেলিল, অর্থপূর্ণ হাসি। বলিল, "আছে বই কি! you know what she is?"

আমি জানি সে কথাগুলি আমায় পরিহাস করিবার জন্ম বা আঘাত দিবার জন্ম বলে নাই। বরং ভদ্রসমাজের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী একটা পতিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা বলা যে উচিত নয়, এই কথাটাই সে প্রকারান্তরে জানাইয়া দিল। কিন্তু যেদিন হইতে বেলার কাহিনী শুনিয়াছি, সেইদিন হইতে তাহার প্রতি একটা সকরুণ সহানুভূতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ যে জীবনযাপনের জন্ম সমাজের কাছে সে ঘৃণার পাত্রী হইয়াছে, সে জীবনের জন্ম দায়ী যে প্রতিকূল পরিবেশ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তিত তাহার ছিল না। সমাজের চোখে সে যত ছোটই হউক না কেন, তাহার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যে তাহাকে তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ

স্বপ্ন নিজ হাতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে হইয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া সেই নিরপরাধিনীকে, সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিলাম। তাই তাহার সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করাইয়া দিবার জন্য বিকাশ যখন তাহার ব্যক্তিগত জীবন যাত্রার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "you know what she is."

তখন তাহার উত্তরে শান্তস্বরে বলিলাম, "জানি। কিন্তু সেইটাই ওঁর সবখানি পরিচয় নয়।" বিকাশ কোন কথা না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

৩

পুলিশ এবং পয়সার সংযোগে অসম্ভবও সম্ভব হয়। হইলও তাহাই। অগণিত সাক্ষী অসঙ্কোচে হলপ করিয়া অসংখ্য মিথ্যা কথা বলিয়া গেল। এবং যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বিকাশের সম্বন্ধে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। এবং নীরবে লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম মামলার অবস্থা যতই সংশয়জনক হইয়া উঠিতে লাগিল, বৌদির সুন্দর মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু, তাঁহার আচরণের সেই সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীটুকু যেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। বিকাশের খবর নিজ হইতে আর জিজ্ঞাসা করিতেন না। আমি অথবা মিঃ ঘোষ যখন কোন খবর শুনাইতাম, তখন নিঃশব্দে সব শুনিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতেন। বেশ বুঝিতাম তাহার মনের সহজ আনন্দটুকু বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া

হইয়া গিয়াছে। উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগ-দীপ্ত বিকাশের শিশু-সুলভ চাঞ্চল্যে তাঁহার নারীচিত্তের তলদেশ হইতে, চিরন্তন মাতৃস্নেহের উদার উৎস-নিঃসৃত যে স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহসুধা-মাধুর্য অবিরল ঝরিয়া পড়িত, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু কর্ত্তব্য-কঠিন সংসারের জটিল পথ সুচিন্তিত পদক্ষেপে পার হইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নাই। ইহা যে কত বড় ক্ষতি তাহা উপলব্ধি করিয়াও ইহার প্রতিকার করার মত কোন শক্তি আমার ছিল না।

শেষ পর্যন্ত যে-দিনটির জন্য গভীর উৎকণ্ঠা বুকে করিয়া, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই দিনটি আসিয়া হাজির হইল। বিকাশের মামলার রায় বাহির হইল। বেদনা-সংক্ষুব্ধ ক্লান্ত হৃদয়ে সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ঘোষের বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলাম। মিঃ ঘোষ আমার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "রায় বেরুল?" ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম রায় বাহির হইয়াছে। কিন্তু সহসা কথা বলিতে পারিলাম না। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিয়াছে, গলার মধ্যে সমস্ত কিছু যেন জমিয়া গিয়াছে। মিঃ ঘোষ বলিলেন, "কি হল?" অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া, মাটির পানে মুখ রাখিয়া, কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "১০ বছর দিয়ে দিলে, জুরীদের unanimous verdict—" কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না। হঠাৎ অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া বৌদি জ্ঞান হারাইয়া খাটের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মিঃ ঘোষের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মনে পড়িল দুইটা জরুরী কাজ আমায় করিতে হইবে। প্রথম কাজটা তেমন কিছু নয়। "বেলাকে

বিকাশের খবর জানাইয়া আসা। যদিও উকিলবাবু বলিলেন বিকাশের কথামত তিনি একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন, তবুও বিকাশ বলিল যে আমার নিজে গিয়া দেখা করিয়া বেলাকে বুঝাইয়া বলায় বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি সত্যই গুরুতর। বিকাশ শেষ মুহূর্তে বলিয়াছিল, "মিষ্টার মুখার্জী সাহেবকে কোন রকমে জানিয়ে দিও, উনি যেন ট্র্যান্সফার নিয়ে দু'একদিনের মধ্যেই অন্য কোথাও চলে যান।" এবং হঠাৎ এই অদ্ভুত সংবাদ দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে চাহিতেই বলিল, "মানে আমার জেলের খবর শুনে, কয়েকটা পাঠান খুব ক্ষেপে গেছে। আমার মনে হয় ওরা হয়ত কিছু একটা কর্বে। সুনীতির কথা মনে করে ভয় হয়। তুমি যে কোন উপায়ে খবরটা দিয়ে দিও মাষ্টার? অন্ততঃ আমার নাম করেও বলে দিও আমি বলতে বলেছি।" কথাটা শুনিয়া নির্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া ভাবিয়াছিলাম কি অদ্ভুত মানুষ। যাহার জন্য তাহার এতবড় সর্বনাশ হইল, শেষ মুহূর্তেও তাহার অমঙ্গল কামনা করিতে পারিল না। কিন্তু যাক্ সেসব কথা।

এখন মুখার্জী সাহেবকে খবরটা দিই কি উপায়ে? আগাগোড়া কিছু না ভাবিয়া সোজা মুখার্জী সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। দরওয়ান জানাইল যে এখন দেখা হইবে না। এবং বারবার অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হইল না। শুনিলাম বিকাশের শাস্তির আদেশ শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে তিনি সদলবলে ডিনার খাইতেছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপরাধীর মত কুণ্ঠিত পদে চলিয়া আসিলাম। এবং বিকাশের অস্পষ্ট ইঙ্গিতের কথা স্মরণ করিয়া একটা অপরিচিত আশঙ্কা মনটাকে অবশ করিয়া দিল। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছুক্ষণ

ঘুরিয়া মেসে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু কেবলই মনে হইতে লাগিল মেসে না আসিলেই ভাল হইত। যতদিন বিকাশের মামলা চলিতেছিল, ততদিন তাহার মুক্তির সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব নানা কল্পনার দ্বারা মনে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি। কিন্তু আজ সব আশা নির্মূল হইয়া গেল বিচারকের সংক্ষিপ্ত ভাষণের দ্বারা। মনে হইল কে যেন আমায় আমার শান্ত-গৃহকোণের আশ্রয় হইতে সবলে টানিয়া আনিয়া, একদল রক্তলোলুপ মানুষের স্পর্শ-কলুষিত পৈশাচিক আবেষ্টনীর মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল। মাথার মধ্যে সবকিছু উলট-পালট হইয়া যাইতে লাগিল। টলিতে টলিতে উপরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালবেলায় উঠিয়া সভয়ে শুনিলাম গতরাত্রে কাহারা মুখার্জী সাহেবের ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া নৃশংসভাবে তাহাকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। আক্রমণকারীদের বাধা দিতে গিয়া তাহার স্ত্রীও গুরুতর আহত হইয়াছেন। মনে মনে বুঝিলাম রাত্রের অন্ধকারে বিকাশের অনুচরেরা বিকাশের প্রতি অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ রক্তের অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

(৪)

দিনদুয়েক পরে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলাম, বেলার সহিত দেখা করিবার জন্য। তাহার ঠিকানা আমার কাছে ছিল। নির্দ্দিষ্ট গলিতে ঢুকিয়া দুইধারের বাড়ীর দুধারে সজ্জিতা দেহ বিক্রয়কারিনীদের দেখিয়া সহসা মনে হইল, হয়ত বা ইহাদের মধ্যে বেলার মত আরও কত অসহায় নারী, তাহাদের ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার বোঝা নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে। বেলার মত আরও কত নারীর মুকুলিত যৌবনের সুখস্বপ্ন অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতে অকালে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পতিতাদের লইয়া কাব্য করিবার ইচ্ছা কোনদিনই ছিল না। কিন্তু তবুও চিরদিন যেমন সহজাত সংস্কারের বশে তাহাদের ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি আজ আর তাহা পারিলাম না। কারণ বেলাও যে ইহাদেরই একজন।

ঠিকানামত বাড়ী বাহির করিলাম। বেলা বলিয়া দিয়াছিল তাহার এখানকার নাম চামেলি। আমায় ঢুকিতে দেখিয়াই কয়েকটি মেয়ে কলহাস্যে 'আসুন' বলিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইল। তাহাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চামেলি কোথায় বলতে পারেন ?"

মেয়েটি আমার মুখে 'আপনি' সম্বোধন শুনিয়া, মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া, পরক্ষণেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "চামেলি ! সেত মরে গিয়েছে !"

কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলাম, "মারা গেছে ?"

মেয়েটি বলিল, "হাঁগো ! মাইরী বলছি ! জিজ্ঞেস করুন না

ওদের—এই লতা—”

বাধা দিয়া বলিলাম, “কি হয়েছিল ? কবে মারা গেল ?”

হাত দুইটার একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিল, “কি জানি, কি একটা তার এসেছিল কোথা থেকে ? সেইটে পড়ে কি যে হল জানি না। তারপর রাত্রিবেলায় গলায় কাপড় বেঁধে মরে গিয়েছে।”

অসহায় আবেগে মনের মধ্যে একটা কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিল, বিকাশের শেষ দুইটি অনুরোধের একটিও রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ইহার পর আর হয়ত কিছু লিখা উচিত নয়। তবু না লিখিয়া পারিলাম না। কি করিয়া যে ফিরিয়া যাইব এবং ফিরিয়া গিয়া মেসে একা থাকিবই বা কিভাবে, সেই কথাটাই মনকে ক্রমাগত চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। উপায় থাকিলে আর কখনই ফিরিতাম না। অন্য কোথাও একটা চাকরী যোগাড় করিয়া লওয়া হয়ত কঠিন হইত না। কিন্তু উপায় ছিল না। কারণ আমার ছোট ভাই-বোনগুলির কথা মনে করিয়া ফিরিতে হইল। এবং নিয়মিতভাবে কাজেও যোগদান করিলাম।

কোন শোকের আঘাতই মানুষকে চিরদিনের জন্য অভিভূত করিয়া দিতে পারে না। এমন কি বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতও ধীরে ধীরে সহনীয় হইয়া আসে। অতএব সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। তবুও কর্মহীন অবকাশ-মুহূর্ত্তে নিঃসঙ্গ একাকী বসিয়া বিকাশের কথা মনে করিয়া গোপনে অনেক চোখের জল ফেলিয়াছি। মনে পড়িত যেদিন তাহার বিচারের রায় বাহির হইল সেদিনকার শেষ সাক্ষাতের মুহূর্ত্তে তাহার পরিচিত পরিহাস-তরল-কণ্ঠের কথাগুলি, “চল্লাম, মাষ্টার। বৌদিকে বলো ; জানি না আবার কবে দেখা হবে। তবে যদি বেঁচে থাকি

নিশ্চয়ই দেখা হবে। যেখানেই থাক ঠিক তোমাদের খুঁজে বার কর্ব।" মনে মনে তাহার কথাগুলি ভাবিয়া অসীম আশায় বুক বাঁধিতাম। ভাবিতাম সে যখন বলিয়াছে তখন নিশ্চয়ই দেখা হইবে। তবুও সুদীর্ঘ দিনের ব্যবধান স্মরণ করিয়া একটা অনিশ্চিত সংশয়ের কালো ছায়া হৃদয়ের ব্যাকুলিত আশাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিত। মাঝে মাঝে মনে হইত মানুষটা তাহার প্রত্যাখাত হৃদয়ের বেদনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার সাধনায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া, প্রতিদানে নির্ব্বোধ মানুষের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের খড়্গাঘাতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। মনে হইত জীবনের এই ব্যর্থ অপচয়ের বেদনা কি তাহার অপেক্ষা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার বুকে বেশী করিয়া বাজিবে না? সময়ে সময়ে আমার জীবনে তাহার আবির্ভাবের কথা মনে পড়িলে ভাবিতাম আমার অনভিজ্ঞ জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তে যে মানুষটির বলিষ্ঠ আত্মার সংস্পর্শ লাভ করিয়া, অনভিজ্ঞ হৃদয়ের সমস্ত জড়তা কাটাইয়া অকুণ্ঠিত পদে জীবনের রাজপথের উপর দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছি—সে বিকাশ। সেই মানুষটি কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মত চির অজানিত পথে নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে, চকিতের জন্য আমার জীবনের প্রান্তসীমায় উদিত হইয়া, চিরদিনের জন্য আমার সামান্য জীবনটাকে আপনার ভাস্বর দীপ্তিতে দীপ্তিমান করিয়া দিয়া পরক্ষণেই অজ্ঞাতের নিষ্ঠুর আকর্ষণে কোথায় হারাইয়া গেল জানি না। আর কখনও তাহাকে ফিরিয়া পাইব কিনা জানি না; তবু মনে হয় আমার মর্মমানসে সেই মানুষটি যে চিরবিস্ময়ের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, বিস্মৃতির কলুষস্পর্শ কোনদিনই তাহাকে ম্লান করিতে পারিবে না।

সমাপ্ত